খুনের রঙ

সম্পাদনা ☐ সমরেশ মজুমদার
অনীশ দেব



পার্ল পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকঃ
আলতাফ হোসেন
পার্ল পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দূরাভাষঃ ২৪৪২৪৬

প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩

প্রচ্ছদঃ অনুপ রায়

কম্পিউটার কম্পোজঃ
সেতু কম্পিউটার্স
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

মুদ্রণঃ
রোকেয়া প্রেস
পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

মূল্যঃ ১০০.০০ টাকা



সূচীপত্র



প্রাণ নিয়ে খেলা

যুবক বলল, 'আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। তোমার জন্যে সবকিছু করতে পারি–যা বলবে।'

যুবতী ভুরুর ধনুক বাঁকিয়ে তাকাল। সামান্য হাসল ঠোঁটে। বলল, 'খুন করতে পার?'

যুবক চমকে গেল। মুখে নেমে এল মলিন ছায়া।

যুবতী তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাস, অথচ আমার কথায় সামান্য একটা প্রাণ নিতে পার না!'

যুবকের চোয়াল শক্ত হল। চোখে প্রতিজ্ঞা। বলল, 'হ্যাঁ, পারি। কাকে খুন করতে হবে বলো।'

যুবতী আকাশের দিকে তাকাল। বাতাসের ঘ্রাণ নিল। তারপর নরম অস্পষ্ট গলায় বলল, 'তোমার আমার ভালোবাসার মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে খুন করতে হবে। পারবে?'

যুবক যুবতীর গলার কাছে মুখ ঘষল, বলল, 'পারব, পারব।'

সাজানো গোছানো বসবার ঘরে উইল পড়া হচ্ছিল। যান্ত্রিক স্বরে উকিল সাহেব জানিয়ে দিচ্ছিলেন, আত্মীয়–স্বজনের মধ্যে কে কতটুকু সম্পত্তি পেয়েছেন। আর সম্পত্তির বর্তমান মালিক বৃদ্ধ গৃহকর্তা সকলের মুখের ভাব লক্ষ করছিলেন।

একসময় প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল ঘরে। হতে পারে না, সম্পত্তির এ রকম বেহিসেবী ভাগ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

হইচই–এর মাঝখানে হঠাৎই নিভে গেল ঘরের আলো। লোড শেডিং আর তার পরমুহূর্তেই শোনা গেল যন্ত্রণাময় এক তীব্র চিৎকার। কোনও মানুষের শেষ চিৎকার। যে চিৎকারের পর কারও আর কিছু করার থাকে না।

হঠাৎই জঙ্গলের মাঝে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল। শাল গাছের ফাঁকে চাঁদের ছিন্ন–বিছিন্ন আলোয় তার শরীরটা দেখা যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে গান গাইতে গাইতে হেঁটে চলেছে। নিশ্চয়ই ওর ভালোবাসার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। এই লোকটাই গত কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে খতম করেছিল দাদাকে। জমি–জিরেত নিয়ে কাজিয়া হয়েছিল। তখন টাঙ্গির এক কোপ বসিয়ে দিয়েছিল দাদার ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দাদা চলে গিয়েছিল আকাশে।

এখন এসেছে শোধের পালা। দাদার রক্তের ঋণ শোধ করবে ভাই। দাদা যে প্রায়ই স্বপনে দেখা দিয়ে বলে, 'ভাইটি, শোধ নে। নইলে আমার যে বড় কষ্ট হয়!'

তাই এই অন্ধকার রাতে ভাইয়ের হাতে টাঙ্গি। সে চুপিসারে অনুসরণ করে দাদার হত্যাকারীকে। তারপর একটা বড় গাছের আড়াল থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এসে জন্তুর মতো চিৎকার করে ওঠে। প্রাণপণ শক্তিতে টাঙ্গি চালায়। হত্যাকারী দ্বিখণ্ডিত হয়ে সেই মুহূর্তে আর এক হত্যাকারীর জন্ম হয়। চাঁদের আলোয় রক্তপাত ঘটে যায়।

ভালোবাসা, লোভ, প্রতিহিংসা এরকম আর ও নানা কারণে কেউ প্রাণ নেয়, কেউ প্রাণ দেয়। জীবনের কাহিনী থেকেই উঠে আসে জীবন নিয়ে নেওয়ার কাহিনী। এই সঙ্কলনের দশটি গল্পের এই জায়গাতেই মিল—খুন এর প্রতিটি গল্পের কেন্দ্রবিন্দু।

সঙ্কলনের নাম 'খুনের রঙ'। কিন্তু খুনের রঙ কী? খুন মানেই যেহেতু রক্ত ঝরা তাই লাল রঙের কথাই মনে আসে। সত্যি কি তাই? রক্তও তো শুকিয়ে গেলে কালো হয়ে যায়—রঙ বদলায়। তাহলে!

বাংলাদেশের সহৃদয় পাঠককে যদি এই সঙ্কলন খুশি করতে পারে তাহলে জানব আমাদের শ্রম ও আন্তরিকতা খানিকটা অন্তত দাম পেল।

সমরেশ মজুমদার

অনীশ দেব



পথের কাঁটা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যোমকেশ খবরের কাগজখানা সযত্নে পাট করিয়া টেবিলের এক পাশে রাখিয়া দিল। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

বাহিরে কুয়াশা-বর্জিত ফাল্গুনের আকাশে সকালবেলার আলো ঝলমল করিতেছিল। বাড়ীর তেতলার ঘর কয়টি লইয়া আমাদের বাসা, বসিবার ঘরটির গবাক্ষপথে শহরের ও আকাশের একাংশ বেশ দেখা যায়। নীচে নবোদ্‌বুদ্ধ নগরীর কর্মকোলাহল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, হ্যারিসন রোডের উপর গাড়ী-মোটর-ট্রামের ছুটাছুটি ও ব্যস্ততার অন্ত নাই। আকাশেও এই চাঞ্চল্য কিয়ৎপরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। চড়াই পাখীগুলো অনাবশ্যক কিচিমিচি করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের অনেক ঊর্ধ্বে একঝাঁক পায়রা কলিকাতা শহরটাকে নীচে ফেলিয়া যেন সূর্যলোক পরিক্রমণ করিবার আশায় ঊর্ধ্ব হইতে আরো ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। বেলা প্রায় আটটা, প্রভাতী চা ও জলখাবার শেষ করিয়া আমরা দুইজন অলসভাবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহির্জগতের বার্তা গ্রহণ করিতেছিলাম।

ব্যোমকেশ জানালার দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল,—"কিছুদিন থেকে কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, লক্ষ্য করেছ?"

আমি বলিলাম,—"না। বিজ্ঞাপন আমি পড়ি না।"

ভ্রূ তুলিয়া একটু বিস্মিতভাবে ব্যোমকেশ বলিল,—"বিজ্ঞাপন পড় না? তবে পড় কি?"

"খবরের কাগজে সবাই যা পড়ে তাই পড়ি—খবর।"

"অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ার কার আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে আর ব্রেজিলে কার একসঙ্গে তিনটে ছেলে হয়েছে, এই পড়! ওসব পড়ে লাভ কি? সত্যিকারের খাঁটি খবর যদি পেতে চাও, তাহলে বিজ্ঞাপন পড়।"

ব্যোমকেশ অদ্ভুত লোক, কিন্তু সে পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে। কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিয়া, প্রতিবাদ করিয়া, একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মত বাহির হইয়া আসে। সে স্বভাবতঃস্বল্পভাষী, কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া একবার তাহাকে চটাইয়া দিতে পারিলে তাহার ছুরির মত শাণিত ঝক্‌ঝকে বুদ্ধি সঙ্কোচ ও সংযমের পর্দা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার কথাবার্তা সত্যই শুনিবার মত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

আমি খোঁচা দিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না, বলিলাম—"ও, তাই না কি? কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তাহলে ভারি শয়তান, সমস্ত কাগজখানা বিজ্ঞাপনে ভরে না দিয়ে কতকগুলো বাজে খবর ছাপিয়ে পাতা নষ্ট করে।"

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"তাদের দোষ নেই। তোমার মত লোকের চিত্তবিনোদন না করতে পারলে বেচারাদের কাগজ বিক্রী হয় না, তাই বাধ্য হয়ে ঐ সব খবর সৃষ্টি করতে হয়। আসল কাজের খবর থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি ফিকির বার করে দিনে-দুপুরে ডাকাতি করছে, কে চোরাই মাল পাচার করবার নূতন ফন্দী আঁটছে,—এইসব দরকারী খবর যদি পেতে চাও তো বিজ্ঞাপন পড়তে হবে। রয়টারের টেলিগ্রামে ওসব পাওয়া যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু,—থাক—। এবার থেকে না হয় বিজ্ঞাপনই পড়ব। কিন্তু তোমার মজার বিজ্ঞাপনটা কি শুনি?"

ব্যোমকেশ কাগজখানা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল,—"পড়ে দেখ, দাগ দিয়ে রেখেছি।"

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র তিন লাইনের বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর হইল। লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দেওয়া ছিল বলিয়াই চোখে পড়িল, নচেৎ খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত।

পথের কাঁটা

যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন।

দুই তিনবার পড়িয়াও বিজ্ঞাপনের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ল্যাম্পপোস্টে হাত রেখে মোড়ের মাথায় দাঁড়ালেই পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে এ বিজ্ঞাপনের মানে কি? আর পথের কাঁটাই বা কি বস্তু?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সেটা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। বিজ্ঞাপনটা তিন মাস ধরে ফি শুক্রবারে বার হচ্ছে, পুরনো কাগজ ঘাঁটলেই দেখতে পাবে।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু এ বিজ্ঞাপনের সার্থকতা কি? কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তো লোকে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে? এর তো কোন মানেই হয় না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপাতত কোনও উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বটে, কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্য নেই বলা চলে না। অকারণে কেউ গাঁটের কড়ি খরচ করে বিজ্ঞাপন দেয় না।—লেখাটা পড়লে একটা জিনিস সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

"কি?"

"যে ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার আত্মগোপন করবার চেষ্টা। প্রথমতঃ দেখ, বিজ্ঞাপনে কোনও নাম নেই। অনেক সময় বিজ্ঞাপনে নাম থাকে না বটে, কিন্তু খবরের কাগজের অফিসে খোঁজ নিলে নাম-ধাম সব জানতে পারা যায়। সে রকম বিজ্ঞাপনে বক্স-নম্বর দেওয়া থাকে। এতে তা নেই। তারপর দেখ, যে লোক বিজ্ঞাপন দেয়, সে

জনসাধারণের সঙ্গে কোনও একটা কারবার চালাতে চায়,—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু মজা এই যে, এ লোকটি নিজে অদৃশ্য থেকে কারবার চালাতে চায়।"

"বুঝতে পারলুম না।"

"আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি, শোন। যিনি এই বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, তিনি জনসাধারণকে ডেকে বলছেন—'ওহে, তোমরা যদি পথের কাঁটা দূর করতে চাও তো অমুক সময় অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে থেকো—এমনভাবে দাঁড়িয়ে থেকো—যাতে আমি তোমাকে চিনতে পারি।'—পথের কাঁটা কি পদার্থ, সে তর্ক এখন দরকার নেই, কিন্তু মনে কর তুমি ঐ জিনিসটা চাও। তোমার কর্তব্য কি? নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। মনে কর, তুমি যথাসময়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। তারপর কি হল?"

"কি হল?"

"শনিবার বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ঐ জায়গায় কি রকম লোক-সমাগম হয় সেটা বোধ হয় তোমাকে বলে দিতে হবে না। এদিকে হোয়াইটওয়ে লেডল, ওদিকে নিউ মার্কেট, চারিদিকে গোটা পাঁচ-ছয় সিনেমা হাউস। তুমি ল্যাম্পপোস্ট ধরে আধঘন্টা দাঁড়িয়ে রইলে আর লোকের ঠেলা খেতে লাগলে, কিন্তু যে আশায় গিয়েছিলে, তা হল না,—কেউ তোমার পথের কাঁটা উদ্ধার করবার মহৌষধ নিয়ে হাজির হল না। তুমি বিরক্ত হয়ে চলে এলে, ভাবলে ব্যাপারটা আগাগোড়া ভুয়ো। তারপর হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, একখানি চিঠি কে ভিড়ের মধ্যে তোমার পকেটে ফেলে দিয়ে গেছে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি? চোরে-কামারে দেখা হল না অথচ সিঁধকাটি তৈরী হবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে তোমার লেন-দেনের সম্বন্ধ স্থাপিত হল অথচ তিনি কে, কি রকম চেহারা, তুমি কিছুই জানতে পারলে না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম,—"যদি তোমার যুক্তিধারাকে সত্যি বলেই মেনে নেওয়া যায়, তাহলে কি প্রমাণ হয়?"

"এই প্রমাণ হয় যে, 'পথের কাঁটা'র সওদাগরটি নিজেকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখতে চান এবং যিনি নিজের পরিচয় দিতে এত সঙ্কুচিত, তিনি বিনয়ী হতে পারেন, কিন্তু সাধু-লোক কখনই নন।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম,—"এ তোমার অনুমান মাত্র, একে প্রমাণ বলতে পার না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে কহিল,—"আরে, অনুমানই তো আসল প্রমাণ। যাকে তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে থাকো, তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান বৈ আর কিছুই থাকে না। আইনে যে circumstantial evidence বলে একটা প্রমাণ আছে, সেটা কি? অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তারই জোরে কত লোক যাবজ্জীবন পুলিপোলাও চলে যাচ্ছে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, মন হইতে সায় দিতে পারিলাম না। অনুমান যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমকক্ষ হইতে পারে, এ কথা সহজে মানিয়া লওয়া যায় না। অথচ

ব্যোমকেশের যুক্তি খণ্ডন করাও কঠিন কাজ। সুতরাং নীরব থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম। জানিতাম, এই নীরবতায় সে আরও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে এবং অচিরাৎ আরো জোরালো যুক্তি আনিয়া হাজির করিবে।

একটা চড়াই পাখী কুটা মুখে করিয়া খোলা জানালার উপর আসিয়া বসিল এবং ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া উজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া আমাদের পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল,—"আচ্ছা, ঐ পাখীটা কি চায় বলতে পার?"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম,—"কি চায়? ওঃ, বোধহয় বাসা তৈরী করবার একটা জায়গা খুঁজছে।"

"ঠিক জানো? কোন সন্দেহ নেই?"

"কোন সন্দেহ নেই।"

দুই হাত পশ্চাতে রাখিয়া মৃদুহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল,—"কি করে বুঝলে? প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ আর কি! ওর মুখে কুটো—"

"কুটো থাকলেই প্রমাণ হয় যে, বাসা বাঁধতে চায়?"

দেখিলাম ব্যোমকেশের ন্যায়ের প্যাঁচে পড়িয়া গিয়াছি।

কহিলাম "না,—তবে—"

"অনুমান। পথে এস! এতক্ষণ তবে দেয়ালা করছিলে কেন?"

"দেয়ালা করিনি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, চড়াই পাখী সম্বন্ধে যে অনুমান খাটে, মানুষের বেলাতেও সেই অনুমান খাটবে?"

"কেন নয়?"

"তুমি যদি কুটো মুখে করে একজনের জানলায় উঠে বসে থাক, তাহলে কি প্রমাণ হবে যে তুমি বাসা বাঁধতে চাও?"

"না। তাহলে প্রমাণ হবে যে আমি একটা বদ্ধ পাগল।"

"সে প্রমাণের দরকার আছে কি?"

ব্যোমকেশ হাসিতে লাগিল। বলিল,—"চটাতে পারবে না। কিন্তু কথাটা তোমায় মানতেই হবে,—প্রতক্ষ্য প্রমাণ বরং অবিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যুক্তি-সঙ্গত অনুমান একেবারে অমোঘ। তার ভুল হবার জো নেই।"

আমারও জিদ চড়িয়া গিয়াছিল, বলিলাম,—"কিন্তু ঐ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তুমি যে সব উদ্ভট অনুমান করলে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সে তোমার মনের দুর্বলতা, বিশ্বাস করবারও ক্ষমতা চাই। যা হোক, তোমার মত লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই ভাল। কাল শনিবার, বিকেলে কোনো কাজও নেই। কালই তোমায় বিশ্বাস করিয়ে দেবো।"

"কি ভাবে?"

আমাদের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া বলিল,—"অপরিচিত ব্যক্তি—প্রৌঢ়—মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস বললেও অত্যুক্তি হবে

না—হাতে লাঠি আছে—কে ইনি? নিশ্চয়ই আমাদের সাক্ষাৎ চান, কারণ, তেতলায় আমরা ছাড়া আর কেউ থাকে না।" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। ব্যোমকেশ ডাকিয়া বলিল,—"ভেতরে আসুন—দরজা খোলা আছে।"

দ্বার ঠেলিয়া একটি মধ্যবয়সী স্থূলকায় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি মোটা মলক্কা বেতের রূপার মুঠযুক্ত লাঠি, গায়ে কালো আলপাকার গলাবন্ধ কোট, পরিধানে কোঁচান থান। গৌরবর্ণ সুশ্রী, মুখে দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথার সম্মুখভাগ টাক পড়িয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তেতলার সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমটা কথা কহিতে পারিলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে আমাকে শুনাইয়া বলিল,—"অনুমান! অনুমান!"

আমি নীরবে তাহার এই শ্লেষ হজম করিলাম। কারণ, এক্ষেত্রে আগন্তুকের চেহারা সম্বন্ধে তাহার অনুমান যে বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভদ্রলোকটি দম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডিটেকটিভ ব্যোমকেশবাবু কার নাম?"

মাথার উপর পাখাটা খুলিয়া দিয়া একখানা চেয়ার নির্দেশ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"বসুন! আমারই নাম ব্যোমকেশ বক্সী, কিন্তু ঐ ডিটেকটিভ কথাটা আমি পছন্দ করি না; আমি একজন সত্যান্বেষী। যা হোক, আপনি বড় বিপন্ন হয়েছেন দেখছি। একটু জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিন্, তারপর আপনার গ্রামোফোন পিনের রহস্য শুনবো।"

ভদ্রলোকটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। আমারও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে গ্রামোফোন্-পিন রহস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা একেবারেই আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। ব্যোমকেশের অদ্ভুত ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, কিন্তু এটা যেন ভোজবাজির মত ঠেকিল।

ভদ্রলোক অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"আপনি—আপনি জানলেন কি করে?"

সহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল,—"অনুমান মাত্র। প্রথমতঃ আপনি পৌঢ়, দ্বিতীয়তঃ আপনি সঙ্গতিপন্ন, তৃতীয়তঃ আপনি সম্প্রতি ভীষণ বিপদে পড়েছেন এবং শেষ কথা—আমার সাহায্য নিতে চান। সুতরাং"—কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল যে, ইহার পর তাঁহার আগমনের হেতু আবিষ্কার করা শিশুর পক্ষেও সহজসাধ্য।

এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে, কিছুদিন হইতে এই কলিকাতা শহরে যে অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতেছিল এবং যাহাকে 'গ্রামোফোন পিন মিস্ট্রি' নাম দিয়া শহরের দেশী-বিলাতী সংবাদপত্রগুলি বিরাট হুলস্থুল বাধাইয়া দিয়াছিল; তাহার ফলে কলিকাতাবাসী লোকের মনে কৌতূহল, উত্তেজনা ও আতঙ্কের অবধি ছিল না। সংবাদপত্রের রোমাঞ্চকর ও ভীতিপ্রদ বিবরণ পাঠ করিবার পর চায়ের দোকানের

জল্পনা উত্তেজনায় একেবারে দড়িছেঁড়া হইয়া উঠিয়াছিল এবং গৃহ হইতে পথে বাহির হইবার পূর্বে প্রত্যেক বাঙালী গৃহস্থেরই গায়ে কাঁটা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ব্যাপারটা এই,—মাস দেড়েক পূর্বে সুকীয়া স্ট্রীট নিবাসী জয়হরি সান্যাল নামক জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাতঃকালে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন। রাস্তা পার হইয়া অন্য ফুটপাথে যাইবার জন্য তিনি যেমনই পথে নামিয়াছেন, অমনই হঠাৎ মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেলেন। সকালবেলা রাস্তায় লোকজনের অভাব ছিল না, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিবার পর দেখিল তাঁহার দেহে প্রাণ নাই। হঠাৎ কিসে মৃত্যু হইল অনুসন্ধান করিতে গিয়া চোখে পড়িল যে, তাঁহার বুকের উপর একবিন্দু রক্ত লাগিয়া আছে—অর কোথাও আঘাতের কোনও চিহ্ন নাই। পুলিস অপমৃত্যু সন্দেহ করিয়া লাস হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। সেখানে মরণোত্তর পরীক্ষায় ডাক্তার এক অদ্ভুত রিপোর্ট দিলেন। তিনি লিখিলেন, মৃত্যুর কারণ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি গ্রামোফোনের পিন বিঁধিয়া আছে। কেমন করিয়া এই পিন হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিল, তাহার কৈফিয়তে বিশেষজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসক লিখিলেন, বন্দুক অথবা ঐ জাতীয় কোনও যন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই পিন মৃতের সম্মুখ দিক্ হইতে বক্ষের চর্ম ও মাংস ভেদ করিয়া মর্মস্থানে প্রবেশ করিয়াছে এবং মৃত্যুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে।

এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রে বেশ একটু আন্দোলন হইল এবং মৃতব্যক্তির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতও বাহির হইয়া গেল। ইহা হত্যাকাণ্ড কি না এবং যদি তাই হয়, তবে কিরূপে ইহা সংঘটিত হইল, তাহা লইয়া অনেক গবেষণা প্রকাশিত হইল। কিন্তু একটা কথা কেহই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলেন না,—এই হত্যার উদ্দেশ্য কি এবং যে হত্যা করিয়াছে তাহার ইহাতে কি স্বার্থ! সরকারের পুলিস যে ইহার তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও কাগজে প্রকাশ পাইল। চায়ের দোকানের কাজীরা ফতোয়া দিলেন যে, ও কিছু নয়, লোকটার হার্টফেল করিয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত ভাল সংবাদের দুর্ভিক্ষ ঘটায় কাগজওয়ালারা এই নূতন ফন্দি বাহির করিয়া তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার দিন আষ্টেক পরে শহরের সকল সংবাদপত্রে দেড়-ইঞ্চি টাইপে যে সংবাদ বাহির হইল, তাহাতে কলিকাতার ভদ্র বাঙালী সম্প্রদায় উত্তেজনায় খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চায়ের বৈঠকের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের তৃতীয় নয়ন একবারে বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া গেল। এত প্রকার গুজব, আন্দাজ ও জনশ্রুতি জন্মগ্রহণ করিল যে, বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতাও বোধ করি এত জন্মায় না।

'দৈনিক কালকেতু' লিখিল,—

আবার গ্রামোফোন পিন
অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রহস্য
কলিকাতার পথঘাট নিরাপদ নয়

কালকেতু'র পাঠকগণ জানেন, কয়েকদিন পূর্বে জয়হরি সান্যাল পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরীক্ষায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড হইতে একটি গ্রামোফোন পিন বাহির হয় এবং ডাক্তার উহাই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমরা তখনি সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, ইহা সাধারণ ব্যাপার নয়, ইহার ভিতরে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত আছে। আমাদের সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে, গতকল্য অনুরূপ আর একটি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী কৈলাসচন্দ্র মৌলিক কল্য অপরাহ্ণে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় মোটরে চড়িয়া গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রেড রোডের কাছে গিয়া তিনি মোটর থামাইয়া পদব্রজে বেড়াইবার জন্য যেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূর গিয়াছেন, অমনি 'উঃ' শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সোফার ও রাস্তার অন্যান্য লোক মিলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আবার গাড়ীতে তুলিল, কিন্তু তিনি আর তখন জীবিত নাই। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পকালমধ্যেই পুলিস আসিয়া পড়িল। কৈলাসবাবুর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী ছিল, পুলিস তাঁহার বুকের কাছে এক বিন্দু রক্তের দাগ দেখিয়া অপঘাত-মৃত্যু সন্দেহ করিয়া তৎক্ষণাৎ লাস হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, কৈলাস বাবুর হৃৎপিণ্ডে একটি গ্রামোফোন পিন আটকাইয়া আছে, এই পিন তাঁহার সম্মুখদিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে, একদল ক্রূরকর্মা নরঘাতক কলিকাতা শহরে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে খুন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ইহাদের হত্যা করিবার প্রণালী; কোথা হইতে কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে ইহারা হত্যা করিতেছে, তাহা গভীর রহস্যে আবৃত।

কৈলাসবাবু অতিশয় হৃদয়বান ও অমায়িক প্রকৃতিক লোক ছিলেন, তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতা থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র আটচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। কৈলাসবাবু বিপত্নীক ও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আমরা কৈলাসবাবুর শোকসন্তপ্ত কন্যা ও জামাতাকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

পুলিস সজোরে তদন্ত চালাইয়াছে। প্রকাশ যে, কৈলাসবাবুর সোফার কালী সিংকে সন্দেহের উপর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অতঃপর দুই হপ্তা ধরিয়া খবরের কাগজে খুব হৈ চৈ চলিল। পুলিস সবেগে অনুসন্ধান চালাইতে লাগিল এবং অনুসন্ধানের বেগে বোধ করি গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিল। কিন্তু অপরাধী ধরা পড়া দূরের কথা, গ্রামোফোন পিনের জমাট রহস্য-অন্ধকারের ভিতরে আলোকের রশ্মিটুকু পর্যন্ত দেখা গেল না।

পনের দিনের মাথায় আবার গ্রামোফোন পিন দেখা দিল। এবার তাহার শিকার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের একজন ধনাঢ্য মহাজন—নাম কৃষ্ণদয়াল লাহা। ধর্মতলা ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের চৌমাথা পার হইতে গিয়া ইনি ভূপতিত হইলেন, আর উঠিলেন না। সংবাদপত্রে যে বিরাট রৈ-রৈ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। পুলিসের অক্ষমতা

সম্বন্ধেও সম্পাদকীয় মন্তব্য তীব্র ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কলিকাতার অধিবাসীদিগের বুকের উপর ভূতের ভয়ের মত একটা বিভীষিকা চাপিয়া বসিল। বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে, রেস্তোরাঁ ও ড্রয়িংরুমে অন্য সকল প্রকার আলোচনা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

তারপর দ্রুত অনুক্রমে আরও দুইটি অনুরূপ খুন হইয়া গেল। কলিকাতা শহর বিহ্বল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসহায়ভাবে পড়িয়া রহিল, এই অচিন্তনীয় বিপৎপাতে কি করিবে, কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে, কিছুই যেন ভাবিয়া পাইল না।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ এই ব্যাপারে গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। চোর ধরা তাহার পেশা এবং এই কাজে সে বেশ একটু নামও করিয়াছে। 'ডিটেকটিভ' শব্দটার প্রতি তাহার যতই বিরাগ থাক, বস্তুতঃ সে যে একজন বে-সরকারী ডিটেকটিভ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সে মনে মনে ভাল রকমই জানিত। তাই এই অভিনব হত্যাকাণ্ড তাহার সমস্ত মানসিক শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অকুস্থানগুলি আমরা দুইজনে মিলিয়া দেখিয়াও আসিয়াছিলাম। ইহার ফলে ব্যোমকেশ কোনও নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছিল কি না জানি না; করিয়া থাকিলেও আমাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু গ্রামোফোন পিন সম্বন্ধে সে যেখানে যেটুকু সংবাদ পাইত, তাহাই সযত্নে নোটবুকে টুকিয়া রাখিত। বোধ হয় তাহার মনে মনে ভরসা ছিল যে, একদিন এই রহস্যের একটা ছিন্নসূত্র তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে।

তাই আজ যখন সত্যসত্যই সূত্রটি তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দেখিলাম, বাহিরে শান্ত সংযত ভাব ধারণ করিলেও ভিতরে ভিতরে সে ভয়ানক উত্তেজিত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"আপনার নাম শুনে এসেছিলাম, দেখছি ঠকিনি। গোড়াতেই যে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, তাতে ভরসা হচ্ছে আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন। পুলিসের দ্বারা কিছু হবে না, তাদের কাছে আমি যাইনি, মশায়। দেখুন না, চোখের সামনে দিনে-দুপুরে পাঁচটা খুন হয়ে গেল, পুলিস কিছু করতে পারলে কি? আমিও তো প্রায় গিয়েছিলাম আর একটু হলেই।" তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনার স্বরে বলিল,—"আপনি বিচলিত হবেন না। পুলিসে না গিয়ে যে আমার কাছে এসেছেন, ভালই করেছেন। এ ব্যাপারের কিনারা যদি কেউ করতে পারে তো সে পুলিস নয়। আমাকে গোড়া থেকে সমস্ত কথা খুলে বলুন, অ-দরকারী বলে কোনও কথা বাদ দেবেন না। আমার কাছে অ-দরকারী কিছু নেই।"

ভদ্রলোক কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার নাম শ্রীআশুতোষ মিত্র, কাছেই নেবুতলায় আমি থাকি। আঠারো বছর বয়স থেকে সারা জীবন ব্যবসা উপলক্ষে ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছি—বিয়ে-থা করবার অবকাশ পাইনি। তা ছাড়া, ছেলেপিলে নেণ্ডি-গেণ্ডি আমি ভালবাসি না, তাই কোনওদিন বিয়ে করবার ইচ্ছাও হয়নি। আমি গোছালো লোক, একলা থাকতে ভালবাসি। বয়সও কম হয়নি—আসছে মাঘে একান্ন বছর পুরবে। প্রায় বছর দুই হল কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছি, সারা জীবনের উপার্জন লাখ দেড়েক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। তারই সুদে আমার বেশ চলে যায়। বাড়ীভাড়াও দিতে হয় না, বাড়ীখানা নিজের। সামান্য গান-বাজনার শখ আছে, তাই নিয়ে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"অবশ্য পোষ্য কেউ আছে?"

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না। আত্মীয় বলতে বড় কেউ নেই, তাই ও হাঙ্গামা পোহাতে হয় না। শুধু একটা লক্ষ্মীছাড়া বখাটে ভাইপো আছে, সেই মাঝে মাঝে টাকার জন্যে জ্বালাতন করতে আসত। কিন্তু সে ছোঁড়া একেবারে বেহেড মাতাল আর জুয়াড়ী, ওরকম লোক আমি বরদাস্ত করতে পারি না, মশায়, তাই তাকে আর বাড়ী ঢুকতে দিই না।"

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—"ভাইপোটি কোথায় থাকেন?"

আশুবাবু বেশ একটু পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন,—"আপাতত শ্রীঘরে। রাস্তায় মাতলামি করার জন্যে এবং পুলিসের সঙ্গে মারামারি করার অপরাধে দু'মাস জেল হয়েছে।"

"তার পর বলে যান।"

"বিনোদ ছোঁড়া,—আমার গুণধর ভাইপো, জেলে যাবার পর ক'দিন বেশ আরামে ছিলাম মশায়, কোনও হাঙ্গামা ছিল না। বন্ধু-বান্ধব আমার কেউ নেই, কিন্তু জেনে শুনে কোনও দিন কারও অনিষ্ট করিনি; সুতরাং আমার যে শত্রু আছে, এ কথাও ভাবতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ কাল বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল। এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে, এ আমার কল্পনার অতীত। গ্রামোফোন পিন রহস্যের কথা কাগজে পড়েছি বটে, কিন্তু ও আমার বিশ্বাস হত না, ভাবতাম সব গাঁজাখুরী। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙে গেছে।

"কাল সন্ধ্যাবেলা আমি অভ্যাসমত বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রোজই যাই, জোড়াসাঁকোর দিকে একটা গানবাজনার মজলিস আছে, সেখানে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে ন'টা সাড়ে ন'টার সময় বাড়ী ফিরে আসি। হেঁটেই যাতায়াত করি, আমার যে বয়স, তাতে নিয়মিত হাঁটলে শরীর ভাল থাকে। কাল রাত্রিতে আমি বাড়ী ফিরছি, আমহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের চৌমাথার ঘড়িতে তখন ঠিক সওয়া ন'টা। রাস্তায় তখনও গাড়ী-মোটরের খুব ভিড়। আমি কিছুক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম, দুটো ট্রাম পাস করে গেল। একটু ফাঁক দেখে আমি চৌমাথা পার হতে গেলাম। রাস্তার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছি, তখন হঠাৎ বুকে একটা বিষম ধাক্কা লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের চামড়ার ওপর কাঁটা ফোটার মতন একটা ব্যথা অনুভব করলাম, মনে হল, আমার বুক-পকেটের ঘড়ির ওপর কে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘুষি মারলে। উল্টে পড়েই যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনও রকমে সামলে নিয়ে গাড়ী-ঘোড়া বাঁচিয়ে সামনের ফুটপাথে উঠে পড়লাম।

"মাথাটা যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে বুকে ধাক্কা লাগল, কিছুই ধারণা করতে পারলাম না। পকেট থেকে ঘড়িটা বার করতে গিয়ে দেখি, ঘড়ি বার হচ্ছে না, কিসে আটকে যাচ্ছে। সাবধানে পকেটের কাপড় সরিয়ে যখন ঘড়ি বার করলাম, তখন দেখি, তার কাচখানা গুঁড়া হয়ে গেছে—আর—আর একটা গ্রামোফোনের পিন ঘড়িটাকে ফুঁড়ে মুখ বার করে আছে।"

আশুবাবু বলিতে বলিতে আবার ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কপালের ঘাম মুছিয়া কম্পিত হস্তে পকেট হইতে একটি ঘড়ির বাক্স বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই দেখুন সেই ঘড়ি—"

ব্যোমকেশ বাক্স খুলিয়া একটি গান-মেটালের পকেট ঘড়ি বাহির করিল। ঘড়ির কাচ নাই, ঠিক নয়টা কুড়ি মিনিটে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার মর্মস্থল ভেদ করিয়া একটি গ্রামোফোন পিনের অগ্রভাগ হিংস্রভাবে পশ্চাদ্দিকে মুখ বাহির করিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘড়িটা কিছুক্ষণ গভীর মনঃসংযোগে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বাক্সে রাখিয়া দিল। বাক্সটা টেবিলের উপর রাখিয়া আশুবাবুকে বলিল,—"তারপর?"

আশুবাবু বলিলেন,—"তারপর কি করে যে বাড়ী ফিরে এলাম সে আমিই জানি আর ভগবান জানেন। দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বুজতে পারিনি। ভাগ্য পকেটে ঘড়িটা ছিল, তাই তো প্রাণ বেঁচে গেল—নইলে আমিও তো এতক্ষণ হাসপাতালে মড়ার টেবিলে শুয়ে থাকতাম—" আশুবাবু শিহরিয়া উঠিলেন—"এক রাত্রিতে আমার দশ বছর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে গেছে, মশায়। প্রাণ নিয়ে কোথায় পালাব, কি করে আত্মরক্ষা করব, সমস্ত রাত এই শুধু ভেবেছি। শেষ রাত্রে আপনার নাম মনে পড়ল, শুনেছিলাম আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা, তাই ভোর না হতেই ছুটে এসেছি। বন্ধ গাড়ীতে চড়ে এসেছি মশায়, হেঁটে আসতে সাহস হয়নি—কি জানি যদি—"

ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া আশুবাবুর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল,—"আপনি নিশ্চিন্ত হোন; আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার আর কোন ভয় নেই। কাল আপনার একটা মস্ত ফাঁড়া গেছে সত্যি, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আমার কথা শুনে চলেন, তাহলে আপনার প্রাণের কোন আশঙ্কা থাকবে না।"

আশুবাবু দুই হাতে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ব্যোমকেশবাবু, আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন, প্রাণ বাঁচান, আমি আপনাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেব।"

ব্যোমকেশ নিজের চেয়ারে ফিরিয়া বসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—"এ তো খুব ভাল কথা। সবসুদ্ধ তাহলে তিন হাজার হল—গভর্নমেন্টও দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে না? কিন্তু সে পরের কথা, এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন। কাল যে সময় আপনার বুকে ধাক্কা লাগল ঠিক সেই সময় আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন?"

"কি রকম শব্দ?"

"মনে করুন, মোটরের টায়ার ফাটার মত শব্দ।"

আশুবাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন,—"না।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"আর কোন রকম শব্দ?"

"আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না।"

"ভেবে দেখুন।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া আশুবাবু বলিলেন,—"রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া চললে যে শব্দ হয়, সেই শব্দই শুনেছিলাম। আর মনে হচ্ছে যেন—যে সময় ধাক্কাটা লাগে, সেই সময় সাইকেলের ঘন্টির কিড়িং কিড়িং শব্দ শুনেছিলাম।"

"কোন রকম অস্বাভাবিক শব্দ শোনেননি?"

"না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ অন্য প্রশ্ন আরম্ভ করিল,—"আপনার এমন কোনও শত্রু আছে, যে আপনাকে খুন করতে পারে?"

"না। অন্তত আমি জানি না।"

"আপনি বিবাহ করেননি, সুতরাং ছেলেপুলে নেই। ভাইপোই বোধ হয় আপনার ওয়ারিস?"

একটু ইতস্তত করিয়া আশুবাবু বলিলেন,—"না।"

"উইল করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কার নামে সম্পত্তি উইল করেছেন?"

আশুবাবুর গৌরবর্ণ মুখ ধীরে ধীরে রক্তাভ হইয়া উঠিতেছিল, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্কোচ-জড়িত স্বরে বলিলেন,—"আমাকে আর সব কথা জিজ্ঞাসা করুন, শুধু ঐ প্রশ্নটি আমায় করবেন না। ওটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব কথা—প্রাইভেট—" বলিতে বলিতে অপ্রতিভভাবে থামিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আশুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া শেষে বলিল,—"আচ্ছা থাক। কিন্তু আপনার ভাবী ওয়ারিস—তিনি যে-ই হোন—আপনার উইলের কথা জানেন কি?"

"না। আমি আর আমার উকীল ছাড়া আর কেউ জানে না।"

"আপনার ওয়ারিসের সঙ্গে আপনার দেখা হয়?"

চক্ষু অন্য দিকে ফিরাইয়া আশুবাবু বলিলেন,—"হয়।"

"আপনার ভাইপো কতদিন হল জেলে গেছে?"

আশুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন,—"তা প্রায় তিন হপ্তা হবে।"

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আজ তাহলে আপনি আসুন। আপনার ঠিকানা আর ঘড়িটা রেখে যান; যদি কিছু জানবার দরকার হয়, আপনাকে খবর দেব।"

আশুবাবু শঙ্কিতভাবে বলিলেন,—"কিন্তু আমার সম্বন্ধে তো কোন ব্যবস্থা করলেন না। ইতিমধ্যে যদি আবার—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনার সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, পারতপক্ষে বাড়ী থেকে বেরুবেন না।"

আশুবাবু পাণ্ডুর মুখে বলিলেন,—"বাড়ীতে আমি একলা থাকি,—যদি—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"না, বাড়ীতে আপনার কোন আশাঙ্কা নেই, সেখানে আপনি নিরাপদ। তবে ইচ্ছে হয়, একজন দারোয়ান রাখতে পারেন।"

আশুবাবু জিজ্ঞাস করিলেন,—"বাড়ী থেকে একেবারে বেরুতে পাব না?"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"একান্তই যদি রাস্তায় বেরুনো দরকার হয়ে পড়ে, ফুটপাথ দিয়ে যাবেন। কিন্তু খবরদার, রাস্তায় নামবেন না। রাস্তায় নামলে আপনার জীবন সম্বন্ধে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।"

আশুবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল করিয়া বসিয়া রহিল। চিন্তা করিবার নূতন সূত্র সে অনেক পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমি তাহার চিন্তায় বাধা দিলাম না। প্রায় আধ ঘন্টা নীরব থাকিবার পর সে মুখ তুলিয়া বলিল,—"তুমি ভাবছ, আমি আশুবাবুকে পথে নামতে মানা করলুম কেন এবং বাড়ীতে তিনি নিরাপদ, এ কথাই বা জানলুম কি করে?"

চকিত হইয়া বলিলাম,—"হ্যাঁ।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"গ্রামোফোন-পিন ব্যাপারে একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, সব হত্যাই রাস্তায় হয়েছে। ফুটপাথেও নয়। রাস্তার মাঝখানে। এর কারণ কি হতে পারে ভেবে দেখেছ?"

"না। কি কারণ?"

"এর দুটো কারণ হতে পারে। প্রথম, রাস্তায় খুন করলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম,—যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেটা অসম্ভব বলে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়, রাস্তায় ছাড়া অন্যত্র তাকে ব্যবহার করা চলে না।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এমন কি অস্ত্র হতে পারে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তা যখন জানতে পারব, গ্রামোফোন-পিন রহস্য তখন আর রহস্য থাকবে না।"

আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসিয়াছিল, বলিলাম,—"আচ্ছা, এমন কোন বন্দুক বা পিস্তল যদি কেউ তৈরী করে, যা দিয়ে গ্রামোফোন-পিন ছোঁড়া যায়?"

সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"বুদ্ধি খেলিয়েছ বটে, কিন্তু তাতে দু একটা বাধা আছে। যে ব্যক্তি বন্দুক কিংবা পিস্তল দিয়ে খুন করতে চায়, সে বেছে বেছে রাস্তার মাঝখানে খুন করবে কেন? সে তো নির্জন স্থানই খুঁজবে। বন্দুকের কথা ছেড়ে দিই, পিস্তল ছুঁড়লে যে আওয়াজ হয়, রাস্তার গোলমালেও সে আওয়াজ ঢাকা পড়ে না। তা ছাড়া বারুদের গন্ধ আছে। কথায় বলে—শব্দে শব্দ ঢাকে, গন্ধ ঢাকে কিসে?"

আমি বলিলাম,—"মনে কর, যদি এয়ার-গান হয়?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল,—"এয়ার-গান ঘাড়ে করে খুন করতে যাওয়ার পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু সুবুদ্ধির পরিচয় নেই।—না হে না, অত সহজ নয়। এর মধ্যে ভাববার বিষয় হচ্ছে, অস্ত্র যা-ই হোক ছোঁড়বার সময় তার একটা শব্দ হবেই, সে শব্দ ঢাকা পড়ে কি করে?"

আমি বলিলাম,—"তুমিই তো এখনি বলছিলে,—শব্দে শব্দ ঢাকে—"

ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, অস্ফুট স্বরে কহিল,—"ঠিক তো—ঠিক তো—"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"কি হল?"

ব্যোমকেশ নিজের দেহটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া যেন চিন্তার মোহ ভাঙিয়া ফেলিল, বলিল,—"কিছু না। এই গ্রামোফোন-পিন রহস্য নিয়ে যতই ভাবা যায়, ততই এই ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় যে, সব হত্যা এক সুতোয় গাঁথা। সবগুলোর মধ্যেই একটা অদ্ভুত মিল আছে, যদিও তা হঠাৎ চোখে পড়ে না।"

"কি রকম?"

ব্যোমকেশ করাগ্রে গণনা করিতে করিতে বলিল,—"প্রথমতঃ দেখ, যাঁরা খুন হয়েছেন, তাঁরা সবাই যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। আশুবাবু—যিনি ঘড়ির কল্যাণে বেঁচে গেছেন—তিনিও প্রৌঢ়। তারপর দ্বিতীয় কথা, তাঁরা সকলেই অর্থবান লোক ছিলেন,—হতে পারে কেউ বেশী ধনী কেউ কম ধনী, কিন্তু গরীব কেউ নয়। তৃতীয় কথা, সকলেই পথের মাঝখানে হাজার লোকের সামনে খুন হয়েছেন এবং শেষ কথা—এইটেই সব চেয়ে প্রণিধানযোগ্য—তাঁরা সবাই অপুত্রক—"

আমি বলিলাম,—"তুমি তাহলে অনুমান কর যে—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অনুমান এখনও আমি কিছুই করিনি। এগুলো হচ্ছে আমার অনুমানের ভিত্তি, ইংরিজীতে যাকে বলে premise."

আমি বলিলাম,—"কিন্তু এই ক'টি premise থেকে অপরাধীদের ধরা—"

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"অপরাধীদের নয় অজিত, অপরাধীর। গৌরবে ছাড়া এখানে বহুবচন একেবারে অনাবশ্যক। খবরের কাগজওয়ালারা 'মার্ডারস্ গ্যাং' বলে যতই চীৎকার করুক, গ্যাংএর মধ্যে কেবল একটি লোক আছেন। তিনিই এই নরমেধযজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক এবং যজমান। এক কথায়, পরব্রহ্মের মত ইনি, একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

আমি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলাম,—"এ কথা তুমি কি করে বলতে পারো? কোন প্রমাণ আছে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু উপস্থিত একটা দিলেই যথেষ্ট হবে। এমন অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করবার শক্তি পাঁচজন লোকের কখনও সমান মাত্রায় থাকতে পারে? প্রত্যেকটি পিন অব্যর্থভাবে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে,—একটু উঁচু কিম্বা নীচু হয়নি। আশুবাবুর কথাই ধর, ঘড়িটি না থাকলে ঐ পিন কোথায় গিয়ে পৌঁছুত বল দেখি? এমন টিপ কি পাঁচ জনের হয়? এ যেন চক্রছিদ্রপথে মৎস্য-চক্ষু বিদ্ধ করার মত,—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর মনে আছে তো? ভেবে দেখ, সে কাজ একা অর্জুনই পেরেছিল, মহাভারতের যুগেও এমন অমোঘ নিশানা একজন বৈ দু'জনের ছিল না।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া পড়িল।

আমাদের এই বসিবার ঘরের পাশে আর একটা ঘর ছিল—সেটা ব্যোমকেশের নিজস্ব। এ ঘরে সে সকল সময় আমাকেও ঢুকিতে দিত না। বস্তুতঃ এ ঘরখানা ছিল একাধারে তাহার লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, মিউজিয়ম ও গ্রীনরুম। আশুবাবুর ঘড়িটি

তুলিয়া সেই ঘরটায় প্রবেশ করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল,—"খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে এটার তত্ত্ব আহরণ করা যাবে। আপাতত স্নানের বেলা হয়ে গেছে।"

বৈকালে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। কি কাজে গিয়াছিল, জানি না। যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; আমি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, চায়ের সরঞ্জামও তৈয়ার ছিল, সে আসিতেই ভৃত্য টেবিলের উপর চা-জলখাবার দিয়া গেল। আমরা নিঃশব্দে জলযোগ সমাধা করিলাম। এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, ঐ কার্যটা একত্র না করিলে মনঃপূত হইত না।

একটা চুরুট ধরাইয়া, চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিয়া ব্যোমকেশ প্রথম কথা কহিল; বলিল,—"আশুবাবু লোকটিকে তোমার কেমন মনে হয়?"

ঈষৎ বিস্মিতভাবে বলিলাম,—"কেন বল দেখি? আমার তো বেশ ভাল লোক বলেই মন হয়—নিরীহ ভালমানুষ গোছের—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আর নৈতিক চরিত্র?"

আমি বলিলাম,—"মাতাল ভাইপোর উপর যে রকম চটা, তাতে নৈতিক চরিত্র তো ভাল বলেই মনে হয়। তার ওপর বয়স্ক লোক। বিয়ে করেননি, যৌবনে যদি কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা করে থাকেন তো অন্য কথা; কিন্তু এখন আর ওঁর সে সব করবার বয়স নেই।"

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল,—"বয়স না থাকতে পারে, কিন্তু একটি স্ত্রীলোক আছে। জোড়াসাঁকোর যে গানের মজলিসে আশুবাবু নিত্য গানবাজনা করে থাকেন, সেটি ঐ স্ত্রীলোকের বাড়ী। স্ত্রীলোকের বাড়ী বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না, কারণ, বাড়ীর ভাড়া আশুবাবুই দিয়ে থাকেন এবং গানের মজলিস বললেও বোধ হয় ভুল বলা হয়, যেহেতু দু'টি প্রাণীর বৈঠককে কোন মতেই মজলিস বলা চলে না।"

"বল কি হে! বুড়োর প্রাণে তো রস আছে দেখছি।"

"শুধু তাই নয়, গত বারো তের বছর ধরে আশুবাবু এই নাগরিকাটির ভরণ-পোষণ করে আসছেন, সুতরাং তাঁর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। আবার অন্য পক্ষেও একনিষ্ঠার অভাব নেই, আশুবাবু ছাড়া অন্য কোনও সঙ্গীত-পিপাসুর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই; দরজায় কড়া পাহারা।"

উৎসুক হইয়া বলিলাম,—তাই না কি? সঙ্গীত-পিপাসু সেজে ঢোকবার মতলব করেছিলে বুঝি? নাগরিকাটির দর্শন পেলে? কি রকম দেখতে শুনতে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"একবার চকিতের ন্যায় দেখা পেয়েছিলুম। কিন্তু রূপবর্ণনা করে তোমার মত কুমার-ব্রহ্মচারীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে চাই না। এক কথায়, অপূর্ব রূপসী। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ, কিন্তু দেখে মনে হয়, বড় জোর উনিশ কুড়ি। আশুবাবুর রুচির প্রশংসা না করে থাকা যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ আশুবাবুর গুপ্ত জীবন সম্বন্ধে এত কৌতূহলী হয়ে উঠলে কেন?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অপরিমিত কৌতূহলে আমার একটা দুর্বলতা। তা ছাড়া, আশুবাবুর উইলের ওয়ারিস সম্বন্ধে মনে একটা খটকা লেগেছিল—"

"ইনিই তাহলে আশুবাবুর উত্তরাধিকারিণী?"

"সেই রকমই অনুমান হচ্ছে। সেখানে আর একটি ভদ্রলোকের দেখা পেলুম; ফিটফাট বাবু, বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, দ্রুতবেগে এসে দারোয়ানের হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিয়ে দ্রুতবেগে চলে গেলেন। কিন্তু ও কথা যাক্। বিষয়টা মুখরোচক বটে, কিন্তু লাভজনক নয়।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

বুঝিলাম, অবান্তর আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়া পাছে তাহার মন প্রকৃত অনুসন্ধানের পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, পাছে আশুবাবুর জীবনের গোপন ইতিহাস তাঁহার উপস্থিত বিপদ ও বিপন্মুক্তির সমস্যা অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে, এই ভয়ে ব্যোমকেশও আলোচনাটা আর বাড়িতে দিল না। এমনি ভাবেই যে মানুষের মন নিজের অজ্ঞাতসারে গৌণবস্তুকে মুখ্যবস্তু অপেক্ষা প্রধান করিয়া তুলিয়া শেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা আমারও অজ্ঞাত ছিল না। আমি তাই জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঘড়িটা থেকে কিছু পেলে?"

ব্যোমকেশ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—"ঘড়ি থেকে তিনটি তত্ত্ব লাভ করেছি। এক—গ্রামোফোন পিনটি সাধারণ এডিসন্-মার্কা পিন, দুই—তার ওজন দু'রতি, তিন—আশুবাবুর ঘড়িটা একেবারে গেছে, আর মেরামত হবে না।"

আমি বলিলাম,—"তার মানে দরকারী তথ্য কিছুই পাওনি।"

ব্যোমকেশ চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল,—"তা বলতে পারি না। প্রথমতঃ বুঝতে পেরেছি যে, পিন ছোঁড়বার সময় হত্যাকারী আর হত ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান সাত আট গজের বেশী হবে না। একটা গ্রামোফোন পিন এত হাল্কা জিনিস যে, সাত আট গজের বেশী দূর থেকে ছুঁড়লে অমন অব্যর্থ-লক্ষ্য হতে পারে না। অথচ হত্যাকারীর টিপ কি রকম অভ্রান্ত, তা তো দেখেছ। প্রত্যেকবার তীর একেবারে মর্মস্থানে গিয়ে ঢুকেছে।"

আমি বিস্মিত অবিশ্বাসের সুরে বলিলাম,—"সাত আট গজ দূর থেকে মেরেছে, তবু কেউ ধরতে পারলে না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সেইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান প্রহেলিকা। ভেবে দেখ, খুন করবার পর লোকটা হয়তো দর্শকদের মধ্যেই ছিল, হয়তো নিজের হাতে তুলে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করেছে; কিন্তু তবু কেউ বুঝতে পারলে না, কি করে সে এমনভাবে আত্মগোপন করলে?"

আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলাম,—"আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, হত্যাকারী পকেটের ভিতর এমন একটা যন্ত্র নিয়ে বেড়ায়—যা থেকে গ্রামোফোন পিন ছোঁড়া যায়। তারপর তার শিকারের সামনে এসে পকেট থেকেই যন্ত্রটা ফায়ার করে। পকেটে হাত দিয়ে অনেকেই রাস্তায় চলে, সুতরাং কারু সন্দেহ হয় না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তা যদি হত, তাহলে ফুটপাথের ওপরেই তো কাজ সারতে পারত। রাস্তায় নামতে হয় কেন? তা ছাড়া, এমন কোনও যন্ত্র আমার জানা নেই—যা নিঃশব্দে ছোঁড়া যায় অথচ তার নিক্ষিপ্ত গুলি একটা মানুষের শরীর ফুটো করে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছতে পারে। তাতে কতখানি শক্তির দরকার, ভেবে দেখেছ?"

আমি নিরুত্তর হইয়া রহিলাম। ব্যোমকেশ হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া ও করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; শেষে বলিল,—"বুঝতে পারছি,

এর একটা খুব সহজ সমাধান হাতের কাছেই রয়েছে, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। যতবার ধরবার চেষ্টা করছি,পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

রাত্রিকালে এ বিষয়ে আর কোনও কথা হইল না। নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ও বিমনা হইয়া রহিল। সমস্যার যে উত্তরটা হাতের কাছে থাকিয়াও তাহার যুক্তির ফাঁদে ধরা দিতেছে না, তাহারই পশ্চাতে তাহার মন যে ব্যাধের মত ছুটিয়াছে, তাহা বুঝিয়া আমিও তাহার একাগ্র অনুধাবনে বাধা দিলাম না।

পরদিন সকালে চিন্তাক্রান্ত মুখেই সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া এক পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘন্টা তিনেক পরে যখন ফিরিল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় গিছলে?"

ব্যোমকেশ জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে অন্যমনে বলিল,—"উকীলের বাড়ী।" তাহাকে উন্মনা দেখিয়া আমি আর প্রশ্ন করিলাম না।

অপরাহ্নের দিকে তাহাকে কিছু প্রফুল্ল দেখিলাম। সমস্ত দুপুর সে নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছিল; একবার টেলিফোনে কাহার সহিত কথা কহিল, শুনিতে পাইলাম। প্রায় সাড়ে চারটের সময় সে দরজা খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল,—"ওহে, কাল কি ঠিক হয়েছিল, ভুলে গেলে? 'পথের কাঁটা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার সময় যে উপস্থিত।"

সত্যই 'পথের কাঁটা'র কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"এস এস, তোমার একটু সাজসজ্জা করে দিই। এমনি গেলে তো চলবে না।"

আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম,—"চলবে না কেন?"

ব্যোমকেশ একটা কাঠের কবাট-যুক্ত আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি টিনের বাক্স বাহির করিল। বাক্স হইতে ক্রেপ, কাঁচি, স্পিরিট-গাম ইত্যাদি বাছিয়া লইয়া বুরুশ দিয়া আমার মুখে স্পিরিট-গাম লাগাইতে লাগাইতে বলিল,—"অজিত বন্দ্যো যে ব্যোমকেশ বক্সীর বন্ধু, এ খবর অনেক মহাত্মাই জানেন কি না, তাই একটু সতর্কতা।"

মিনিট পনের পরে আমার অঙ্গসজ্জা শেষ করিয়া যখন ব্যোমকেশ ছাড়িয়া দিল, তখন আয়নার সম্মুখে গিয়া দেখি,—কি সর্বনাশ! এ তো অজিত বন্দ্যো নয়, এ যে সম্পূর্ণ আলাদা লোক। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও ছুঁচোলা গোঁফ যে অজিত বন্দ্যোর কস্মিনকালেও ছিল না! বয়সও প্রায় দশ বছর বাড়িয়া গিয়াছে। রং বেশ একটু ময়লা। আমি ভীত হইয়া বলিলাম,—"এই বেশে রাস্তায় বেরুতে হবে? যদি পুলিসে ধরে?"

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল,—"মা ভৈঃ। পুলিসের বাবার সাধ্য নেই তোমাকে চিনতে পারে। বিশ্বাস না হয়, নীচের তলায় কোনও চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ। জিজ্ঞাসা কর,—অজিতবাবু কোথায় থাকেন?"

আমি আরও ভয় পাইয়া বলিলাম,—"না না, তার দরকার নেই, আমি এমনই যাচ্ছি।"

বাহির হইবার সময় ব্যোমকেশ বলিল,—"কি করতে হবে, তোমার তো জানাই আছে,—শুধু ফেরবার সময় একটু সাবধানে এসো, পেছু নিতে পারে।"

"সে সম্ভাবনাও আছে না কি?"

"অসম্ভব নয়। আমি বাড়ীতেই রইলুম, যত শীগ্‌গির পার, ফিরে এসো।"

পথে বাহির হইয়া প্রথমটা ভারী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যখন দেখিলাম, আমার ছদ্মবেশ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম, একটু সাহসও হইল। মোড়ের একটা দোকানে আমি নিয়মিত পান খাইতাম, খোট্টা পানওয়ালা আমাকে দেখিলেই সেলাম করিত, সেখানে গিয়া সদর্পে পান চাহিলাম। লোকটা নির্বিকার চিত্তে পান দিয়া পয়সা কুড়াইয়া লইল, আমার পানে ভাল করিয়া দৃকপাতও করিল না।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়া ট্রামে চড়িলাম। এসপ্ল্যানেডে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইলাম। মনের অবস্থা যদিও ঠিক অভিসারিকার মত নহে, তবু বেশ একটু কৌতুক ও উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিলাম।

কৌতুক কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। যে পথে জনস্রোত জলস্রোতের মতই ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকা সহজ ব্যাপার নহে। দুই চারিটা কনুইএর গুঁতা নির্বিকারভাবে হজম করিলাম। অকারণে সংএর মত ল্যাম্পপোস্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকায় অন্য বিপদও আছে। চৌমাথার উপর একটা সার্জেন্ট দাঁড়াইয়াছিল, সে সপ্রশ্নভাবে আমার দিকে দুই তিনবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এখনই হয়তো আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কেন দাঁড়াইয়া আছ? কি করি, ফুটপাথের ধারেই হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর দোকানের একটা প্রকাণ্ড কাচ-ঢাকা জানলায় নানাবিধ বিলাতী পণ্য সাজান ছিল, সেই দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। মনে ভাবিলাম, পাড়াগেঁয়ো ভূত মনে করে ক্ষতি নাই, গাঁটকাটা ভাবিয়া হাতে হাতকড়া না পরায়!

ঘড়িতে দেখিলাম, পাঁচটা পঞ্চাশ। কোনক্রমে আর দশটা মিনিট কাটাইতে পারিলে বাঁচা যায়। অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, মনটা নিজের পাঞ্জাবীর পকেটের মধ্যে পড়িয়া রহিল। দুই একবার পকেটে হাত দিয়াও দেখিলাম, কিন্তু সেখানে নূতন কিছুই হাতে ঠেকিল না।

অবশেষে ছয়টা বাজিতেই একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ল্যাম্পপোস্ট পরিত্যাগ করিলাম। পকেট দু'টা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম, চিঠিপত্র কিছুই নাই। নিরাশার সঙ্গে সঙ্গে একটা স-মৎসর আনন্দও হইতে লাগিল, যাক্, ব্যোমকেশের অনুমান যে অভ্রান্ত নহে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। এইবার তাহাকে বেশ একটু খোঁচা দিতে হইবে। এইরূপে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে এস্‌প্ল্যানেডের ট্রাম-ডিপোতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

"ছবি লিবেন, বাবু!"

কানের অত্যন্ত নিকটে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখি, লুঙ্গি-পরা নীচ শ্রেণীর একজন মুসলমান একখানা খাম আমার হাতে গুঁজিয়া দিতেছে। বিস্মিতভাবে খুলিতেই একখানা কুৎসিত ছবি বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ ব্যবসা কলিকাতার রাস্তাঘাটে চলে জানিতাম; তাই ঘৃণাভরে সেটা ফেরত দিতে গিয়া দেখি লোকটা নাই। সম্মুখে

পশ্চাতে, চারিদিকে চক্ষু ফিরাইলাম; কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সেই লুঙ্গি-পরা লোকটাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

অবাক হইয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় একটি ছোট্ট হাসির শব্দে চমক ভাঙিয়া দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ গোছের ফিরিঙ্গি ভদ্রলোক আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমার দিকে না তাকাইয়াই তিনি পরিষ্কার বাঙলায় একান্ত পরিচিত কণ্ঠে বলিলেন,—"চিঠি তো পেয়ে গেছ দেখছি, এবার বাড়ী যাও। একটু ঘুরে যেও। এখান থেকে ট্রামে বৌবাজারের মোড় পর্যন্ত যেও, সেখান থেকে বাসে করে হাওড়ার মোড় পর্যন্ত, তারপর ট্যাক্সিতে করে বাড়ী যাবে।"

সার্কুলার রোডের ট্রাম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সাহেব তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

আমি সমস্ত শহর মাড়াইয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশ আরাম-কেদারার উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া সিগারেট টানিতেছে। আমি তাহার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলাম,—"সাহেব কখন এলে?"

ব্যোমকেশ ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া বলিল,—"মিনিট কুড়ি।"

আমি বলিলাম, "আমার পেছু নিয়েছিলে কেন?"

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"যে কারণে নিয়েছিলুম তা সফল হল না, এক মিনিট দেরী হয়ে গেল।—তুমি যখন ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়েছিলে, আমি তখন ঠিক তোমার পাঁচ হাত দূরে লেড্‌ল'র দোকানের ভিতর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সিল্কের মোজা পছন্দ করছিলুম। 'পথের কাঁটা'র ব্যাপারী বোধ হয় কিছু সন্দেহ করে থাকবে, বিশেষতঃ তুমি যে-রকম ছটফট করছিলে আর দু'মিনিট অন্তর পকেটে হাত দিচ্ছিলে, তাতে সন্দেহ হবারই কথা। তাই সে তখন চিঠিখানা দিলে না। তুমি চলে যাবার পর আমিও দোকান থেকে বেরিয়েছি, মিনিট দুই-তিন দেরী হয়েছিল—তারি মধ্যে লোকটা কাজ হাসিল করে বেরিয়ে গেল। আমি যখন পৌঁছলুম, তখন তুমি খাম হাতে করে ইয়ের মত দাঁড়িয়ে আছ।—কি করে খাম পেলে?"

কি করিয়া পাইলাম, তাহা বিবৃত করিলে পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"লোকটাকে ভাল করে দেখেছিলে? কিছু মনে আছে?"

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"না। শুধু মনে হচ্ছে, তার নাকের পাশে একটা মস্ত আঁচিল ছিল।"

ব্যোমকেশ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সেটা আসল নয়—নকল। তোমার গোঁফ-দাড়ির মত। যাক, এখন চিঠিখানা দেখি, তুমি ইতিমধ্যে বাথরুমে গিয়ে তোমার দাড়িগোঁফ ধুয়ে এস।"

মুখের রোমবাহুল্য বর্জন করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। দুই হাত পিছনে দিয়া সে দ্রুতপদে ঘরে পায়চারি করিতেছে, তাহার মুখে চোখে এমন একটা প্রদীপ্ত উল্লাসের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা লাফাইয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"চিঠিতে কি দেখলে? কিছু পেয়েছ না কি?"

ব্যোমকেশ উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল,—"শুধু একটি কথা অজিত, একটি ছোট্ট কথা। কিন্তু এখন তোমাকে কিছু বলব না। হাওড়ার ব্রিজ কখনও খোলা অবস্থায় দেখেছ? আমার মনের অবস্থা হয়েছিল ঠিক সেই রকম, দুই দিক থেকে পথ এসেছে, কিন্তু মাঝখানটিতে একটুখানি ফাঁক, একটি পন্‌টুন্ খোলা। আজ সেই ফাঁকটুকু জোড়া লেগে গেছে।"

"কি করে জোড়া লাগল? চিঠিতে কি আছে?"

"তুমিই পড়ে দেখ।" বলিয়া ব্যোমকেশ খোলা কাগজখানা আমার হাতে দিল।

খামের মধ্যে কুৎসিত ছবিটা ছাড়া আর একখানা কাগজ ছিল, তাহা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পড়িবার সুযোগ হয় নাই। এখন দেখিলাম, পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—

"আপনার পথের কাঁটা কে? তাহার নাম ও ঠিকানা কি? আপনি কি চান, পরিষ্কার করিয়া লিখুন। কোনো কথা লুকাইবেন না। নিজের নাম স্বাক্ষর করিবার দরকার নাই। লিখিত পত্র খামে ভরিয়া আগামী রবিবার ১০ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় খিদিরপুর রেসকোর্সের পাশের রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইবেন। একটি লোক বাইসিক্ল চড়িয়া আপনার সম্মুখ দিক হইতে আসিবে, তাহার চোখে মোটর-গগ্‌ল দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আপনার পত্র হাতে লইয়া পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া থাকিবেন। বাইসিক্ল আরোহী আপনার হাত হইতে চিঠি লইয়া যাইবে। অতঃপর যথাসময় আপনি সংবাদ পাইবেন।

"পদব্রজে একাকী আসিবেন। সঙ্গী থাকিলে দেখা পাইবেন না।"

দুই তিনবার সাবধানে পড়িলাম। খুব অসাধারণ বটে এবং যৎপরোনাস্তি রোমান্টিক তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ব্যোমকেশের অসম্বৃত আনন্দের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ব্যাপার বল দেখি! আমি তো এমন কিছু দেখছি না—"

"কিছু দেখতে পেলে না?"

"অবশ্য তুমি কাল যা অনুমান করেছিলে, তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। লোকটার আত্মগোপন করবার চেষ্টার মধ্যে হয়তো কোন বদ মতলব থাকতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া আর তো আমি কিছু দেখছি না।"

"হায় অন্ধ! অতবড় জিনিসটা দেখতে পেলে না?" ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল, বাহিরে সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। ব্যোমকেশ ক্ষণকাল একাগ্রমনে শুনিয়া বলিল,—"আশুবাবু। এ সব কথা ওঁকে বলবার দরকার নেই—" বলিয়া চিঠিখানা আমার হাত হইতে লইয়া পকেটে পুরিল।

আশুবাবু ঘরে প্রবেশ করিলে তাঁহার চেহারা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একদিনের মধ্যে মানুষের চেহারা এতখানি পরিবর্তিত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। মাথার চুল অবিন্যস্ত, জামা-কাপড়ের পারিপাট্য নাই, গালের মাংস ঝুলিয়া গিয়াছে, চোখের কোলে কালি, যেন অকস্মাৎ কোনও মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। কাল সদ্য মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইবার পরও

তাঁহাকে এত অবসন্ন ম্রিয়মাণ দেখি নাই। তিনি একখানা চেয়ারে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"একটা দুঃসংবাদ পেয়ে আপনাকে খবর দিতে এসেছি ব্যোমকেশবাবু। আমার উকীল বিলাস মল্লিক পালিয়েছে।"

ব্যোমকেশ গম্ভীর অথচ সদয় কণ্ঠে কহিল,—"সে পালাবে আমি জানতুম। সেই সঙ্গে আপনার জোড়াসাঁকোর বন্ধুটিও গেছেন, বোধহয় খবর পেয়েছেন।"

আশুবাবু হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন,—"আপনি—আপনি সব জানেন?"

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে কহিল,—"সমস্ত। কাল আমি জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলুম, বিলাস মল্লিককে দেখেছি। বিলাস মল্লিকের সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটির অনেক দিন থেকে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলছিল—আপনি কিছুই জানতেন না। আপনার উইল তৈরী করবার পরই বিলাস উকীল আপনার উত্তরাধিকারিণীকে দেখতে যায়। প্রথমটা বোধ হয় কৌতূহলবশে গিয়েছিল, তারপর ক্রমে—যা হয়ে থাকে। ওরা এত দিন সুযোগের অভাবেই কিছু করতে পারছিল না। আশুবাবু, আপনি দুঃখিত হবেন না, এ আপনার ভালই হল, অসৎ স্ত্রীলোক এবং কপট বন্ধুর ষড়যন্ত্র থেকে আপনি মুক্তি পেলেন। আর আপনার জীবনের কোনও ভয় নেই—এখন আপনি নির্ভয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন।"

আশুবাবু শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"তার মানে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তার মানে, আপনি যা মনে মনে সন্দেহ করছেন অথচ বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই ঠিক। ওরাই দু'জনে আপনাকে হত্যা করবার মতলব করেছিল; তবে নিজের হাতে নয়। এই কলকাতা শহরেই একজন লোক আছে—যাকে কেউ চেনে না, কেউ চোখে দেখেনি—অথচ যার নিষ্ঠুর অস্ত্র পাঁচ জন নিরীহ নিরপরাধ লোককে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে দিলে। আপনাকেও সরাতো, শুধু পরমায়ু ছিল বলেই আপনি বেঁচে গেলেন।"

আশুবাবু বহুক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে মর্মন্তুদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "বুড়ো বয়সে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি, কাউকে দোষ দেবার নেই!—আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করেছিলাম, তারপর হঠাৎ পদস্খলন হয়ে গেল। একদিন দেওঘরে তপোবন দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলাম। বিবাহে আমার চিরদিন অরুচি, কিন্তু তাকে বিবাহ করবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। শেষে একদিন জানতে পারলাম, সে বেশ্যার মেয়ে। বিবাহ হল না, কিন্তু তাকে ছাড়তেও পারলাম না। কলকাতায় এনে বাড়ী ভাড়া করে রাখলাম। সেই থেকে এই বারো তের বছর তাকে স্ত্রীর মতই দেখে এসেছি। তাকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলুম, সে তো আপনি জানেন। ভাবতাম, সেও আমাকে স্বামীর মত ভালবাসে—কোনও দিন সন্দেহ হয়নি। বুঝতে পারিনি যে, পাপের রক্তে যার জন্ম, সে কখনও সাধ্বী হতে পারে না!—যাক, বুড়ো বয়সে যে শিক্ষা পেলাম, হয়তো পরজন্মে কাজে লাগবে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরা—তারা কোথায় গিয়েছে, আপনি জানেন কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"না। আর সে জেনেও কোন লাভ নেই। নিয়তি তাদের যে পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে পথে আপনি যেতে পারবেন না। আশুবাবু, আপনার অপরাধ সমাজের কাছে হয়তো নিন্দিত হবে, কিন্তু আমি আপনাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করব জানবেন। মনের দিক থেকে আপনি খাঁটি আছেন, কাদা ঘেঁটেও আপনি নির্মল থাকতে পেরেছেন এইটেই আপনার সব চেয়ে বড় প্রশংসার কথা। এখন আপনার খুবই আঘাত লেগেছে, এ রকম বিশ্বাসঘাতকতায় কার না লাগে? কিন্তু ক্রমে বুঝবেন, এর চেয়ে ইষ্ট আপনার আর কিছু হতে পারত না।"

আশুবাবু আবেগপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু আপনার কাছে আমি যে সান্ত্বনা পেলাম, এ আমি কোথাও প্রত্যাশা করিনি। নিজের লজ্জাকর পাপের ফল যে ভোগ করে, তাকে কেউ সহানুভূতি দেখায় না, তাই তার প্রায়শ্চিত্ত এত ভয়ঙ্কর। আপনার সহানুভূতি পেয়ে আমার অর্ধেক বোঝা হাল্কা হয়ে গেছে। আর বেশী কি বলব, চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।"

আশুবাবু বিদায় লইবার পর তাহার অদ্ভুত ট্র্যাজেডির ছায়ায় মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শয়নের পূর্বে ব্যোমকেশকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আশুবাবুকে খুন করবার চেষ্টার পেছনে যে বিলাস উকীল আর ঐ স্ত্রীলোকটা আছে, এ কথা তুমি কবে জানলে?"

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইয়া বলিল,—"কাল বিকেলে।"

"তবে পালাবার আগে তাদের ধরলে না কেন?"

"ধরলে কোন লাভ হত না, তাদের অপরাধ কোনও আদালতে প্রমাণ হত না।"

"কিন্তু তাদের কাছ থেকে আসল হত্যাকারী গ্রামোফোন পিনের আসামীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারত।"

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—"তা যদি সম্ভব হত, তাহলে আমি নিজে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করতুম না।"

"তুমি তাদের তাড়িয়েছ?"

"হ্যাঁ। আশুবাবু দৈবক্রমে বেঁচে যাওয়াতে তারা উড়ু উড়ু করছিলই, আমি আজ সকালে বিলাস উকীলের বাড়ী গিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে আমি অনেক কথাই জানি, যদি এই বেলা সরে না পড়েন তো হাতে দড়ি পড়বে। বিলাস উকীল বুদ্ধিমান লোক, সন্ধ্যার গাড়ীতেই বামাল সমেত নিরুদ্দেশ হলেন।"

"কিন্তু ওদের তাড়িয়ে তোমার লাভ কি হল?"

ব্যোমকেশ একটা হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"লাভ এমন কিছু নয়, কেবল একটু দুষ্টের দমন করা গেল। বিলাস উকীল শুধু হাতে নিরুদ্দেশ হবার লোক নন, মক্কেলের টাকাকড়ি যা তার কাছে ছিল, সমস্তই সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং এতক্ষণে বোধ করি, বর্ধমানের পুলিস তাকে হাজতে পুরেছে—আগে থাকতেই তারা খবর জানত

কি না! যা হোক, বিলাসচন্দ্রের দু'বচ্ছর সাজা কেউ ঠেকাতে পারবে না। যদিও ফাঁসিই তার উচিত শাস্তি, তবু তা যখন উপস্থিত দেওয়া যাচ্ছে না, তখন দু'বচ্ছরই বা মন্দ কি?"

পরদিন প্রাতঃকালে একজন অপরিচিত আগন্তুক দেখা করিতে আসিল।

সবেমাত্র চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া খবরের কাগজখানা খুলিবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সচকিত হইয়া বলিল,—"কে? ভেতরে আসুন।"

একটি ভদ্রবেশধারী সুশ্রী যুবক প্রবেশ করিল। দাড়িগোঁফ কামানো, একহারা ছিপছিপে গড়ন, বয়স ত্রিশের মধ্যেই—চেহারা দেখিলে মনে হয়, একজন অ্যাথলেট। সম্মুখে আমাদের দেখিয়া স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিল,—"কিছু মনে করবেন না, সকালবেলাই বিরক্ত করতে এলাম। আমার নাম প্রফুল্ল রায়—আমি একজন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট।" বলিয়া অনাহূতভাবেই একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বিরস স্বরে বলিল,—"আমাদের জীবনবীমা করবার মত পয়সা নেই।"

প্রফুল্ল রায় হাসিয়া উঠিল। এক একজন লোক আছে, যাহাদের মুখ দেখিতে বেশ সুশ্রী, কিন্তু হাসিলেই মুখের চেহারা বদলাইয়া যায়। দেখিলাম, প্রফুল্ল রায়েরও তাহাই হইল। লোকটি বোধ হয় অতিরিক্ত পানখোর, কারণ, দাঁতগুলো পানের রসে রক্তাক্ত হইয়া আছে। সুন্দর মুখ এত সহজে এমন বিকৃত হইতে পারে দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়। প্রফুল্ল রায় হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আমি বীমা কোম্পানীর লোক বটে, কিন্তু ঠিক বীমার কাজে আপনাদের কাছে আসিনি। অবশ্য আজকাল আমাদের আসতে দেখলে আত্মীয়-স্বজনরাও দোরে খিল দিতে আরম্ভ করেছেন; নেহাৎ দোষ দেওয়াও যায় না। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন, উপস্থিত আমার কোনও দুরভিসন্ধি নেই।—আপনারই নাম তো ব্যোমকেশবাবু? বিখ্যাত ডিটেকটিভ? আপনার কাছে একটু প্রাইভেট পরামর্শ নিতে এসেছি, মশায়। যদি আপত্তি না থাকে—"

ব্যোমকেশ বেজারভাবে মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল,—"পরামর্শ নিতে হলে অগ্রিম কিছু দর্শণী দিতে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল,—"আমার কথা অবশ্য গোপনীয় কিছু নয়, তবু—" বলিয়া অর্থপূর্ণভাবে আমার পানে চাহিল।

আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া ব্যোমকেশ বেশ একটু কড়া সুরে বলিল,—"উনি আমার সহকারী এবং বন্ধু। যা বলবেন, ওঁর সামনেই বলুন।"

প্রফুল্ল রায় বলিল,—"বেশ তো, বেশ তো। উনি যখন আপনার সহকারী, তখন আর আপত্তি কিসের? আপনার নামটি—? মাফ করবেন অজিতবাবু, আপনি যে ব্যোমকেশবাবুর বন্ধু, তা আমি বুঝতে পারিনি। আপনি ভাগ্যবান লোক মশায়, সর্বদা এত বড় একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে সঙ্গে থাকা, কত রকম বিচিত্র crime এর মর্মোদ্‌ঘাটনে সাহায্য করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আপনার জীবনের একটা মুহূর্তও বোধ হয় dull নয়! আমার এক এক সময় মনে হয়, এই একঘেয়ে বীমার কাজ ছেড়ে আপনার মত জীবন যাপন করতে যদি পারতাম—" বলিয়া পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির করিয়া একটা পান মুখে দিল।

ব্যোমকেশ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল, বলিল,—"এইবার আপনার পরামর্শের বিষয়টা যদি প্রকাশ করে বলেন,—তাহলে সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"এই যে বলি।—আমি বীমা কোম্পানীর এজেন্ট, তা তো আগেই শুনেছেন। বম্বের জুয়েল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর তরফ থেকে আমি কাজ করি। কোম্পানীর হয়ে দশ বারো লাখ টাকার কাজ আমি করেছি, তাই কোম্পানী খুশী হয়ে আমাকে কলকাতা অফিসের চার্জ দিয়ে পাঠিয়েছেন। গত আট মাস আমি স্থায়িভাবে কলকাতাতেই আছি।

"প্রথম মাস দুই বেশ কাজ চালিয়েছিলাম মশাই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এক আপদ এসে জুটল। কারুর নাম করবার দরকার নেই, কিন্তু অন্য বীমা কোম্পানীর একটা লোক আমার পেছনে লাগল। চুনোপুঁটির কারবার আমি করি না, দু' চার হাজারের কাজ আমার অধীনস্থ এজেন্টরাই করে, কিন্তু বড় বড় খদ্দেরের বেলা আমি নিজে কাজ করি। এই লোকটা আমার বড় বড় খদ্দের—ভাল ভাল লাইফ—ভাঙাতে আরম্ভ করলে। আমি যেখানে যাই, আমার পেছু পেছু সে-ও সেখানে গিয়ে হাজির হয়—কোম্পানীর নামে নানারকম দুর্নাম দিয়ে খদ্দের ভড়কে দেয়। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, বড় বড় লাইফগুলো আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

"এইভাবে চার পাঁচ মাস কাটল। কোম্পানী থেকে তাগাদা আসতে লাগল, কিন্তু কি করব, কেমন করে লোকটার হাত থেকে ব্যবসা বাঁচাব, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। মামলা-মোকদ্দমা করাও সহজ নয়—তাতে কোম্পানীর ক্ষতি হয়। অথচ ছিনে জোঁক পেছনে লেগেই আছে। আরও মাসখানেক কেটে গেল, লোকটাকে জব্দ করবার কোনও উপায়ই ভেবে পেলাম না।"

প্রফুল্ল রায় মনিব্যাগ হইতে সযত্নে রক্ষিত দু'টি চিরকুট বাহির করিয়া ছোট টুকরাটি ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল,—"দিন বারো চোদ্দ আগে এই বিজ্ঞাপনটি হঠাৎ চোখে পড়ল। আপনার নজরে বোধহয় পড়েনি, পড়বার কথাও নয়। কিন্তু পাঁচ লাইনের বিজ্ঞাপন হলে কি হয় মশাই, পড়বামাত্র আমার প্রাণটা লাফিয়ে উঠল। পথের কাঁটা আর কাকে বলে? ভাবলাম, দেখি তো আমার পথের কাঁটা উদ্ধার হয় কি না। মনের তখন এমনই অবস্থা যে, স্বপ্নাদ্য মাদুলী হলেও বোধ করি আপত্তি করতাম না।"

গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, এ সেই পথের কাঁটার বিজ্ঞাপনের কাটিং। প্রফুল্ল রায় বলিল,—"পড়লেন তো? বেশ মজার নয়? যা হোক, আমি তো নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ গত শনিবারের আগের শনিবার কন্দমতলায় কেষ্ট ঠাকুরের মত ল্যাম্পপোস্ট ধরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে অস্বস্তির কথা আর কি বলব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা—কোথাও নেউ নেই। ডিস্‌গাসটেড হয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখি, পকেটে একখানা চিঠি!"

দ্বিতীয় কাগজখানা ব্যোমকেশকে দিয়া বলিল,—"এই দেখুন সে চিঠি।"

ব্যোমকেশ চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল, আমি উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলাম—ঠিক আমার পত্রেরই অনুরূপ, কেবল রবিবারের পরিবর্তে আগামী সোমবার ১১ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ আছে।

প্রফুল্ল রায় একটু থামিয়া চিঠিখানা পড়িবার অবকাশ দিয়া বলিতে লাগিল,—"একে তো পকেটে চিঠি এল কি করে, ভেবেই পেলাম না, তার ওপর চিঠি পড়ে অজানা আতঙ্কে ভেতরটা কেঁপে উঠল। আমি মিষ্টি ভালবাসি না মশাই, কিন্তু এ চিঠির যেন আগাগোড়াই মিষ্টি। যেন কি একটা ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি এর মধ্যে লুকোনো রয়েছে। নইলে সব তাতেই এত লুকোচুরি কেন? লোকটা কে, কি রকম প্রকৃতি, কিছুই জানি না, তার চেহারাও দেখিনি, অথচ সে আমাকে রাত দুপুরে একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে একলা যেতে বলেছে। ভয়ঙ্কর সন্দেহের কথা নয় কি? আপনিই বলুন তো?"—বলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি উত্তর দিবার পূর্বেই ব্যোমকেশ বলিল,—"উনি কি মনে করেন সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন! আপনি কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান, তাই বলুন।"

প্রফুল্ল রায় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি। চিঠির লেখককে চিনি না অথচ তার ভাবগতিক দেখে সন্দেহ হয়, লোক ভাল নয়। এ রকম অবস্থায় চিঠির উত্তর নিয়ে আমার যাওয়া উচিত হবে কি? আমি নিজে গত দশ বারো দিন ধরে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারিনি; অথচ যেতে হলে মাঝে আর একটি দিন বাকী। তাই কি করব ঠিক করতে না পেরে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"দেখুন, আজ আমি আপনাকে কোনও পরামর্শ দিতে পারলাম না। আপনি এই কাগজ দু'খানা রেখে যান, এখনও যথেষ্ট সময় আছে, কাল সকালে বিবেচনা করে আমি আপনাকে যথাকর্তব্য বলে দেব।"

প্রফুল্ল রায় বলিল,—"কিন্তু কাল সকালে তো আমি আসতে পারব না, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। আজ রাত্রে সুবিধে হবে না কি? মনে করুন, আটটা কি ন'টার সময় যদি আসি?"

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না, আজ রাত্রে আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকব—আমাকেও এক জায়গায় যেতে হবে—" বলিয়া ফেলিয়াই সচকিতে প্রফুল্ল রায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল,—"কিন্তু আপনার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই, কাল বিকেলে চারটে সাড়ে চারটের সময় এলেও যথেষ্ট সময় থাকবে।"

"বেশ, তাই আসব—" পকেট হইতে আবার ডিবা বাহির করিয়া দুটো পান মুখে পুরিয়া ডিবাটা আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"পান খান কি? খান না!—আমরা এক একটা বদ অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারি না; ভাত না খেলেও চলে, কিন্তু পানের অভাবে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। আচ্ছা—আজ উঠি তাহলে, নমস্কার।"

আমরা প্রতিনমস্কার করিলাম। দ্বার পর্যন্ত গিয়া রায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"পুলিসে এ বিষয়ে খবর দিলে কেমন হয়? আমার তো মনে হয়, পুলিস যদি তদন্ত করে লোকটার নামধাম বিবরণ বের করতে পারে।"

ব্যোমকেশ হঠাৎ মহা খাপ্পা হইয়া বলিল,—"পুলিসের সাহায্য যদি নিতে চান, তাহলে আমার কাছে কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করবেন না। আমি আজ পর্যন্ত পুলিসের সঙ্গে কাজ করিনি, করবও না।—এই নিয়ে যান আপনার টাকা।" বলিয়া টেবিলের উপর নোটখানা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

"না না, আমি আপনার মতামত জানতে চেয়েছিলাম মাত্র। তা আপনার যখন মত নেই, আচ্ছা, আসি তাহলে—" বলিতে বলিতে প্রফুল্ল রায় দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

প্রফুল্ল রায় চলিয়া গেলে ব্যোমকেশও নোটখানা তুলিয়া লইয়া নিজের লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিল, তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সে মাঝে মাঝে অকারণে খিটখিটে হইয়া উঠে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ একাকী থাকিবার পর সেভাব আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা আমি জানিতাম। তাই মনটা বহু প্রশ্ন-কন্টকিত হইয়া থাকিলেও অপঠিত সংবাদপত্রখানা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলাম।

কয়েক মিনিট পরে শুনিতে পাইলাম, ব্যোমকেশ পাশের ঘরে কথা কহিতেছে। বুঝিলাম, কাহাকেও টেলিফোন করিতেছে। দু'একটা ইংরাজী শব্দ কানে আসিল; কিন্তু কাহাকে টেলিফোন করিতেছে, ধরিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘন্টা ধরিয়া কথাবার্তা চলিল, তারপর দরজা খুলিয়া ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলাম, তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাকে ফোন করলে?"

সে কথার উত্তর না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"কাল এস্প্ল্যানেড থেকে ফেরবার সময় একজন তোমার পেছু নিয়েছিল জানো?"

আমি চকিত হইয়া বলিলাম,—"না! নিয়েছিল না কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"নিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটার কি অসীম দুঃসাহস, আমি শুধু তাই ভাবছি।" বলিয়া নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

আমাকে অনুসরণ করার মধ্যে এতবড় দুঃসাহসিতা কি আছে, তা বুঝিলাম না; কিন্তু ব্যোমকেশের কথা মাঝে মাঝে এমন দুরূহ হেঁয়ালির মত হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহার অর্থবোধের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। অথচ এ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করাও বৃথা, সময় উপস্থিত না হইলে সে কিছুই বলিবে না। তাই আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্নানাদির জন্য উঠিয়া পড়িলাম।

দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যাবেলাটা ব্যোমকেশ নিষ্কর্মার মত বসিয়াই কাটাইয়া দিল। প্রফুল্ল রায় সম্বন্ধে দু'একটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে শুনিতেই পাইল না, চেয়ারে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল; শেষে চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"প্রফুল্ল রায়? ও, আজ সকালে যিনি এসেছিলেন? না, তাঁর সম্বন্ধে এখনও কিছু ভেবে দেখিনি।"

রাত্রিকালে আহারাদির পর নীরবে বসিয়া ধূমপান চলিতেছিল; ঘড়িতে ঠং করিয়া সাড়ে দশটা বাজিতেই ব্যোমকেশ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল,—এবার সাজসজ্জার আয়োজন আরম্ভ করা যাক, নইলে অভিসারিকাদের সঙ্কেতস্থলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"সে আবার কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"বাঃ, 'পথের কাঁটা'র নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে, মনে নেই?"

আমি আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"মাফ কর। এই রাত্রে একলা আমি সেখানে যেতে পারব না। যেতে হয়, তুমি যাও।"

"আমি তো যাবই, তোমারও যাওয়া চাই।"

"কিন্তু না গেলেই কি নয়? 'পথের কাঁটা'র সম্বন্ধে এত মিথ্যে কৌতূহল কেন? তার চেয়ে যদি গ্রামোফোন পিনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে, তাহলে যে ঢের কাজ হত।"

"হয়তো হত। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কৌতূহল চরিতার্থ করলেই বা মন্দ কি? গ্রামোফোন পিন তো আর পালাচ্ছে না। তা ছাড়া কাল প্রফুল্ল রায় পরামর্শ নিতে আসবে, তাকে পরামর্শ দেবার মত কিছু খবর তো চাই।"

"কিন্তু দু'জনে গেলে তো হবে না। চিঠিতে যে মাত্র একজনকে যেতে বলেছে।"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। এখন ওঘরে চল, সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হয়ে আসছে।"

লাইব্রেরীতে লইয়া গিয়া ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে আমার মুখসজ্জা করিয়া দিল। দেয়ালে লম্বিত দীর্ঘ আয়নাটায় উঁকি মারিয়া দেখিলাম, সেই গোঁফ এবং ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ইন্দ্রজাল প্রভাবে ফিরিয়া পাইয়াছি, কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যোমকেশ নিজের বেশভূষা আরম্ভ করিল; মুখের কোনও পরিবর্তন করিল না, দেরাজ হইতে কালো রঙের সাহেবী পোষাক বাহির করিয়া পরিধান করিল, পায়ে কালো রবার-সোল জুতা পরিল। তারপর আমাকে আয়নার সম্মুখে পাঁচ ছয় হাত দূরে দাঁড় করাইয়া নিজে আমার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল,—"আয়নায় আমাকে দেখতে পাচ্ছ?"

"না।"

"বেশ। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাও—এবার দেখতে পেলে?"

"না।"

"ব্যস্—কাম ফতে। এখন শুধু একটি পোষাক পরতে বাকী আছে।"

"আবার কি?"

ঘরে ঢুকিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের টেবিলের উপর দু'টি চীনামাটির প্লেট রাখা আছে—হোটেলে যেরূপ আকৃতির প্লেটে মটন চপ খাইতে দেয়, সেইরূপ। সেই প্লেট একখানা ব্যোমকেশ আমার বুকের উপর উপুড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া চওড়া ন্যাকড়ার ফালি দিয়া শক্তভাবে বাঁধিয়া দিল। বলিল,—"সাবধান, খসে না যায়। ওর ওপর কোট পরলেই আর কিছু দেখা যাবে না।"

আমি ঘোর বিস্ময়ে বলিলাম,—"এ সব কি হচ্ছে?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"কঞ্চুকী না পরলে চলবে কেন। ভয় নেই, আমিও পরছি।"

দ্বিতীয় প্লেটখানা ব্যোমকেশ নিজের ওয়েস্টকোটের ভিতরে পুরিয়া বোতাম লাগাইয়া দিল, বাঁধিবার প্রয়োজন হইল না।

এইরূপে বিচিত্র প্রসাধন শেষ করিয়া রাত্রি এগারটা কুড়ি মিনিটের সময় আমরা বাহির হইলাম। দেরাজ হইতে কয়েকটা জিনিস পকেটে পুরিতে পুরিতে ব্যোমকেশ বলিল,—"চিঠি নিয়েছ? কি সর্বনাশ, নাও নাও, শীগ্‌গির একখানা সাদা খামের মধ্যে পুরে নাও—"

শিয়ালদহের মোড়ের উপর একটা খালি ট্যাক্সি পাইয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। পথ জন-বিরল, দোকান-পাট প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের ট্যাক্সি নির্দেশমত হু হু করিয়া চৌরঙ্গীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

কালীঘাট ও খিদিরপুরের ট্রাম-লাইন যেখানে বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানে ট্যাক্সি হইতে নামিলাম। ট্যাক্সি-চালক ভাড়া লইয়া হর্ণ বাজাইয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, প্রশস্ত রাজপথের উপর কোথাও একটি লোক নাই, চতুর্দিকে অসংখ্য উজ্জ্বল দীপ যেন এই প্রাণহীন নিস্তব্ধতাকে ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। ঘড়িতে তখনও বারোটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী।

কি করিতে হইবে, গাড়ীতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। আমি আগে আগে চলিলাম, ব্যোমকেশ ছায়ার মত আমার পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার কালো পরিচ্ছদ ও শব্দহীন জুতা আমার কাছেও যেন তাহাকে কায়াহীন করিয়া তুলিল। আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলাইয়া সে আমার ঠিক ছয় ইঞ্চি পশ্চাতে চলিয়াছে, তবু মনে হইল যেন আমি একাকী। রাস্তার আলো অতি বিস্তৃত পথকে আলোকিত করিয়াছে বটে, কিন্তু সে আলো খুব স্পষ্ট ও তীব্র নহে। পথের দুই পাশে প্রাসাদ থাকিলে আলো প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর হয়, এখানে তাহা হইতেছে না। দুই দিকের শূন্যতা যেন আলোর অর্ধেক তেজ গ্রাস করিয়া লইতেছে।

এই অবস্থায় সম্মুখ হইতে আসিয়া কাহারও সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারে আমি একা নহি, আমার পশ্চাতে আর একটি অন্ধকার মূর্তি নিঃশব্দে চলিয়াছে।

পাশের ট্রাম-লাইনে ট্রামের যাতায়াত বহু পূর্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ দিকে রেসকোর্সের সাদা রেলিং একটানা ভাবে চলিয়াছে। আমি রাস্তার মাঝখান ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। দূরে পশ্চাতে একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া মধ্যরাত্রি ঘোষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শহরের অন্য ঘড়িগুলো ও বাজিতে আরম্ভ করিল, মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা নানা প্রকার সুমিষ্ট শব্দে ঝংকৃত হইয়া উঠিল।

ঘড়ির শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"এইবার চিঠিখানা হাতে নাও।"

ব্যোমকেশ যে পিছনে আছে, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। চমকিয়া পকেট হইতে খামখানা বাহির করিয়া হাতে লইলাম।

আরও ছয় সাত মিনিট চলিলাম। খিদিরপুর পুল পৌছিতে তখনও প্রায় অর্ধেক পথ বাকী আছে, এমন সময় সম্মুখে বহু দূরে একটা ক্ষীণ আলোকবিন্দু দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিলাম। কানের কাছে শব্দ হইল,—"আসছে—তৈরী থাকো।"

আলোকবিন্দু উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। মিনিটখানেকের মধ্যে দেখা গেল, পিচঢালা কালো রাস্তার উপর কৃষ্ণতর একটা বস্তু দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বাইসিক্ল-আরোহীর মূর্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমি দাঁড়াইয়া পড়িয়া খামসমেত হাতখানা পাশের দিকে বাড়াইয়া দিলাম। সম্মুখে বাইসিক্লের গতিও মন্থর হইল।

রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাইসিক্ল পঁচিশ গজের মধ্যে আসিল; তখন দেখিতে পাইলাম, কালো স্যুটপরিহিত আরোহী সম্মুখে ঝুঁকিয়া মোটর-গগলের ভিতর দিয়া অমাকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখিতেছে।

মধ্যম-গতিতে সাইক্ল যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের মধ্যে যখন আর দশ গজ মাত্র ব্যবধান, তখন কড়াং কড়াং করিয়া সাইক্লের ঘন্টি বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বুকে দারুণ ধাক্কা খাইয়া আমি প্রায় উল্টাইয়া পড়িয়া গেলাম। আমার বুকে বাঁধা প্লেটটা শত খণ্ডে ভাঙিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

তারপর নিমিষের মধ্যে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। আমি টলিয়া পড়িতেই ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে সম্মুখদিকে লাফাইয়া পড়িল। বাইসিক্ল-আরোহী আমার পশ্চাতে আর একটা লোকের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তবু সে পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ব্যোমকেশ তাহাকে এক ঠেলায় বাইসিক্ল সমেত ফেলিয়া দিয়া বাঘের মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল।

আমি মাটি হইতে উঠিয়া ব্যোমকেশের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সে প্রতিপক্ষের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং দুই বজ্রমুষ্টিতে তাহার দুই কব্জি ধরিয়া আছে। বাইসিক্লখানা একধারে পড়িয়া আছে।

আমি পৌঁছিতেই ব্যোমকেশ বলিল,—"অজিত, আমার পকেট থেকে সিল্কের দড়ি বার করে এর হাত দুটো বাঁধো—খুব জোরে।"

লিকলিকে সরু রেশমের দড়ি ব্যোমকেশের পকেট হইতে বাহির করিয়া ভূপতিত লোকটার হাত দুটা শক্ত করিয়া বাঁধিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—"ব্যস্‌, হয়েছে। অজিত, ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারছ না? ইনি আমাদের সকালবেলার বন্ধু প্রফুল্ল রায়! আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় যদি চাও, ইনিই গ্রামোফোন পিন রহস্যের মেঘনাদ!" বলিয়া তাহার চোখের গগল খুলিয়া লইল।

অতঃপর আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু সেই অবস্থাতে থাকিয়াও প্রফুল্ল রায় হিংস্র দন্তপংক্তি বাহির করিয়া হাসিল, বলিল—"ব্যোমকেশ বাবু, এবার আমার বুকের উপর থেকে নেমে বসতে পারেন, আমি পালাব না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অজিত, এর পকেটগুলো ভাল করে দেখে নাও তো অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে কি না।"

এক পকেট হইতে অপেরা গ্লাস ও অন্য পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির হইল, আর কিছুই নাই। ডিবা খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে তখনও গোটা চারেক পান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বুকের উপর হইতে নামিলে প্রফুল্ল রায় উঠিয়া বসিল, ব্যোমকেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। কারণ, আমি আপনার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু আপনি করেননি। শত্রুর শক্তিকে তুচ্ছ করতে নেই, এ শিক্ষা একটু দেরিতে পেলাম, কাজে লাগাবার ফুরসত হবে না।" বলিয়া ক্লিষ্টভাবে হাসিল।

ব্যোমকেশ নিজের বুক-পকেট হইতে একটা পুলিস হুইসল বাহির করিয়া সজোরে তাহাতে ফুঁ দিল, তারপর আমাকে বলিল,—"অজিত, বাইসিক্লখানা তুলে সরিয়ে রাখো। কিন্তু সাবধান, ওর ঘন্টিতে হাত দিও না, বড় ভয়ানক জিনিস!"

প্রফুল্ল রায় হাসিল,—"সবই জানেন দেখছি, আপনি অসাধারণ লোক। আপনাকেই ভয় ছিল, তাই তো আজ এই ফাঁদ পেতেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি একলা আসবেন নিভৃতে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু আপনি সব দিক দিয়েই দাগা দিলেন। ভাল অভিনয় করতে পারি বলে আমার অহঙ্কার ছিল; কিন্তু আপনি আরও উচ্চশ্রেণীর আর্টিস্ট। আপনি আমার ছদ্মবেশ খুলে আমার মনটাকে উলঙ্গ করে আজ সকালবেলা দেখে নিয়েছিলেন আর আমি শুধু আপনার মুখোশটাই দেখেছিলাম!—যাক, গলাটা বেজায় শুকিয়ে গেছে। একটু জল পাব কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"জল এখানে নেই, থানায় গিয়ে পাবেন।" প্রফুল্ল রায় ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল,—"তাও তো বটে, জল এখানে পাওয়া যায় কোথা!" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পানের ডিবাটার দিকে একটা সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"একটা পান পেতে পারি না কি? অবশ্য আসামীকে পান খাওয়াবার রীতি নেই সে আমি জানি, কিন্তু পেলে তৃষ্ণাটা নিবারণ হত।"

ব্যোমকেশ আমাকে ইঙ্গিত করিল, আমি ডিবা হইতে দু'টো পান তাহার মুখে পুরিয়া দিলাম। পান চিবাইতে চিবাইতে প্রফুল্ল রায় বলিল,—"ধন্যবাদ; বাকী দুটো আপনারা ইচ্ছে করলে খেতে পারেন।"

ব্যোমকেশ উৎকর্ণভাবে পুলিসের আগমনশব্দ শুনিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িল। দূরে মোটর-বাইকের ফট্‌ ফট্‌ শব্দ শুনা গেল। প্রফুল্ল রায় বলিল,—"পুলিস এসে পড়ল। আমাকে তাহলে ছাড়বেন না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"ছাড়ব কি রকম?"

প্রফুল্ল রায় ঘোলাটে রকম হাসিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল,—"পুলিসে দেবেনই?"

"দেব বৈকি।"

"ব্যোমকেশবাবু, বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হয়। আপনি আমাকে পুলিসে দিতে পারবেন না—" বলিয়া রাস্তার উপর ঢলিয়া পড়িল।

একটা মোটর-বাইক সশব্দে আসিয়া পাশে থামিল, একজন ইউনিফর্ম পরা সাহেব তাহার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল,—"What's up? Dead?"

প্রফুল্ল রায় নিষ্প্রভ চক্ষু খুলিয়া বলিল,—"এ যে খোদ কর্তা দেখছি! টু লেট সাহেব, আমায় ধরতে পারলে না। ব্যোমকেশবাবু, পানটা খেলে ভাল করতেন, একসঙ্গে যাওয়া

যেত। আপনার মত লোককে ফেলে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে!" হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া প্রফুল্ল রায় চক্ষু মুদিল। তাহার মুখখানা হঠাৎ শক্ত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে এক লরি পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কমিশনার সাহেব নিজে হাতকড়ি লইয়া অগ্রসর হইতেই ব্যোমকেশ প্রফুল্ল রায়ের মাথার কাছ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"হাতকড়ার দরকার নেই। আসামী পালিয়েছে।"

*

আমি আর ব্যোমকেশ আমাদের চিরাভ্যস্ত বসিবার ঘরটিতে মুখোমুখি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। খোলা জানালা দিয়া সকালবেলার আলো ও বাতাস ঘরে ঢুকিতেছিল। ব্যোমকেশ একটি বাইসিক্লের বেল্ হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। টেবিলের উপর একখানা সরকারী খাম খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল।

ব্যোমকেশ ঘন্টির মাথাটা খুলিয়া ভিতরের যন্ত্রপাতি সপ্রশংস নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"কি অদ্ভুত লোকটার মাথা। এ রকম একটা যন্ত্র যে তৈরী করা যায়, এ কল্পনাও বোধ করি আজ পর্যন্ত কারুর মাথায় আসেনি। এই যে পাকানো স্প্রিং দেখছ, এটি হচ্ছে এই বন্দুকের বারুদ,—কি নিদারুণ শক্তি এই স্প্রিংএর! কি ভয়ঙ্কর অথচ কি সহজ। এই ছোট্ট ফুটোটি হচ্ছে এর নল,—যে পথ দিয়ে গুলি বেরোয়। আর এই ঘোড়া টিপলে দু' কাজ একসঙ্গে হয়, ঘন্টিও বাজে, গুলিও বেরিয়ে যায়। ঘন্টির শব্দে স্প্রিংএর আওয়াজ চাপা পড়ে। মনে আছে—সেদিন কথা হয়েছিল—শব্দে শব্দ ঢাকে গন্ধ ঢাকে কিসে? এই লোকটা যে কত বড় বুদ্ধিমান, সেইদিন তার ইঙ্গিত পেয়েছিলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন যে একই লোক, এ তুমি বুঝলে কি করে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু ক্রমশঃ যেন নিজের অজ্ঞাতসারে ও দুটো মিলে এক হয়ে গেল। দেখ, পথের কাঁটা কি বলেছে? সে খুব পরিষ্কার করেই বলছে যে, যদি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে কোনও প্রতিবন্ধক থাকে তো সে তা দূর করে দেবে—অবশ্য কাঞ্চন বিনিময়ে। পারিশ্রমিকের কথাটা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, এটা যে তার অনাহারী পরহিতৈষা নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। তারপর এ দিকে দেখ, যাঁরা গ্রামোফোন পিনের ঘায়ে মরেছেন, তাঁরা সকলেই কারুর না কারুর সুখের পথে কাঁটা হয়ে বেঁচেছিলেন। আমি মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর কোনও ইঙ্গিত করতে চাই না, কারণ যে-কথা প্রমাণ করা যাবে না, সে কথা বলে কোনও লাভ নেই। কিন্তু এটাও লক্ষ্য না করে থাকা যায় না যে, মৃত ব্যক্তিরা সকলেই অপুত্রক ছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী কোনও ক্ষেত্রে ভাগ্নে, কোনও ক্ষেত্রে ভাইপো, কোনও ক্ষেত্রে বা জামাই। আশুবাবু এবং তাঁর রক্ষিতার উপাখ্যান থেকে এই ভাইপো-ভাগ্নে-জামাইদের মনোভাব কতক বোঝা যায় না কি?

"তবেই দেখা যাচ্ছে, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন বাইরে পৃথক হলেও বেশ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে জোড় লেগে যাচ্ছে—ভাঙা পাথরবাটির দু'টো অংশ যেমন সহজে জোড় লেগে যায়। আর একটা জিনিস প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—

একটার নামের সঙ্গে অন্যটার কাজের সাদৃশ্য। এদিকে 'পথের কাঁটা' নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে আর ওদিকে পথের ওপর কাঁটার মতই একটা পদার্থ দিয়ে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। মিলটা সহজেই চোখে পড়ে না কি?"

আমি বলিলাম,—"হয়তো পড়ে, কিন্তু আমার পড়েনি।"

ব্যোমকেশ অধীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"এ সব তো খুব সহজ অনুমানের বিষয়। আশুবাবুর কেস হাতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছিল—লোকটা কে? এইখানেই প্রফুল্ল রায়ের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রফুল্ল রায়কে যারা টাকা দিয়েছে খুন করবার জন্যে তারাও জানতে পারেনি, লোকটা কে এবং কি করে সে খুন করে। আত্মগোপন করবার অসাধারণ ক্ষমতাই ছিল তার প্রধান বর্ম। আমি তাকে কস্মিনকালেও ধরতে পারতুম কিনা জানি না, যদি না সে আমার মন বোঝবার জন্যে সেদিন নিজে এসে হাজির হত।

"কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। তুমি যেদিন পথের কাঁটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়েছিলে, সেদিন তোমার ভাবভঙ্গী দেখে তার সন্দেহ হয়। তবু সে তোমাকে চিঠি গছিয়ে দিয়ে গেল, তারপর অলক্ষ্যে তোমার অনুসরণ করলে। তুমি যখন এই বাড়ীতে এসে উঠলে তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে, তুমি আমারই দূত। আশুবাবুর কেস আমার হাতে এসেছে, তা সে জানত, কাজেই তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, আমি অনেক কথাই জানতে পেরেছি। অন্য লোক হলে কি করত বলা যায় না—হয়তো এ কাজ ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যেত; কিন্তু প্রফুল্ল রায়ের অসীম দুঃসাহস—সে আমার মন বুঝতে এল। অর্থাৎ আমি কতটা জানি এবং পথের কাঁটা সম্বন্ধে কি করতে চাই, তাই জানতে এল। এতে তার বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না, কারণ প্রফুল্ল রায়ই যে পথের কাঁটা এবং গ্রামোফোন পিন, তা জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং জানলেও তা প্রমাণ করতে পারতুম না।—শুধু একটি ভুল প্রফুল্ল রায় করেছিল।"

"কি ভুল?"

"সেদিন সকালে আমি যে তারই পথ চেয়ে বসেছিলুম, এটা সে বুঝতে পারেনি। সে যে খোঁজ-খবর নিতে আসবেই, এ আমি জানতুম।"

"তুমি জানতে! তবে আসবামাত্র তাকে গ্রেপ্তার করলে না কেন?"

"কথাটা নেহাৎ ইয়ের মত বললে, অজিত। তখন তাকে গ্রেপ্তার করলে মানহানির মোকদ্দমায় খেসারৎ দেওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ হত না। সে যে খুনী আসামী, তার প্রমাণ কিছু ছিল কি? তাকে ধরার একমাত্র উপায় ছিল—যাকে বলে in the act, রক্তাক্ত হস্তে। আর সেই চেষ্টাই আমি করেছিলুম। বুকে প্লেট বেঁধে দু'জনে যে গিয়েছিলুম, সে কি মিছিমিছি?

"যা হোক, প্রফুল্ল রায় আমার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলে যে, আমি অনেক কথাই জানি—শুধু বুঝতে পারলে না যে তাকেও চিনতে পেরেছি। সে মনে মনে ঠিক করলে যে, আমার বেঁচে থাকা আর নিরাপদ নয়। তাই সে আমাকে একরকম নিমন্ত্রণ করে গেল,—যেন রাত্রে রেসকোর্সের পাশের পথ দিয়ে যাই। সে জানত, একবার তোমাকে

পাঠিয়ে ঠকেছি, এবার আমি নিজে যাব। কিন্তু একটা বিষয়ে তার খটকা লাগল, আমি যদি পুলিস সঙ্গে নিয়ে যাই! তাই সে পুলিসের প্রসঙ্গ তুললে। কিন্তু পুলিসের নামে আমি এমনি চটে উঠলুম যে, প্রফুল্ল রায় খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল; আমাকে মনে মনে খরচের খাতায় লিখে রাখলে।

"বেচারা ঐ একটা ভুল করে সব মাটি করে ফেললে। শেষকালে তার অনুতাপও হয়েছিল। আমার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করা যে তার উচিত হয়নি, এ কথা সেদিন সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"তোমার মনে আছে, প্রথম যেদিন আশুবাবু আসেন, সেদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম বুকে ধাক্কা লাগবার সময় কোনও শব্দ শুনেছিলেন কি না? তিনি বলেছিলেন, বাইসিক্লের ঘন্টির আওয়াজ শুনেছিলেন। তখন সেটা গ্রাহ্য করিনি। আমার হাওড়া ব্রিজের ঐখানটাই জোড়া লাগছিল না। তারপর 'পথের কাঁটা'র চিঠি যখন পড়লুম এক নিমেষে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলুম—চিঠিতে একটি কথা পেয়েছি। সে কথাটি কি জানো—বাইসিক্ল!

"বাইসিক্লের কথা কেন যে তখন পর্যন্ত মাথায় ঢোকেনি, এটাই আশ্চর্য। বাস্তবিক, এখন ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, বাইসিক্ল ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। এমন সহজে অনাড়ম্বরভাবে খুন করবার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, সামনে একটা বাইসিক্ল পড়ল। বাইসিক্ল-আরোহী তোমাকে সরে যাবার জন্যে ঘন্টি দিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তুমিও মাটিতে পড়ে পটোলৎপাটন করলে। বাইসিক্ল-আরোহীকে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। কারণ সে দু হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে আছে—অস্ত্র ছুড়বে কি করে? তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

"একবার পুলিস ভারী বুদ্ধি খেলিয়েছিল, তোমার মনে থাকতে পারে। গ্রামোফোন পিনের শেষ শিকার কেদার নন্দী লালবাজারের মোড়ের উপর মরেছিলেন। তিনি পড়বামাত্র পুলিস সমস্ত ট্রাফিক বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যেক লোকের কাপড়-চোপড় পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখেছিল। কিন্তু কিছুই পেলে না। আমার বিশ্বাস, প্রফুল্ল রায়ও সেখানে ছিল এবং তাকেও যথারীতি সার্চ করা হয়েছিল। প্রফুল্ল রায় তখন মনে মনে খুব হেসেছিল নিশ্চয়। কারণ, তার বাইসিক্ল বেল্‌এর মাথা খুলে দেখবার কথা কোনও পুলিস-দারোগার মাথায় আসেনি।" বলিয়া ব্যোমকেশ সস্নেহে বেল্‌টি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

টেবিলের উপর হইতে সরকারী লম্বা খামখানা হওয়ায় উড়িয়া আমার পায়ের কাছে পড়িল। সেখানা তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পুলিস কমিশনার সাহেব কি লিখেছেন?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অনেক কথা। গোড়াতেই আমাকে পুলিস এবং সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিয়েছেন; তারপর প্রফুল্ল রায় আত্মহত্যা করাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন; যদিও এতে তাঁর খুশী হওয়াই উচিত ছিল—কারণ, গভর্নমেন্টের অনেক খরচ এবং মেহনত বেঁচে গেল। যা হোক, সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পুরস্কার যে আমি শীঘ্রই পাব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, পুলিস সাহেব জানিয়েছেন যে, দরখাস্ত করবামাত্র আমার আর্জি মঞ্জুর হবে, তার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। প্রফুল্ল রায়ের লাস কেউ সনাক্ত করতে পারেনি, জুয়েল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর লোকরা লাস দেখে বলেছে যে, এ তাদের প্রফুল্ল রায় নয়, তাদে প্রফুল্ল রায় উপস্থিত কর্ম উপলক্ষে যশোহরে আছেন। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রফুল্ল রায় নামটা ছদ্মনাম। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, আমার কাছে ও চিরকাল প্রফুল্ল রায়ই থাকবে। চিঠিটা উপসংহারে পুলিস সাহেব একটা নিদারুণ কথা লিখেছেন—এই ঘন্টিটি ফেরৎ দিতে হবে। এটা না কি এখন গভর্নমেন্টের সম্পত্তি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ওটার ওপর তোমার ভারী মায়া পড়ে গেছে—না? কিছুতেই ছাড়তে পারছ না?"

ব্যোমকেশও হাসিয়া ফেলিল,—"সত্যি, দু'হাজার টাকা পুরস্কারের বদলে সরকার বাহাদুর যদি আমাকে এই ঘন্টিটা বক্‌শিশ করেন, আমি মোটেই দুঃখিত হই না। যা হোক প্রফুল্ল রায়ের একটা স্মৃতিচিহ্ন তবু আমার কাছে রইল।"

"কি?"

"ভুলে গেলে? সেই দশ টাকার নোটখান। সেটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবো ভেবেছি। তার দাম এখন আমার কাছে একশ' টাকারও বেশী।" বলিয়া ব্যোমকেশ ঘন্টিটা সযত্নে দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল।

সে ফিরিয়া আসিলে আমি তাহাকে একটা প্রশ্ন করিলাম,—"আচ্ছা ব্যোমকেশ, সত্যি বল, পানের মধ্যে বিষ আছে তুমি জানতে?"

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"জানা এবং না জানার মাঝখানে একটা অনিশ্চিত স্থান আছে, সেটা সম্ভাবনার রাজ্য।" কিছুক্ষণ পরে আবার বলিয়া উঠিল,—"তুমি কি মনে কর প্রফুল্ল রায় যদি সামান্য খুনীর মত ফাঁসি যেত তাহলে ভাল হত? আমার তা মনে হয় না। বরং এমনি ভাবে যাওয়াই তার ঠিক হয়েছে, সে যে কতবড় আর্টিস্ট ছিল, ধরা পড়েও হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে।"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি কোথা দিয়া যে কোথায় গিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

"চিঠি হ্যায়।"

ডাক-পিয়ন একখানা রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়া গেল। ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া ভিতর হইতে কেবল একখানা রঙীন কাগজের টুকরা বাহির করিল, তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া সহাস্যে আমার দিকে বাড়াইয়া দিল।

দেখিলাম, শ্রীআশুতোষ মিত্রের দস্তখৎ-সম্বলিত একখানি হাজার টাকার চেক।



বেইমান বাটকারা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'একটা বাটকারা।'

'বাটকারা?'

'হ্যাঁ, বাটকারা বোঝো না? যাকে দাঁড়িপাল্লা বলে!'

'বাটকারাও বুঝি দাঁড়িপাল্লাও বুঝি; কিন্তু দাঁড়িপাল্লা নিয়ে তুমি করবে কি?'—রীতিমত বিরক্ত হয়ে বললাম, 'অনেক রকম গোয়েন্দাগিরির কথা শুনেছি, কিন্তু খুনের কিনারা করতে দাঁড়িপাল্লার কথা কখনো শুনি নি! আর দাঁড়িপাল্লার যদি তোমার কবিতার মিল চাও তো বলে দিচ্ছি, মাঝিমাল্লা বাক্‌তাল্লা যেটা খুশি লাগাতে পারো!'

কথাটা যে স্বনামধন্য গোয়েন্দা কবি পরাশর বর্মার সঙ্গে হচ্ছিল, তা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। কোথায় কেন কিভাবে হচ্ছিল তারই একটু একবার বলতে হয়।

সত্যিই একটা খুনের রহস্যের মীমাংসা করার মধ্যে পরাশরের ওই আজগুবি বায়না।

গোয়েন্দারা সাধারণত এই রকম এলোমেলো কথা বলে, কি গল্পের বইয়ে কি সত্যিকার জীবনে পাঠক বা সঙ্গীদের গুলিয়ে দেয়—এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। শার্লক হোমস থেকে শুরু করে, কাঁচা পাকা সব গোয়েন্দার ধরনই এই।

পরাশর কবিতা যত অদ্ভুতই লিখুক, গোয়েন্দাগিরিতে এই সনাতন ধারা থেকে আলাদা নয়।

খানিকটা আমায় একটু বোকা বানাবার জন্যেও হয়তো সে ওরকম গোলমেলে কথা বলে।

কিন্তু কোথায় সেকেন্দ্রাবাদের ধনকুবের ছোটিরাম বজৌরীর রহস্যজনক হত্যা আর কোথায় দাঁড়িপাল্লার খোঁজ—মাপ করার পক্ষে এটা গোয়েন্দার সাত-খুনের ওপর আট-খুন হয়ে যাচ্ছে নাকি!

হায়দ্রাবাদের খুনের রহস্যের কিনারা করতেই আমরা আসিনি। এসেছিলাম ক'দিনের জন্যে বেড়াতে। কিংবা কলিকাতার নাগাড়ে একঘেয়ে বৃষ্টি এড়াতে বলা যেতে পারে।

এসে এই খুনের ব্যাপারে পরাশরকে মাথা লাগাতে হয়েছে।

এখানকার গোয়েন্দা-বিভাগের রেড্ডি সাহেব পরাশরের পুরানো বন্ধু। তিনিই পরাশরের পরামর্শ নিতে একদিন এসেছেন আমাদের হোটেলে।

হায়দ্রাবাদ স্টেশনের কাছেই একটা মাঝারি গোছের হোটেলে আমরা দু-কামরার একটা স্যুইট নিয়ে আছি। এমন কিছু আহামরি হোটেলেও নয়। কিন্তু শহরের এইরকম

বুকের ওপর বসে থাকতেই পরাশর ভালোবাসে। এতে তার নাকি কবিতা আসে ভালো।

ইতিমধ্যে সে কতগুলো কবিতা লিখে ফেলেছে জানি না। আমাকে এখনো শুনতে বসতে হয়নি এই আমার সৌভাগ্য। পরাশর হোটেল থেকে বড়-একটা বেরোয় না। আমাদের দোতলার বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে তার কবিতার খোরাক জোগাড় করে। আমি ইতিমধ্যে হায়দ্রাবাদের যা কিছু দ্রষ্টব্য—সালারজঙ মিউজিয়াম থেকে গোলকুণ্ডা দুর্গ প্রায় সবই দেখে ফেলেছি।

হায়দ্রাবাদ থেকে এতদিনে হয়তো ফিরেই যেতাম। কিন্তু হঠাৎ দেশজোড়া রেলের ধর্মঘটে আটকে পড়তে হয়েছে।

আটকে না পড়লে বজৌরী হত্যারহস্যের মীমাংসা হতো কিনা সন্দেহ।

রেড্ডি সাহেব দেখা করতে এসে সেদিন বিকেলে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা জানালেন।

ছোটিরাম বজৌরী হায়দ্রাবাদের একজন ধনুকুবের। লোকটি কিন্তু অদ্ভুত প্রকৃতির। টাকার কুমীর হয়েও হাড়-কুঞ্জুস যাকে বলে। হায়দ্রাবাদেরই জোড়া শহর সেকেন্দ্রাবাদে একটা সাধারণ বাড়িতে থাকতেন। বাড়িটা দেখতে সাধারণ, কিন্তু কয়েকটা বিশেষত্ব আছে। সমস্ত বাড়িতে মাত্র তিনটি ঘর, একটিতে বজৌরী নিজে থাকতেন। আর একটিতে তাঁর প্রধান উত্তরাধিকারী ও ভাগ্নে রামসহায়। বাড়িতে এক বজৌরীর ঘরে ছাড়া বড় জানালা কোথাও নেই। সে জানালাটা থাকা একটু বিচিত্র, কারণ বাড়ির অন্য দরজা-জানালা প্রায় সেকেলে দুর্গের দরজা-জানালার মত ক্ষুদে ক্ষুদে ও মজবুত। সে দরজা দিয়ে মাথা নীচু করে ছাড়া সাধারণ মাপের লোক গলতে পারে না। সংকীর্ণ জানলা দিয়ে আকাশের আলোকেও ভয়ে ভয়ে ঢুকতে হয়।

শুধু বজৌরীর নিজের ঘরের জানালাটা যেমন প্রশস্ত তেমনি শুধু মোটা দামী কাচের সার্শি দিয়ে আঁটা। এত সাবধান হয়েও বজৌরীকে শুধু এই খেয়ালটুকুর জন্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে। তাঁর ওই কাচের সার্শি দেওয়া জানালাই ভেঙে কেউ কয়েক দিন আগে রাত্রে ঢুকে তাঁকে হত্যা করে গেছে। সে হত্যাকারী কে হতে পারে, বোঝা এইজন্যেই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে হাড়-কুঞ্জুস হলেও খুন করবার মত শত্রুতা তাঁর দুনিয়ায় কারুর সঙ্গে ছিল না। যে দুজনের ওপর কোনোরকম সন্দেহ আসতে পারে, তাদের একজন রামসহায় আর একজন রঘুনাথ নামে বজৌরীর আর এক ভাগ্নে। কিন্তু রঘুনাথ সেদিন হায়দ্রাবাদেই ছিল না বলে প্রায় অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। তা ছাড়া বয়সে এখনও এরকম যুবক হলেও চেহারায় সে একটি জলহস্তী বিশেষ। তার পক্ষে জানলার সার্শি ভেঙে ঢোকা অসম্ভব বললেই হয়।

বাড়ির মধ্যে একা রামসহায়ই ছিল। তার ঘর যদিও আলাদা আর বজৌরী যদিও নিজের ঘরে প্রতিদিন খিল দিয়ে শুতেন, তবু সন্দেহটা স্বাভাবিকভাবে তার ওপরই পড়েছে বেশি করে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, মামা বজৌরীকে হত্যা করবার কোনো উদ্দেশ্যই তার বেলায় পাওয়া যাচ্ছে না। মারা যাওয়ার চেয়ে মামা বেঁচে থাকলেই তার লাভ বেশি। বজৌরীর ওই দুই ভাগ্নে ছাড়া তিনকুলের কেউ নেই। ভাগ্নের

মধ্যে রামসহায়ই তাঁর প্রিয়। বছর দুই থেকে অন্য ভাগ্নে রঘুনাথের ওপর তিনি খাপ্পা হয়েই আছেন। রঘুনাথকে তাই বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকতে হয়। রামসহায় শুধু মামার সঙ্গে থাকে তা নয়, বজৌরীর বিষয়-আশয় ব্যবসা দেখা-শোনার সব ভার তার ওপরে। বজৌরী বছর কয়েক আগে উইল করে, দুই ভাগ্নেকে সমানভাবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন বটে, কিন্তু সে উইলও তিনি সম্প্রতি সপ্তাহখানেক আগে নাকি বদলাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ঘরের উকিল ইফতিকার সাহেবের কাছে। উইল বদলাবার ইচ্ছে যে কেন, তা বুঝতে কারও বাকি থাকেনি। সমানভাবে রঘুনাথ ও রামসহায়কে উত্তরাধিকারী করার বদলে রামসহায়কেই তিনি নিশ্চয় তাঁর সব কিছু দিয়ে যেতে মনস্থ করেছিলেন। সুতরাং উইল বদলাবার আগে তাঁর এই মৃত্যু আর যারই হোক রামসহায়ের বাঞ্ছনীয় হওয়ার কথা নয়। এ মৃত্যুতে সুবিধে যা কিছু হয়েছে তা রঘুনাথের।

একজনের বেলায় সুবিধে থাকলেও কারণ ও উদ্দেশ্যের অভাব, আর অপরজনের বেলায় উদ্দেশ্য ও কারণ থাকলেও সুবিধের ও প্রমাণের অভাব, এই দুই সমস্যা-সঙ্কটের মধ্যে পড়ে রেড্ডি সাহেব পরাশরের কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিলেন।

সমস্ত শুনে আমি অবশ্য একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এই দুই ভাগ্নে ছাড়া সন্দেহ করবার মত লোক কি আর কেউ নেই? এমনও তো হতে পারে যে, কোনো বদমাস গুণ্ডা কাচের জানলা ভেঙে ঢুকে বজৌরীকে খুন করে গেছে?'

কথাটা তুলে বেশ একটু গর্বভরেই রেড্ডি ও পরাশরের দিকে চেয়েছিলাম। এই সম্ভাবনার কথা পরাশরের অন্তত ভাবা উচিত ছিল।

পরাশর কিন্তু লজ্জিত হওয়ার বদলে কেমন একটু কৌতুকভরেই আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'রেড্ডি সাহেবের মাথায় কি ওরকম সম্ভাবনার কথা আসেনি মনে করো? নেহাৎ বাজে বানানো গোয়েন্দা-গল্পে ছাড়া পুলিশ অত আহাম্মক হয় না।'

রেড্ডি সাহেব হেসে আমাকেই যেন সান্ত্বনা দিতে বলেছিলেন, 'না না, পুলিশও ভুল করে বইকি! তবে এক্ষেত্রে ওরকম ভুল আশা করি হয়নি। বাইরের কোনো খুনে বদমাসেরও বজৌরীকে খুন করার একটা কোনো উদ্দেশ্য তো থাকা দরকার! শুধু হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদ নয়, এ অঞ্চলের কারুর জানতে বাকি নেই যে, বজৌরী পয়সা-কড়ির ব্যাপারে যেমন কৃপণ তেমনি হুঁসিয়ার ছিলেন। বাড়িতে তিনি দু-দশ টাকার বেশি কখনও রাখতেন না। প্রতিদিন ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে এনে তাঁর সংসার খরচ চলতো। সেই দু-দশ টাকার লোভে কাচের জানালা ভেঙে তাঁকে খুন করার ঝুঁকি কোনো গুণ্ডাই পারতপক্ষে নেবে না। এ ছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে, যার জন্যে খুনে গুণ্ডাদের ওপর সন্দেহ আসে না। বজৌরী নেহাৎ পাগলামির খেয়ালে অতবড় কাচের জানালা ঘরে বসায়নি। কাচের জানালার সঙ্গে এমন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ছিল যে, কাচের জানালার বাইরে থেকে কেউ ঘা দিলেই ভেতর থেকে তীব্র আলো জ্বলে উঠে বাইরে চারিদিক আলো করে দেবে, আর তার সঙ্গে সাইরেনের মত বিকট এক বিদ্যুৎ-যন্ত্র বাজতে থাকবে। বজৌরী সাহেবের সেকেন্দ্রবাদের বাড়িটা একটা নির্জন জায়গায় হলেও একেবারে লোকালয়ের বাইরে নয়। তাঁর বাড়ির পঞ্চাশ গজ দূরেই একটা বস্তি। অন্ধ্র দেশের একটা বড় পরব উপলক্ষে সেখানকার লোকেরা সেই বিশেষ রাত্রে সারারাত জেগে গান-বাজনা করেছে। ওরকম একটা বিদঘুটে আওয়াজ কিছুক্ষণ ধরে হলে তারা নিশ্চয় টের পেতো। কিন্তু......

পরাশর এই পর্যন্ত শুনে হঠাৎ বাধা দিয়ে বলেছিল, 'দাঁড়ান রেড্ডি সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন তো এইমাত্র যা বললেন, আর একবার তা শুনতে চাই।'

আমি শুধু নই, রেড্ডি সাহেবও একটু অবাক হয়েছিলেন এ অনুরোধে।

আমি তো বুঝতেই পারলাম না বজৌরী সাহেবের জানালার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার বর্ণনা দু'বার শুনবার আগ্রহ কেন হতে পারে! এরকম বৈদ্যুতিক প্যাঁচ তো আজগুবি, আশ্চর্য কিছু নয়। পরাশর নিজেই তো এরকম প্যাঁচ অনেক জানে। তার সঙ্গে আলাপের পর তার খিদিরপুরের বাড়িতে গিয়ে প্রথমবার রীতিমত চমকেই গিয়েছিলাম।

বিস্মিত হলেও রেড্ডি সাহেব পরাশরের অনুরোধ রেখে আবার আগের কথাগুলো বলেছিলেন।

পরাশর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বস্তির লোকেরা কোনো আলো দেখেনি বা কোনো আওয়াজ শোনেনি?'

'না।'—রেড্ডি সাহেব বলেছিলেন, 'খুব ভালো করে সে খোঁজ নিয়েছি। বস্তিসুদ্ধ লোকের মিথ্যে বলবার কোনো কারণ নেই। তাইতেই বোঝা যাচ্ছে জানালা ভেঙে ঢুকেই সে গুপ্ত সুইচটা অফ করে কল বিকল করে দিয়েছে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আলো জ্বলে উঠে হর্ন বেজে উঠলেও তা গান-বাজনায় মত্ত বস্তির লোকদের সজাগ করেনি। এখন এই গুপ্ত সুইচের কথা জানা সম্ভব শুধু দুজনের, রঘুনাথ আর রামসহায়ের। শুধু তাই নয়, বজৌরীকে হত্যা করা হয়েছে তাঁরই নিজের রিভলবার দিয়ে। সে রিভলবারও তাঁর খাটের মাথার একটি গোপন খোপে থাকতো। সে খোপের খবরও সাধারণ গুণ্ডা-বদমাসের জানার কথা নয়। সুতরাং আমাদের সন্দেহ.....

এইবার আমিই বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'মাপ করবেন রেড্ডি সাহেব, আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বজৌরীকে হত্যা করতে পারে মাত্র দুজন—রঘুনাথ আর রামসহায়, আর এ হত্যায় লাভ শুধু রঘুনাথের। কিন্তু রঘুনাথ যে সেদিন হায়দ্রাবাদের বাইরে ছিল তার অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। কি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ জানতে পারি?'

'সাক্ষ্য-প্রমাণ পুলিসেরই।'—রেড্ডি সাহেব হেসেছিলেন।

'পুলিশেরই!' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'হ্যাঁ, এখান থেকে কিছু দূরে বিদরী বলে একটা জায়গা আছে বোধ হয় জানেন, সেখানকার লোহার ওপর রুপোর মিনের কাজ শুধু ভারত নয় পৃথিবী বিখ্যাত। রঘুনাথ যে সেদিন বিদরীতে ছিল পুলিশই তার সাক্ষী, আর সেখানকার থানার ডায়েরী তার প্রমাণ। রঘুনাথ একেবারে যাকে বলে উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে। জুয়ার নেশায় সে একেবারে অমানুষ হয়ে গেছে। বজৌরীর তার ওপর খাপ্পা হবার কারণও ওই। সে-রাত্রে বিদরীর এক জুয়ার আড্ডায় সে খেলতে গিয়েছিল। পুলিশ সেই আড্ডায় হানা দিয়ে যাদের গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখে, তার মধ্যে রঘুনাথও একজন।'

'বুঝলাম।'—এইবার আমার আসল বানটি ছেড়েছিলাম, 'কিন্তু রঘুনাথ যদি ভাড়াটে কোনো গুণ্ডাকে দিয়ে এই খুন করিয়ে থাকে, তাকে বজৌরীর ঘরের সমস্ত গুপ্ত কায়দার হদিস দিয়ে!'

রেড্ডি সাহেব এবার চুপ করে গেছলেন। পরাশরও কিছু না বলে বেশ যেন প্রশংসার দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল।

রেড্ডি সাহেব কিছুক্ষণ বাদে চিন্তিত মুখে বলেছিলেন, 'এ কথাটা আমাদের যে মনে হয়নি, তা নয়। কিন্তু এ অঞ্চলের সব গুণ্ডাই আমাদের জানা। তন্নতন্ন করে খোঁজ নিয়ে যা জেনেছি, তাতে তাদের কেউ এ-কাজ করেছে বলে মনে হয় না।'

'আপনাদের এ অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও কি গুণ্ডা নেই?' রেড্ডি সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি বলেছিলাম, 'রঘুনাথের পক্ষে বাইরে কোনো জায়গার গুণ্ডা ভাড়া করে আনাই তো সুবিধে, আর সে তা নিশ্চয়ই করেছে।'

রেড্ডি সাহেব এবার একেবারে চুপ।

পরাশর পর্যন্ত মনে মনে এ যুক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে বুঝতে পারছিলাম। খানিক ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভেবে সে বলেছিল, 'আপনি তো এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করেননি, রেড্ডি সাহেব?

'না, তবে দুজনকেই নজরবন্দী রেখেছি।'

'তাহলে রঘুনাথের কাছে একবার নিয়ে যেতে পারেন?' অনুরোধ করেছিল পরাশর।

'নিশ্চয় পারি। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, তাকে জেরা করতে কিছুই বাকি রাখিনি। আর সে জেরা আর তার জবাব দুয়েরই লিখিত বিবরণ আপনাকে দিতে পারি।'

'বেশ তাই দেবেন! তবু এই জুয়াড়িটিকে একবার চাক্ষুষ দেখতে চাই।'—বলেছিল পরাশর।

রেড্ডি সাহেবের পুলিশের গাড়িতেই তারপর রঘুনাথের বাসায় গেলাম।

*　　*　　*　　*　　*

হায়দ্রাবাদ অতি সুন্দর পরিচ্ছন্ন শহর। কিন্তু তারও নোংরা ঘেঞ্জিপাড়া আছে। মামার স্নেহবঞ্চিত হয়ে রঘুনাথ এইরকম পাড়ারই একটি পুরোনো বাড়ির দুটি ঘর ভাড়া করে থাকে।

বেলা তখন প্রায় দশটা হবে।

কিন্তু রঘুনাথ তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি জানলাম তার চাকরের কাছে। রঘুনাথের চরিত্রে কোনো গুণের অভাব নেই বলেই মনে হলো। আগের রাত্রে মৌতাতটা একটু মাত্রাছাড়া হওয়াতেই বোধহয় এত বেলা পর্যন্ত ঘুম।

দুটি ঘরের একটি বসবার আর একটি শোবার। বসবার ঘরের আসবাবপত্রের সাজ-সজ্জার দুর্দশা দেখেই রঘুনাথের বর্তমান অবস্থা বোঝা কঠিন নয়।

ছোবড়া বেরুনো ময়লা দুটো কৌচ। রাজ্যের সিনেমা আর খেলাধুলার পুরোনো ছেঁড়া পত্রিকা ছড়ানো একটা টেবিল। তার দু'পাশে গোটা-তিনেক ভাঙা বেতের আর রং চটা টিনের চেয়ার। দেয়ালে ফিল্মের নামকরা সব নায়িকাদের ছবি নানা জায়গায় আঠা দিয়ে আঁটা। গোটা-চারেক সুন্দরী মেয়ের ছবি দেওয়া ক্যালেণ্ডার আর একদিকে দেয়ালে লাগানো একটা ব্র্যাকেটে গোটাকতক রুপো ও ব্রোঞ্জের খেলাধুলো ব্যায়ামে উৎকর্ষের পুরস্কার-স্বরূপ 'ট্রফি'!

রেড্ডি সাহেবের ধমকে চাকর শশব্যস্ত হয়ে মনিবকে জাগাতে ছুটলো। আমি ও রেড্ডি সাহেব ছেঁড়া কৌচের ওপরই বসলাম। পরাশর শুধু ঘুরে ঘুরে ওই ঘরে কি যে অত মনোযোগ দিয়ে দেখবার মতো কি পেলে সেই জানে!

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, কোনোরকমে মুখে চোখে একটু জল দিয়েই বোধহয় রাত্রের শোবার পোশাকেই রঘুনাথ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রেড্ডি সাহেবের দিকে চেয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, 'আবার জ্বালাতন করতে এসেছেন! এরকম দগ্ধে না মেরে একেবারে গ্রেপ্তার করলেই তো পারেন। সব ল্যাটা চুকে যায়!'

রেড্ডি সাহেব হেসে বললেন, 'ল্যাটা কি অত সহজে চোকে! গ্রেপ্তার করতে হলে আটঘাট বেঁধে তো করতে হবে, যাতে একবার বাঁধা পড়লে আর ফসকে পালাবার সুযোগ না পান!'

আমি রেড্ডি সাহেবের কথা বলার মধ্যে রঘুনাথকে ভালো করে লক্ষ্য করেছিলাম। রেড্ডি সাহেবের কাছে জলহস্তীর মতো চেহারা বলে তার যা বর্ণনা শুনেছিলাম, সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয় দেখলাম। চেহারা বিশাল ও বেশ একটু স্থূল হলেও বেশ আঁট-সাট।

পরাশরের পরের প্রশ্নে বুঝলাম সেও এটাই লক্ষ্য করেছে।

পরাশর তার চেহারার দিকেই যেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি এককালে ভালো খেলোয়াড় ছিলেন মনে হচ্ছে রঘুনাথজি?'

রঘুনাথ ভ্রূকুটির সঙ্গে পরাশরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, ছিলাম। তাতে অপরাধটা কি হয়েছে!'

'না, অপরাধ কেন হবে! এটা তো গর্বের কথা।' পরাশর হেসে বললে, 'বন্দুকটাও আপনি চালান ভালো দেখছি। একবার পিস্তল ছোঁড়ার সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়ে একটা ট্রফি পেয়েছেন দেখছি!

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' রঘুনাথের গলা আগের মতই রুক্ষ, 'কিন্তু এসব খোঁজে আপনার কি দরকার? কে আপনি?'

'মনে করুন আপনার হিতৈষী।' পরাশর হাসলো।

'আমার হিতৈষী!' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপভরে রঘুনাথ বললে, 'পুলিশের সঙ্গে এসেছেন আমার হিতৈষী সেজে!'

'পুলিশকেই বা আপনার শত্রু ভাবছেন কেন!' পরাশর এবার একটু গম্ভীর স্বরেই বললে, 'আপনি সত্যি দোষী না হলে পুলিশ আপনারই সহায়, জানবেন।'

'থাক!' রঘুনাথ রাগের সঙ্গে বললে, 'পুলিশের হয়ে ওকালতি শোনবার আমার সময় নেই। কি জন্যে আবার বিরক্ত করতে এসেছেন চটপট বলে ফেলুন!'

রেড্ডি সাহেব এবার পরাশরের মুখের দিকে তাকালেন। বোঝাই গেল যে তিনি পরাশরকে যা প্রশ্ন করবার করতে বলেছেন। তাঁর নিজের নতুন করে জেরা করবার কিছু নেই।

আমাদের নীরবতা আর মুখ চাওয়া-চাওয়ি দেখে রঘুনাথ আবার ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'কি, জিজ্ঞাসা করবার কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না?'

পরাশরের পরের প্রশ্নে রঘুনাথের অনুমানই ঠিক মনে হলো।

পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'যে রাত্রে আপনার মামা খুন হন, সে রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন?'

আমরা তো মনে মনে হাসলামই, রঘুনাথও গলা ছেড়ে এবার হেসে উঠলো।

তারপর পরাশরের দিকে চেয়ে অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতুকের সঙ্গে বললে, 'এর চেয়ে ভালো প্রশ্ন আর খুঁজে পেলেন না?'

'বেশ!' পরাশর যেন লজ্জিত হয়ে বললে, 'আরেকটা প্রশ্ন তাহলে করি। আপনি তো সিনেমার ছবি খুব বেশী দেখেন। শান্তারামের আদমী ছবিটা কেমন বলতে পারেন?'

রেড্ডি সাহেব ও আমি দুজনেই বোধ হয় একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। কিছু না পেয়ে এরকম আবোল-তাবোল প্রশ্ন করা অন্তত পরাশরের উচিত হয়নি।

রঘুনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই জবাব দিলে, 'ও তো অনেক পুরোনো ছবি। এককালে খুব নাম করেছিল।'

'হ্যাঁ। তাই জন্যেই জিজ্ঞাসা করছি।'—পরাশর নিজের প্রশ্নটা নিরর্থক বুঝেই যেন জেদ করে জিজ্ঞাসা করলে, 'ছবিটা কেমন?'

'ভালোই!' সংক্ষেপে জানালে রঘুনাথ।

'ধন্যবাদ!' বলে পরাশর রেড্ডিকে উঠতে ইঙ্গিত করলে।

'আপনাদের জেরা হয়ে গেল?' ব্যঙ্গভরে রঘুনাথ বললে, 'এরকম জেরা হলে রোজ আসতে পারেন। তবে আরেকটু বেলায়। দশটার আগে আমি ঘুম থেকে উঠি না!'

'জেনে রাখলাম। এরপর তাই আসবো।'—যেন কৃতার্থ হয়ে বলে পরাশর। তারপর অদ্ভুত একটা অনুরোধ জানিয়ে বসলো, 'আপনার এখানে অনেক ছবির পত্রিকা দেখছি, এই পুরোনো ফিল্ম্যাণ্ড পত্রিকাটা আপনার কাছে ধার চাইতে পারি ক'দিনের জন্যে?'

পরাশর টেবিলের ওপর থেকে একটা ছেঁড়া পুরোনো পত্রিকা সত্যিই হাত তুলে নিয়ে দেখালো।

'পারেন!' অবজ্ঞাভরে রঘুনাথ বললে, 'ধার নেবার দরকার নেই। ওটা আপনাকে দান করলাম।'

'আবার ধন্যবাদ!'—বলে পরাশর অম্লানবদনে পত্রিকা নিয়ে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলো।

পুলিশের গাড়িতে এসে উঠবার পর রেড্ডি সাহেব আমাদের হোটেলেই গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। পরাশর তাঁকে থামিয়ে বললে, 'না রেড্ডি সাহেব। বজৌরীর দুই ভাগ্নের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়। রঘুনাথকে দেখলাম, একবার রামসহায়কেও দেখতে চাই। সেকেন্দ্রাবাদে বজৌরীর বাড়িতেই চলুন।'

'তাই যাচ্ছি।' বলে হেসে রেড্ডি সাহেব সেই নির্দেশ দিলেন।

বজৌরীর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে তখনও পুলিশ পাহারা রয়েছে। রেড্ডি সাহেবের কাছে জানলাম, বজৌরীর ঘরটিও হত্যার পর যে অবস্থায় ছিল সেই

অবস্থাতেই রাখা হয়েছে এখনো। শুধু পোস্টমর্টেমের জন্যে লাশ নিয়ে গিয়ে পুলিশ ফটোগ্রাফার ঘরের সব কিছুর ফটো তুলে গেছে। বলা বাহুল্য, ঘরের কোথাও কোনো কিছুতে পুলিশ কারও হাতের বা পায়ের ছাপ কিছু পায়নি।

রামসহায়কে বাড়িতেই আমরা পেলাম। বজৌরী আর রামসহায়ের ঘর আলাদা। তার ঘরের পাশেই বাইরে বেরুবার দরজা। বাড়ির ভেতরেও একজন পুলিশ মোতায়েন করে, তাই রামসহায়কে সেখানেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। বাইরে বেরুনো সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট নিষেধ নেই, তবু শুনলাম রামসহায় বাড়ি থেকে একেবারে বেরোয় না বললেই হয়।

রেড্ডি সাহেবের কাছে যেমন বর্ণনা শুনেছিলাম, ঘরটা অবিকল তাই। আমার মত খাটো লোককেও মাথা নীচু করে দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। ঘরে একটিমাত্র জানালা, তাও আষ্টেপৃষ্ঠে লোহার শক্ত শিক দিয়ে আঁটা। ইচ্ছে করে কেউ এরকম ঘরে থাকতে রাজি হতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। তবে মানুষের রুচি নানারকম—তা ছাড়া অভ্যাসে সবই সয়ে যায়।

রামসহায়ের ছোট ঘরটি রঘুনাথের ঠিক উল্টো। জিনিসপত্র বেশি কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তা পরিচ্ছন্ন ও দামী। একটি ভালো সোফা সেট। ছোট একটি পুরোনো কালের কাজকরা খাট। একটি ছোট টেবিল আর গুটি-দুয়েক গদি-দেওয়া মানানসই চেয়ার। একটি ড্রেসিং টেবিলের ওপরকার প্রসাধন দ্রব্য দেখে বোঝা যায় রামসহায় বেশ সৌখীন। এ ছাড়া ঘরে আছে একটি সেকেলে ধরনের ওয়ার্ডরোব ও একটি বইয়ের আলমারী। বইয়ের আলমারীটি ঝকঝকে তকতকে সাজানো। বইগুলি দেখলেই বোঝা যায় রামসহায়ের এ বিষয়ে যত্ন আছে। বইগুলি লক্ষ্য করে দেখলাম বেশির ভাগই দেশ-বিদেশ ভ্রমণ কাহিনীর।

পরাশরেরও যে তা চোখে পড়েছে তার প্রথম প্রশ্নে বোঝা গেল।

আমরা ঘরে গিয়ে বসবার পরই আলমারীটার দিকে চেয়ে পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি খুব বেড়াতে ভালোবাসেন, না রামসহায়জি?'

রামসহায়ের চেহারা রুগ্ন না হলেও রঘুনাথের ঠিক উল্টোই বলা যায়। পাতলা একহারা গড়ন। চোখে মুখে একটু ভাবুক গোছের ভাব। কিন্তু মেজাজ দুজনেরই সমান তিরিক্ষি।

পরাশরের প্রশ্নে রামসহায় প্রায় জ্বলে উঠে বললে, 'পুলিশের সঙ্গে এসেছেন, পুলিশের মতই প্রশ্ন করুন। আপনাদের সঙ্গে অবান্তর আলাপের আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

পরাশরকে অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যে রেড্ডি সাহেব বললেন, 'কোনটা সঙ্গত আর কোনটা অবান্তর প্রশ্ন, সে বিচার করবার ভার তো আপনার ওপর নয়। যা প্রশ্ন করা হয়েছে তার জবাব দিতে পারলে দিন।'

রামসহায়ের মুখ চোখ কঠিন হয়ে উঠলো এ কথায়। কিন্তু সে কিছু বলবার আগে পরাশরই যেন লজ্জিতভাবে বললে, 'না, না, ও-প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে না। যদি আপত্তি না থাকে রঘুনাথ আপনার সহোদর ভাই কি না জানাবেন?'

'না, সহোদর নয়।' রামসহায় অপ্রসন্ন স্বরেই জানালো, 'রঘু আমার ছোট মাসির ছেলে। তবে আমরা সহোদরের মতই মানুষ হয়েছি একসঙ্গে। আমাদের দুজনের মা-ই ছেলেবেলায় মারা যান। মামাই আমাদের মানুষ করেছেন।'

'তাই যদি হয় তাহলে আপনার মামা বজৌরী রঘুনাথের ওপর শেষে অত বিরূপ হয়েছিলেন কেন?'

'সে মামার নিজের বোঝার ভুল। তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে বদরাগী লোক ছিলেন। কোনো একটা ভুল ধারণা করে তিনি ক্ষেপে গিয়ে ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেন।'

পরাশর একটু হেসে বললে, 'আপনার মাসতুতো ভাই রঘুনাথের চরিত্র খুব নিষ্কলঙ্ক বলে তো মনে হয় না।'

রামসহায় অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'আমার ভাইয়ের চরিত্র নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারবো না।'

পরাশর হেসে বললে, 'কিন্তু চরিত্রের জন্যে যদি না হয় তাহলে কেন আপনার মামা রঘুনাথের ওপর ক্ষেপে গেলেন, তা তো আমাদের জানা দরকার।'

রামসহায় খানিক চুপ করে থেকে বললে, 'টাকাপয়সার ব্যাপারে মামা ওকে মিথ্যে সন্দেহ করেছিলেন।'

'তার মনে, টাকাপয়সার কিছু গোলমালের সঙ্গে রঘুনাথ জড়িত ছিল?'—রেড্ডি সাহেবই এবার বললেন, 'কিন্তু বজৌরীর সন্দেহ যে মিথ্যে ছিল, তা আপনি জোর করে বলছেন কি করে?'

'বলছি রঘুকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি বলে। জাল-জুয়াচুরী করা তার পক্ষে অসম্ভব।'

'কিন্তু সে তো জুয়া খেলে!'—রেড্ডি সাহেব আবার মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ জুয়াও খেলে, একটু আধটু মদও খায়, ফিল্ম সম্বন্ধেও তার নেশা আছে, কিন্তু তাই বলে চোর-জোচ্চোর হতে যাবে কেন? মামা অন্যায় করে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার পর ও-সব বদখেয়াল বাড়িয়েছিল।'

'আচ্ছা, আপনার মামার মৃত্যুর পর রঘুনাথের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?' পরাশরই এবার প্রশ্ন করলো।

'না।'

'কবে শেষ দেখা হয়েছে তার সঙ্গে?' পরাশর আচমকা অত্যন্ত কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলে।

'এ সেই—।' এইটুকু বলেই রামসহায় হঠাৎ চুপ করে গেল।

'বলুন, থামলেন কেন?' পরাশর অত্যন্ত জবরদস্ত হয়ে উঠলো, 'সেই রাত্রেই তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, কেমন?'

'না।'—রামসহায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'জোর করে আমার মুখে কথা বলাবার চেষ্টা করবেন না।'

'তাহলে, কবে কখন শেষ দেখা হয়েছে বলুন?'—রেড্ডি সাহবে এবার কোতোয়ালী ধমকই দিলেন।

'আমার মনে নেই।'—রামসহায় কিন্তু অটল।

রেড্ডি সাহেব আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন। পরাশর তাঁকে ইঙ্গিতে থামিয়ে হঠাৎ কথাটা ঘোরবার জন্যেই একটা আজগুবি প্রসঙ্গ তুলে বসলো।

আগের প্রশ্নটা সম্বন্ধে যেন আর কোনো কৌতূহলই নেই এইভাবে ড্রেসিং টেবিলটার কাছে গিয়ে একটা শিশি তুলে নিয়ে বললে, 'এটা তো খুব ভালো কোল্ড ক্রীম দেখছি। আপনি মেয়েদের মত রাত্রে কোল্ড ক্রীম মাখেন!'

এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটুকুতেও কোনো কাজ হলো না।

রামসহায় জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পরাশরের দিকে একবার শুধু চেয়ে চুপ করে রইলো।

'আপনার যদি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে, জিজ্ঞাসা করুন রেড্ডি সাহেব। আমি বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে আসি।'—বলে পরাশর আমাদের একটু অবাক করে দিয়েই বেরিয়ে গেল।

রেড্ডি সাহেব নতুন প্রশ্ন আর কি করবেন! কড়া গলাটা এবার মোলায়েম করে তিনি সেই পুরোনো প্রশ্নই করলেন আবার।

'বলুন না রামসহায়জি, সত্যি কবে শেষ রঘুনাথের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে।'

রামসহায়কে নিরুত্তর দেখে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তারপরে,—'বুঝতেই পারছেন সত্যি কে খুনী, ধরবার জন্যে সমস্ত খবর আমাদের জানা দরকার। আপনি কি চান না যে, আপনার মামার প্রকৃত খুনী ধরা পড়ে?'

'চাই।'—রামসহায় এবার মুখ খুললো,—'কিন্তু রঘুনাথ খুনী নয়।'

'আমরাও তো তা বলছি না, কিন্তু তার সম্বন্ধে সব সঠিক খবর সেই জন্যেই জানা দরকার।'

'বেশ, যত পারেন জানুন। কিন্তু আমার সঙ্গে কবে তার শেষ দেখা হয়েছে, তার সঙ্গে খুনের ব্যাপারের সম্পর্ক কি!'

রেড্ডি সাহেব মিছেই তারপর রামসহায়কে আবার বোঝাতে বসলেন। তার মুখ যেন সাঁড়াশী দিয়ে আঁটা, তার কাছ থেকে কিছুই আর বার করা গেল না।

হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, পরাশর বজৌরীর ঘরের বাইরে ঘাসের জমির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে একটা আতস কাচ দিয়ে তন্ময় হয়ে কি দেখছে। পাহারাদার পুলিশ তার পেছনে কৌতুকভরা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে।

রেড্ডি সাহেবকে দেখে পুলিশ মুখখানা তাড়াতাড়ি গম্ভীর করে ফেলে কর্তব্যের খাতিরেই বোধহয় জানালে, 'সাব, অন্দর মে ভি এইসা কিয়ে হ্যাঁ!'

পুলিশের গলার শব্দে চমকে পরাশর নিজেই যেন অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের দিকে চেয়ে হাসলো।

রেড্ডি সাহেবও হেসে বললেন, 'পায়ের দাগ খুঁজছিলেন মিস্টার বর্মা। সে কি আমরা কিছু খুঁজতে বাকি রেখেছি! তাছাড়া ইতিমধ্যে কবার বৃষ্টি হয়ে গেছে জানেন! দাগ কিছু এতদিন কি থাকে!'

'হ্যাঁ, তাই দেখলাম।'—পরাশর লজ্জিতভাবে জানালে,—কোনো দাগ নেই।

রেড্ডি সাহেবের পুলিশের গাড়িতেই তারপর বেরুলাম। কিন্তু সেদিন পরাশরের খামখেয়ালীতে বেলা দুপুর পর্যন্ত রেহাই পেলাম না।

গাড়ি কিছুদূর যাবার পরই পরাশর বললে, 'বজৌরীর উকিল বন্ধুর নাম ইফতিকার সাহেব, না?'

রেড্ডি সাহেব মাথা নেড়ে সায় দিতে পরাশর বললে, 'তার কাছে যে একবার যেতে হয়।'

রেড্ডি সাহেব অনিচ্ছার সঙ্গেই বোধহয় রাজী হলেন। পরাশরের সঙ্গে পরামর্শ করতে যাবার জন্যে এখন বোধহয় মনে মনে তিনি আফসোসই করছিলেন।

ইফতিকার সাহেব যে বনেদি বংশের লোক তা তাঁর ঘর-বাড়ি শুধু নয়, চেহারা দেখেও বোঝা যায়। উকিলের চেয়ে নবাব বাদশা বলেই মনে হয় দেখলে। ওকালতিটা সখ করেই বোধহয় করেন। নইলে তাঁর কিছুর অভাব আছে বলে মনে হয় না।

রেড্ডি সাহেব পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দেবার পর সাদরে বসতে বলে আমাদের জন্যে সরবৎ আনতে দিয়ে তিনি হেসে বললেন, 'কি করতে পারি আপনাদের জন্যে বলুন?'

পরাশর তাকে হঠাৎ যা বলে বসলো, আমি ও রেড্ডিসাহেব দুজনেই তাতে থ।

কোনোরকম ভূমিকা না করেই পরাশর বললে, 'আপনার ক'জোড়া জুতো আছে যদি দয়া করে বলেন!'

ইফতিকার সাহেব কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে পরাশরের দিকে বোধহয় তার মস্তিষ্ক সুস্থ কি না বোঝবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে বললেন, 'তা তো ঠিক গুণে রাখিনি। তবে কুড়ি-বাইশ জোড়া সব রকম মিলিয়ে হবে বোধহয়।'

'সেই সব জুতো জোড়া অনুগ্রহ করে আপনার চাকরকে একবার আনতে বলবেন কি?'

পরাশরের সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মনে করে রেড্ডি কি বলতে যাচ্ছিলেন, ইফতিকার সাহেবই হেসে বাধা দিয়ে বললেন, 'বেশ, তাই আনাচ্ছি।'

চিত্র-বিচিত্র কাজ করা দামি ট্রে-তে তখন সরবৎ এসে গেছে।

ইফতিকার সাহেব আমাদের সরবৎ দেবার পর চাকরকে তাঁর সব জুতো-জোড়া আনতে বলে দিলেন।

সরবৎ-এ চুমুক দিতে দিতে পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি তো বজৌরীর বন্ধু ও উকিল দুই-ই ছিলেন?'

ইফতিকার মাথা নাড়লেন।

'আচ্ছা বজৌরী তাঁর পুরোনো উইল বদলাবার কথা কতদিন আগে তোলেন?'

'তাঁর মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগে।'

'কেন কিভাবে উইল বদলাতে চান, তা কিছু বলেছিলেন?'

'না। তিনিও তখন ব্যস্ত, আমারও অন্য কাজে বোম্বে যাবার কথা ছিল। তাই শুধু উইল বদলাতে চান, এই কথাই জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নতুন উইলের খসড়া তিনি করেই রাখছেন। আমায় দেখাবেন পরে।'

পরাশর এবার রেড্ডি সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করলে, 'সে উইলের খসড়া বজৌরীর ঘরে পেয়েছেন?'

রেড্ডি সাহেব জানালেন, 'না।'

'আপনার কাছে পুরোনো উইলের কপি যদি থাকে একবার দেখাতে পারেন?' পরাশর ইফতিকার সাহেবকে অনুরোধ জানালে।

রেড্ডির কাছে চোখের দৃষ্টিতে যেন অনুমতি চেয়ে ইফতিকার সাহেব বললেন, 'নিশ্চয় পারি।'

চাবি দেওয়া একটা স্টীলের আলমারি খুলে ইফতিকার সাহেব উইলটা পরাশরের হাতে দিলেন।

পরাশর মনোযোগ দিয়ে সেটা পড়ে বললে, 'এতে তো ভারি মজার একটা কথা লেখা দেখছি। রামসহায় ও রঘুনাথকেই সব ভাগ করে দেওয়া আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যদি অপুত্রক মারা যায় তাহলে তার এবং দুজনেই সেভাবে মারা গেলে দুজনের সমস্ত উত্তরাধিকার আপনিই ট্রাস্টি হিসেবে পাবেন। শুধু তাই নয়, এই দুই ভাগ্নের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সম্পত্তির পুরো দখল তারা পাবে না। সম্পত্তির ট্রাস্টি হিসেবে আপনিই ততদিন তাদের সম্পত্তির আয় ভাগ করে দেবেন, আর তাদের কেউ বা দুজনেই যদি রাজদ্বারে দণ্ডিত হবার মত বা বংশের অমর্যাদাকর কোনো কাজ করে, তাহলে তাদের উত্তরাধিকার ট্রাস্টি হিসেবে আপনার দখলেই আসবে।'

ইফতিকার সাহেব একটু হেসে বললেন, 'আমার বন্ধু বজৌরী একটু একগুঁয়ে খামখেয়ালী ছিলেন। রঘুনাথের চালচলনে সন্তুষ্ট না হয়েই ওরকম আজগুবি ব্যবস্থা উইলে করেছিলেন। আমার মনে হয় নিজের ভুল বুঝেই তিনি উইল আবার সংশোধন করতে চেয়েছিলেন।'

'কিন্তু ওদের দুজনের ভালোমন্দ কিছু হলেই তো আপনার লাভ ইফতিকার সাহেব!'

পরাশরের এই বেমক্কা কথায় ঘরে যেন একটা বোমা পড়লো।

আমরা স্তম্ভিত। ইফতিকার সাহেবের আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপমারা মুখ এক মুহূর্তে রাঙা হয়ে উঠলো। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে তিনি শান্ত অথচ তীব্র স্বরে বললেন, 'আপনি হায়দ্রাবাদের লোক নন বুঝতে পারছি মিস্টার বর্মা, নইলে জানতেন, আমাদের বংশের অনেক কিছু গিয়েও এখনও যা আছে, তাতে বজৌরীর সম্পত্তিতে লোভ করার আমার দরকার নেই।'

ঘরের অত্যন্ত থমথমে অবস্থা। রেড্ডি সাহেব সেটা হাল্কা করবার চেষ্টায় বন্ধুকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে বললেন, 'আপনি কিছু মনে করবেন না ইফতিকার সাহেব। আমার বন্ধু মিস্টার বর্মা ওসব ভেবে কিছু বলেন নি। কথাটা নেহাৎই ঠাট্টা!'

ইফতিকার সাহেব তা মেনে নিলেন কিনা জানি না। কিন্তু পরাশরকে মোটেই লজ্জিত বা অপ্রস্তুত বলে মনে হলো না।

চাকর তখন প্রায় বিশ জোড়া জুতা ঘরে এনে ফেলেছে। তার মধ্যে গোটা-তিন জোড়া কি বুঝে জানি না বেছে নিয়ে পরাশর জিজ্ঞাসা করলে, 'এই তিন জোড়া জুতো দুদিনের জন্যে নিয়ে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন।'—বলে ইফতিকার সাহেব এবার বোধহয় আগের আঘাতের শোধ নিলেন,—'কিন্তু আমার গরীবখানায় এসে শুধু জুতোই নিয়ে যাবেন। এই সঙ্গে এটাও অনুগ্রহ করে নিলে কৃতার্থ হবো।'

ইফতিকার সাহেব ঘরের একটা ছোটো টেবিলে রাখা লোহার ওপর রুপোর কাজ করা বিদরীর একটি অপরূপ বাহারী ছোরা খাপসমেত পরাশরকে উপহার দিলেন।

পরাশর অম্লান বদনে সেটা নিলে। ইফতিকার সাহেবের আদেশে তাঁর চাকর তিন জোড়া জুতোর সঙ্গে সেটাও আমাদের সঙ্গে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।

ইফতিকার সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়েও নিস্তার নেই।

পরাশরের এ-বারের বায়না একেবারে সৃষ্টিছাড়া। বজৌরী সাহেবের যে কাচের জানালা ভেঙে গেছে তা আবার নতুন করে লাগাতে হবে।

'কিন্তু সে-রকম কাচ কোথায়?' রেড্ডি সাহেব অনেক দুঃখেই হেসে বললেন বোধহয়।

যেখান থেকে বজৌরী ও-কাচ কিনেছিলেন, সেখানেই গিয়ে দেখা যাক না কেন? পরাশর জেদ ধরলে, 'অনেক সময় এক মাপের কাচ ওদের একটার বেশিই থাকত।'

দোকান খুঁজে পেতে গিয়ে সত্যিই তা পাওয়া গেল। দোকানের মালিক জানালেন, ওই রকম সরেস কাচের এক মাপের ছ'টি জানালা তাঁর দোকানে ছিল। পাঁচটি বিক্রি হয়ে আর একটি মাত্র আছে। বেজোড় বলে হয়তো বিক্রি হবে না মনে করে তাঁরা সেটা কাটাবার কথা ভাবছেন।

'আর কাটাতে হবে না। আমিই এটা নেবো।' বলে সত্যিই পরাশর নিজে থেকে টাকা দিয়ে সেটার বায়না দিয়ে এলো।

পরাশরের পাগলামিতে আমি তো বটেই, রেড্ডি সাহেবও তখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন!

রাস্তায় বিশেষ আর কোনো কথা হলো না। আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে তখনকার মত রেড্ডি সাহেব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ফিরে এলেন আবার সন্ধের পর। পরাশর তার মধ্যেই কি জন্যে জানি না একলাই একবার শহর ঘুরে এসেছে।

রেড্ডি সাহেব আমাদের হোটেলের ঘরের বারান্দায় আমাদের সঙ্গে চা খেতে বসে বললেন, 'আপনি আজ অনেক কিছুই করেছেন মিস্টার বর্মা, কিন্তু সমস্যার কোনো খেই তাতে মিলবে কি?'

'আপনার নিজের কার ওপর সন্দেহ হয় রেড্ডি সাহেব?' পরাশর পাল্টা প্রশ্ন করে বসলো।

'ইফতিকার সাহেবের ওপর অন্তত নয়।' রেড্ডি সাহেব হেসে বললেন, 'আর রঘুনাথ তো সে রাত্রে বিদরীর হাজতেই ছিল।'

পরাশর কেমন দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, 'তা বটে! আচ্ছা, এই ছবিটা একটু দেখুন তো রেড্ডি সাহেব।'

রঘুনাথের ঘর থেকে ফিল্মের যে পত্রিকাটা পরাশর চেয়ে এনেছিল, সেইটেই ঘর থেকে এনে এক জায়গায় পরাশর খুলে দেখালো।

আমি ও রেড্ডি সাহেব ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়লাম।

'এ তো কোনো ফিল্মের একটা দৃশ্য দেখছি।'—আমি বললাম, 'চার-পাঁচজন আর্টিস্ট রয়েছে।'

'হ্যাঁ', বললে পরাশর, 'লোকগুলোকে ভালো করে দেখো।'

'তাই তো',—রেড্ডি সাহেব সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'রঘুনাথও এদের মধ্যে আছে মনে হচ্ছে।'

'এবার নিচের নামগুলো পড়ুন।'—পরাশর নির্দেশ দিলে।

পড়ে কিন্তু রঘুনাথের নাম তার মধ্যে পেলাম না।

'রঘুনাথ কি ছদ্মনামে ফিল্মে নামে নাকি?'—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রেড্ডি সাহেব।

'প্রায় ঠিকই ধরেছেন। শুধু কথাটা একটু উল্টে বলতে হবে।' পরাশর তার স্বভাবসিদ্ধ হেঁয়ালি করলে।

'তার মানে?' রেড্ডি সাহেব একটু অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন।

'মানে রঘুনাথ ছদ্মনামে ফিল্মে নামে না, রঘুনাথেরই ছদ্মনাম নিয়ে অন্য কেউ হাজতে যায়!' পরাশর আমাদের হতভম্ব করে মিটমিট করে হাসতে লাগলো।

'কি বলছেন আপনি!'—রেড্ডি সাহেবের কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস।

'যা বলছি তা খোঁজ করে মিলিয়েই দেখুন। ওই ছবির তলায় যার নামটা পাচ্ছেন, সেই বচ্চন সত্যিই ছোটখাটো একজন আর্টিস্ট। রঘুনাথের সঙ্গে তার চেহারার খুব বেশি মিল। রঘুনাথের ফিল্মের নেশা প্রচণ্ড। এই মিল চোখে পড়তেই রঘুনাথ বোম্বাই গিয়ে খোঁজ-টোজ করে বচ্চনের সঙ্গে ভাব করে। রঘুনাথ তাতে ফিল্মে নামতে পারেনি অবশ্য, কিন্তু বচ্চনের সঙ্গে বন্ধুত্বটা গভীরই হয়েছে। রঘুনাথ সুবিধে পেলেই বোম্বাই যায় বচ্চনের সঙ্গে স্ফূর্তি করতে। বচ্চনও মাঝে মাঝে আসে হায়দ্রাবাদে—যেমন এসেছিল বজৌরী খুন হবার সময়ে। খুন হবার রাত্রে বচ্চন কিন্তু হায়দ্রাবাদে ছিল না, ছিল বিদরীতে এক জুয়ার আড্ডায়।'

'আপনি এসব কথা জানলেন কি করে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রেড্ডি সাহেব।

'বলছি। তার আগে বলুন তো, পুলিশ সেদিন বিদরীতে জুয়ার আড্ডায় যে চড়াও হয়েছিল, সে কি নিজে থেকেই, না কারুর কাছে গুপ্ত খবর পেয়ে?'

'ঠিকই তো আপনি ধরেছেন!'—রেড্ডি সাহেব বললেন সবিস্ময়ে, 'বিদরীর থানায় সেদিন ফোনে একজন ঐ গোপন জুয়ার আড্ডার খবর দেয়। পুলিশ সে খবর বিশ্বাস না করলেও একবার দেখতে না গিয়ে পারেনি। গিয়ে অবশ্য সত্যিই জুয়ার আড্ডা পেয়েছিল ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার মধ্যে রঘুনাথও ছিল। পরের দিন সকালে জামিনে সে খালাস পায়।'

'যে ধরা পড়ে ও যে খালাস পায় সে রঘুনাথ নয়, বচ্চন।'—পরাশর এবার বোঝালে, 'বচ্চনের তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ তার নিজের নামে কোনো বদনাম হলো না।

আর রঘুনাথ সামান্য একটু পুলিশের কেসে পড়ে অন্য জায়গায় থাকার অছিলায় খুনের দায়ের আসামী হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেলে।'

'এখন বলুন, এসব আপনি জানলেন কি করে?'—জিজ্ঞাসা করলেন রেড্ডি সাহেব।

'প্রথমতঃ আঁচ করলাম, রঘুনাথের ঘরে ফিল্মের কাগজগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে বচ্চনের সঙ্গে রঘুনাথের চেহারার মিল দেখে, ও বচ্চনের ছবি যাতে আছে অধিকাংশ সেইরকম কাগজ ওখানে পেয়ে। রঘুনাথ যে এই কাগজগুলোই সব কেনে ও রাখে তার কোনো তাৎপর্য আছে বলে মনে হলো। দ্বিতীয়তঃ একেবারে যাকে বলে সরেজমিনে তদন্ত করে জানলাম, বিকেলবেলা ম্যাজিস্টিক সিনেমা হলে গিয়ে সেখানকার একজন গেট-কীপারকে বচ্চনের এই ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে।'

'কি গোলমেলে কথা বলছো?' আমিই এবার বললাম, 'ম্যাজিস্টিক সিনেমা হলের সঙ্গে এ ব্যাপারের কি সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক এই!'—পরাশর কাগজটারই আর ক'টা পাতা সরিয়ে একটা সিনেমার টিকিটের আধখানা অংশ বার করলো। তারপর আমাদের হতভম্ব অবস্থাটা যেন উপভোগ করেই বললে, 'যেদিন বজৌরী খুন হলো এটা সেই দিনেরই সন্ধ্যা ছ'টার শো-র টিকিট। এক দিনের জন্যে সে তারিখে পুরোনো 'আদমি' ছবিটা ম্যাজিস্টিকে দেখানো হয়েছিল। আর সে ছবি দেখতে গেছলো রঘুনাথ। এ টিকিটের অর্ধাংশটা যে তার বিরুদ্ধে মারাত্মক সাক্ষী হয়ে উঠতে পারে জানলে নিশ্চয়ই ছিঁড়ে কোথাও ফেলে দিতো। এটা আমাদেরই ভাগ্যে এই কাগজটার মধ্যে থেকে গেছলো।'

'ও, এই জন্যেই সেদিন আদমি ছবিটার কথা রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, ও ছবিটা আমার নিজেরই প্রিয়। একদিনের জন্যে এখানে দিয়েছিল, আমি জানতাম। টিকিটের ছেঁড়া অংশটা পেয়ে তারিখ দেখে বুঝতে পারি যে, ওই আদমির শো-এরই টিকিট। আজ বিকেলে ম্যাজিস্টিক সিনেমায় গিয়ে ওই টিকিট যে-ক্লাসের, তার গেট-কীপারকে জিজ্ঞেস করেই জানতে পারি যে, রঘুনাথ সেদিন সিনেমায় সত্যিই এসেছিল। রঘুনাথ প্রায়ই সিনেমায় যায়। গেট-কীপার তাকে চেনে।'

রেড্ডি সাহেব খানিক গম্ভীর হয়ে আপন মনে কি ভেবে নিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য! রঘুনাথ এই হায়দ্রাবাদেই থেকে পুলিশকে এভাবে ধোঁকা দিয়েছে! অথচ আমরা কিছুই জানতে পারিনি!'

'জানতে কিন্তু পারতেনই! আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তাহলে বিদরীতে যে ধরা পড়েছিল, সে যে রঘুনাথ নয় এ খবর গোপনে দু'এক দিনের মধ্যেই পাবেন!'

'বলেন কি!' রেড্ডি সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'এ খবর আমাদের কেউ গোপনে জানাতো?'

'হ্যাঁ, বিদরীর জুয়ার আড্ডার খবর যেমন জানিয়েছিল, তেমনি!'

পরাশরকে তার পরের মুহূর্তেই বাকসিদ্ধ বলে মনে করলে কোনো দোষ হতো না।

'রেড্ডি সাহেব এই হোটেলে আমাদের কাছে যে আসছেন থানায় জানিয়ে এসেছিলেন নিশ্চয়। একজন কনস্টেবল জরুরী চিঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে সেই মুহূর্তেই দেখা করতে এলো। চিঠিটা খুলে পড়ে কনস্টেবলকে বিদায় করে রেড্ডি সাহেব সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে পরাশরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ চিঠিতে কি লিখেছে জানেন?'

'কি? বিদরীর ধরা পড়া রঘুনাথ যে জাল তাই কেউ গোপনে ফোনে জানিয়েছে, এই খবর তো?

'ঠিক তাই! ধন্যবাদ মিস্টার বর্মা। আমি চললাম। আর এক মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় নেই।' রেড্ডি উঠে দাঁড়ালেন।

'অত ব্যস্ত হবেন না, রেড্ডি সাহেব!' পরাশর হেসে বললে, 'আপনার খুনী পালিয়ে যাচ্ছে না। তার ঘোরালো প্যাঁচ কেউ কাটতে পারে না, এই অহঙ্কারে সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। আপনি শুধু যাবার সময় এই লেফাফার মধ্যে যে কাগজটুকু আছে, তা আপনাদের ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতে দিয়ে যাবেন তো। পরীক্ষা করে কালই সকালে যাতে রিপোর্টটা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবেন।'

'কি আছে ওতে?' আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'কালই সকালে জানা যাবে!' বলে হেসে পরাশর কথাটা চাপা দিলে।

রেড্ডি সাহেব খামটা নিয়ে চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে হায়দ্রাবাদের স্থানীয় খবরের কাগজটা খুলেই পরাশর উত্তেজিতভাবে বললে, 'দেখছো রেড্ডি সাহেবের কাণ্ড!'

যে খবরটা দেখে পরাশরের এত উত্তেজনা, তা পড়ে আমিও একটু উত্তেজিত না হয়ে পারলাম না। খবরটা বজৌরীকে খুন করার দায়ে রঘুনাথের গ্রেপ্তার হওয়ার।

পরাশর সেই তখনই বাটকারার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো।

'একটা বাটকারা চাই এখুনি।' বললে উত্তেজিতভাবে।

প্রথমটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বললে?'

'একটা বাটকারা!'

সেই বাটকারার জন্যে শেষ পর্যন্ত থানায় রেড্ডি সাহেবকে ফোন করলে আমার সামনেই। ফোন করে যা বললে, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

একটা বড় নির্ভুল দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ইফতিকার সাহেব, রামসহায় এমন কি হাজত থেকে অনুমতি করিয়ে রঘুনাথকেও নিয়ে আমরা বজৌরীর বাড়িতে এক ঘন্টা বাদে জড়ো হচ্ছি এই ব্যবস্থার কথাই ফোনে হলো শুনলাম। কাচের দোকান থেকে তার সেই বায়না করা কাচটা আর দোকানের মালিককেও আনবার কথা সে বলে দিলে, আর সেই সঙ্গে ফোরেনসিক ল্যাবরেটরির রিপোর্ট।

এক ঘন্টা বাদে বজৌরীর বাড়িতে আমরা সবাই গিয়ে উপস্থিত হলাম।

পরাশর ছাড়া আর সকলেরই কেমন দিশাহারা ভাব। পরাশর কি যে করতে চায় কেউই আমরা জানি না। ইতিপূর্বে পরাশরের কাছে সাহায্য পাবার কৃতজ্ঞতাতেই নিশ্চয় রেড্ডি সাহেব এত তোড়জোড় করে সব কিছু জোগাড় করে এনেছেন। তাঁর মুখ দেখে কিন্তু মনে হলো, ব্যাপারটা তাঁর কাছে পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

পরাশর প্রথমেই যা করলো, তাকে পাগলামি ছাড়া আর কি-বা বলা যায়! বজৌরী সাহেবের ঘরের কোনো কিছু এ পর্যন্ত নড়ানো হয়নি। ভাঙা কাচগুলো পর্যন্ত যেখানে

যেমন তেমনি ছড়ানো ছিল। পরাশরের নির্দেশে সেই সমস্ত ভাঙা কাচের টুকরো খুঁটে খুঁটে তুলে একটা পাল্লায় রাখা হলো, আরেকটা পাল্লায় সেই দোকানের আস্ত কাচটা।

ওজন করতে কিন্তু আস্ত কাচের দিকের পাল্লাটাই ঝুলে পড়লো।

আমাদের কাছে ব্যাপারটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু পরাশর কাচের দোকানের মালিকের দিকে চেয়ে বিদ্রূপ করে বললে, 'কি মশাই, আপনি না ছ'টা এক জাতের এক মাপের সরেস কাচের জানলা আপনার ছিল বলেছিলেন! এই ঘরের একটা কাচের গুঁড়োও আমরা ফেলিনি, সব পাল্লাতেই তুলেছি। তবে এদিকটার ওজন এত হয় কেন? আপনার তাহলে ঠকাবার ব্যবসা?'

কাচের দোকানের মালিক পুলিশের তলবেই এসে এতক্ষণ একটু ভয়ে-ভয়েই ছিলেন, কিন্তু এ-কথায় একেবারে জ্বলে উঠলেন,—'আমি ঠকাবার ব্যবসা করি! চলুন আমার দোকানে। বম্বে থেকে যাদের ওর্ডার দিয়ে এসব কাচ আনিয়েছি, তার চালান আমার কাছে এখনও আছে। হেঁজিপেঁজি কোম্পানির মালও নয়। দেখবেন চলুন সব এক মাপের এক দরের জিনিস কিনা!'

'আহা, অত চটছেন কেন?'—পরাশর এবার তাঁকে শান্ত করলে, 'আপনার মাল যদি ঠিক হয়, তাহলে গোলমাল এখানে কিছু আছে! এ ঘরে কোথাও কাচের টুকরো আর পড়ে নেই তো!'

পরাশরের কথায় আবার তন্নতন্ন করে ঘরের চারিদিকে দেখা হলো। কোথাও একটা কণাও আর নেই।

এই সময়ের মধ্যে ইফতিকার সাহেবই প্রথম বিরক্ত হয়ে উঠে বলে ফেললেন, 'এসব ছেলেখেলার জন্যে আমায় এখানে ডেকে আনার মানে কি আমি জানতে চাই রেড্ডি সাহেব!'

'পারবেন! পারবেন! এখনি জানতে পারবেন।' রেড্ডি সাহেবের বদলে পরাশরই জবাব দিলে, 'আপনার জুতোর তলায় যেটুকু কাচের গুঁড়ো ছিল, তাও আমি চেঁচে এনেছি এই যে!'

পরাশর পকেট থেকে একটা ছোটো কাগজের মোড়ক বার করে সকলকে খুলে দেখালো। কাগজের মধ্যে প্রায় ধুলোর মতো অতি সামান্য ক'টা কাচের গুঁড়ো। পরাশর কাগজটা ভাঙা কাচের পাল্লাটার ওপর ঝেড়ে দিয়ে আবার বললে, 'আপনি সেদিন রাত্রে কেন একলা লুকিয়ে এসেছিলেন তা এখুনি অবশ্য বলবার দরকার নেই।'

ইফতিকার সাহেবের মুখ চোখ আগুন হয়ে উঠলো। তিনি তীব্র স্বরে বললেন, 'না, এখুনি আমি বলতে চাই। বজৌরী সেদিন রাত্রে আমায় গোপনে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। তাই আমি এসেছিলাম।'

'বজৌরী কি চিঠিতে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল?'—পরাশরের গলায় বিদ্রূপের স্বর।

'না, তিনি ফোন করেছিলেন। রাত এগারোটার পর। বলেছিলেন বিশেষ জরুরী দরকার। তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছেন। তাই উইলটা সম্বন্ধে এখুনি ব্যবস্থা করতে চান। আমি যেন রাত বারোটার মধ্যে নিশ্চিত ওখানেই যাই।'

'আপনি তাই গেছলেন। ভালো। কিন্তু ফোনে বজৌরীর গলা আপনি চিনতে পেরেছিলেন?'

'না, একটু অন্যরকম লেগেছিল। ফোনে অনেকের গলা বদলে যায়, তাছাড়া ভেবেছিলাম অসুস্থ বলে গলাটা ওরকম হয়েছে।'

'ওঃ ভেবেছিলাম!'—পরাশর যেরকম ব্যঙ্গের স্বরে কথাটা বললে, তাতে ইফতিকার সাহেবের গায়ে জ্বালা ধরা স্বাভাবিক।

তিনি আগুন হয়েই বললেন, 'আমি কি মিথ্যে কথা বলছি!'

'যা বলছেন তার সত্য মিথ্যা এখুনি প্রমাণ হবে।'—এবার যেন নরম সুরেই পরাশর বললে, 'কিন্তু দাঁড়িপাল্লার রহস্যটার তো মীমাংসা হচ্ছে না? আচ্ছা এইটা দিয়ে দেখা যাক।'

পরাশর পকেট থেকে আর একটা কাগজের মোড়ক বার করে, তা থেকে দু-টুকরো কাচ পাল্লার মধ্যে ফেললো।

'আশ্চর্য। সেই দুটো টুকরো-কাচেই পাল্লা দুটো প্রায় সমান সমান হয়ে গেল। ওপরের কাঁটার যেটুকু তফাৎ রইলো তা ধর্তব্যই নয়।'

'ওটা কোন্ কাচের টুকরো আপনি দিলেন?'—জিজ্ঞাসা করলেন রেড্ডি সাহেব।

'এই কাচেরই টুকরো! পরীক্ষা করিয়ে দেখতে পারেন।'—নিরীহ ভালোমানুষের মত জবাব দিলে পরাশর।

'তা বুঝলাম। কিন্তু ও টুকরো আপনার পকেটে গেল কোথা থেকে?'

'ওই বাইরে থেকে কুড়িয়ে আমি পকেটে রেখে দিয়েছিলাম' ব'লে একটু হেসে পরাশর বললে, 'হ্যাঁ রেড্ডি সাহেব, আমি ওখানে সেদিন পায়ের দাগ খুঁজিনি। খুঁজছিলাম কাচের টুকরো।'

'ওই বাইরে কাচের টুকরো যাবে কি করে?'

'সেটাই তো ভাববার!'—বলে পরাশর হাসলো।

'আপনি খুব বাহাদুর মিস্টার বর্মা!'—এবার রামসহায়ের তীক্ষ্ণ তিক্ত কণ্ঠ শোনা গেল, 'কিন্তু আপনার বুদ্ধির তারিফ করবার জন্যে এভাবে বসে থাকাটা আমাদের কাছে অসহ্য। যা করতে চান তাড়াতাড়ি করুন। কিছু না পারেন আমাকেই গ্রেপ্তার করুন।'

'তাই করলাম রামসহায়জি!' পরাশরের স্বর এবার বজ্র-কঠিন।

আমরা সবাই অবাক হলেও রেড্ডি সাহেব এক নিমেষে দেখলাম পকেট থেকে হাতকড়া বার করে রামসহায়ের সামনে ধরেছেন।

রামসহায় সেদিকে চেয়ে তীব্র স্বরে বললে, 'কি করেছেন আপনারা জানেন?'

'জানি বইকি রামসহায়জি!'—পরাশর তেমনি কড়া গলায় বললে, 'আমরা কি করছি জানি, আপনি কি করছেন তাও। এক ঢিলে লোকে দু-পাখিই মারতে চায়। আপনি একেবারে তিন পাখি মারবার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম মামা বজৌরীকে খুন, দ্বিতীয়তঃ বজৌরীর একান্ত বন্ধু হিতৈষী ও সহায় ইফতিকার সাহেবের মত শরিফ, ইমানদার মানুষকে অপদস্থ করে ট্রাস্টিগিরি থেকে সরানো। তৃতীয়তঃ আপনার

একমাত্র পথের কাঁটা রঘুনাথকে খুনের দায়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে সরিয়ে দেওয়া। রঘুনাথের নামে যেসব কথা লাগিয়ে আপনি আপনার মামার কান ভারি করেছিলেন, সেসব এতদিনে মিথ্যে বলে ধরে ফেলেই তিনি উইল বদলাতে চাইছিলেন। উইলের সেই খসড়া গোপনে দেখে নিয়ে আর রঘুনাথকে তার বন্ধু বচ্চনের সঙ্গে দেখেই আপনার মনে এই শয়তানী ফন্দি আসে। মামাকে হত্যা করবার দিন ঠিক করে আপনি প্রথমে, রঘুনাথকে সে রাত্রে, রাত বারোটা নাগাদ আপনাদের বাড়ির বাইরে এসে অপেক্ষা করতে বললেন। সম্ভবত তাকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, ইফতিকার সাহেব ওই সময়ে বজৌরীর ডাকে নতুন উইল বদলাবার জন্যে আসবেন। সে নতুন উইলে রঘুনাথকে বঞ্চিত করা হবে বলেই বুঝিয়েছিলেন। তাই ইফতিকার সাহেবকে ওখানে ঢুকতে না দিলে বা ঢোকার পরও উইলের খসড়া নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় ধরে খসড়া কেড়ে নিলে কিছুদিনের জন্যে এখন উইল করা অন্তত বন্ধ হবে। কিছুদিন বন্ধ করতে পারলেই আপনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মামার মত বদলাতে পারবেন বলে রঘুনাথকে আশা দিয়েছিলেন। রঘুনাথ জুয়াড়ি হলেও সত্যিই সরল। সে আপনার কথা বিশ্বাস করেছিল। এমনকি ইফতিকার সাহেবের ওপর হামলা করা সত্ত্বেও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে না থাকার যে ফিকির আপনি রঘুনাথকে বলেছিলেন, মজার বলে তাও সে কোনোরকম সন্দেহ না করে কাজে লাগিয়েছিল। তার বন্ধু বচ্চন হায়দ্রাবাদে তখন এসেছে। বচ্চন ফুর্তিবাজ ফিল্মের লোক। সে এ মজার ফন্দিতে এককথায় রাজি হয়েছিল তার কোনো লোকসান নেই জেনে। কি রঘুনাথজি, ঠিক বলছি কিনা?'

রঘুনাথের দিকে ফিরে একথা জিজ্ঞাসা করতেই সে থতমত খেয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। রামসহায় আমায় বুঝিয়েছিল যে মামাজি আমার ওপরে ক্ষেপে গিয়ে এখুনি উইল বদলে ফেলতে যাচ্ছেন। দু'দিনের জন্যে তাঁকে ঠেকাতে পারলে আবার তাঁকে ঠাণ্ডা করা যাবে। ও যে আমার বিরুদ্ধে মামাজিকে মিথ্যে করে লাগিয়েছে, আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি।'

তাকে হাত তুলে থামিয়ে পরাশর আবার রামসহায়ের দিকে ফিরে বললে, 'সেই রাত্রেই আপনি মামা বজৌরীর গলা যথাসম্ভব নকল করে ইফতিকার সাহেবকে ফোন করেন। ইফতিকার সাহেব ফাঁদে পড়ে এলে ভালোই, না এলেও আপনার কোনো ক্ষতি নেই। ফোন করে এসেই আপনি নিঃশব্দে মামার ঘরে তাঁর খাটের তলায় লুকিয়ে পড়েন।'

একটু থেমে রেড্ডি সাহেবের দিকে চেয়ে পরাশর বললে, 'দেখি ফোরেনসিক ল্যাবরেটরির রিপোর্টটা।'

রেড্ডি সাহেব পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পরাশরের হাতে দিলেন। পরাশর সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললে, 'আপনি যে মামার ঘরে খাটের তলায় লুকিয়েছিলেন এই তার অকাট্য প্রমাণ।'

'কি? রামসহায় চিৎকার করে উঠলো।

'হ্যাঁ আপনি মেয়েদের মত রাত্রে কোল্ড ক্রীম মাখেন। সেদিনও [illegible]। খাটের তলায় ঘাপটি মেরে থাকবার সময় আপনার মুখের কোল্ড ক্রীম [illegible] লেগেছিল। আমি সেদিন ঘরটা পরীক্ষা করবার সময় ওই দাগ দেখে ফেলে একটা কাগজে তা ঘষে তুলে নিয়ে পরে ল্যাবরেটরিতে পাঠাই। এই ল্যাবরেটরির রিপোর্ট। আপনি যে দামী বিশেষ ব্র্যাণ্ডের কোল্ড ক্রীম মাখেন তারই ছোপ ছিল খাটের তলায়।'

'হতে পারে না। লাগতে পারে না দাগ মেঝেয়!'—রামসহায় চিৎকার করে উঠলো, 'সেদিন ক্রীম মেখে আমি ও-ঘরে'—

রামসহায় হঠাৎ চুপ করার সঙ্গেই খুট করে দুবার শব্দ হলো। দেখলাম হাতকড়া দুটো এতক্ষণে রেড্ডি সাহেব রামসহায়ের হাতে এঁটে দিয়েছেন।

রামসহায় কেমন হতভম্ব হয়ে গেছে নিজের নির্বুদ্ধিতায়। পরাশর হেসে উঠে বললে, 'এইটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম রামসহায়জি। আপনার নিজের মুখে এই ধরা দেওয়াটুকুর জন্যে। এ ল্যাবরেটরির রিপোর্ট কিছু নয়। কোল্ড ক্রীম আর কোথায় পাবো, আমি নিজে একটু মাথার তেল একটা কাগজে লাগিয়ে মিছিমিছি ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছিলাম। ল্যাবরেটরির এ রিপোর্টেও কোল্ড ক্রীমের কথা কিছু নেই। আপনি অত্যন্ত ধড়িবাজ। আপনার ঘরে কোল্ড ক্রীমের কৌটা দেখে আপনার ওপরও টেক্কা দেবার এই ফন্দি আমার মাথায় আসে। ফন্দিটা সফলও হয়েছে। অবশ্য কি করে আপনি মামার ঘরে ঢুকেছিলেন এখনো জানি না। যদি ইচ্ছা করেন বলতে পারেন। না বললেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, কি করে ঘরে ঢুকেছিলেন, না জানলেও কি আপনি করেছিলেন তা আমরা জানি। আপনি মামার ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর খাটের গোপন খোপ থেকে রিভলবার বার করে প্রথম তাঁকে গুলি করেন, তারপর ভেতরে থেকে জানালাটা ঘা মেরে ভাঙেন। জানালার যা ব্যবস্থা ছিল তাতে বাইরে থেকে ধাক্কা দিলেই আলো জ্বলবে ও সাইরেন যন্ত্র বাজবে। ভেতর থেকে ভাঙায় সে-সব কিছু হয়নি। তারপর জানালাটা বাইরে থেকে ভাঙা হয়েছে বোঝাবার জন্যে আপনি বাইরের সমস্ত কাঁচ যতদূর সম্ভব তন্ন তন্ন করে খুঁজে ভেতরে এনে ফেলেন। তা সত্ত্বেও দুটো টুকরো আপনার নজরে পড়েনি। তাতে কিছু ক্ষতিও হতো না, যদি না জানালাটা ভেতর থেকেই ভাঙা হয়েছে সন্দেহ করে আমি বাইরে টুকরো খুঁজতে না যেতাম। কাচের টুকরো ভেতরে সব ফেলে আপনি বিদরীর থানায় ফোন করেন গোপন জুয়ার আড্ডার খবর দিয়ে জাল রঘুনাথকে ধরাবার জন্যে। পরে সেদিন আবার সে রঘুনাথ যে জাল সে-খবর আপনিই সেখানে জানিয়েছেন। বিদরীতে ফোন করার পর সে রাত্রে ইফতিকার সাহেব ও রঘুনাথকে একেবারে যাকে বলে অকুস্থলে সন্দেহজনক অবস্থায় ধরবার জন্যে আপনি নিশ্চয় এখানকার থানাতেও ফোন করবার চেষ্টা করেছিলেন। কেন যে ফোনে ধরতে পারেন নি, বলতে পারি না।'

'ফোন তখন সম্ভবত এনগেজড ছিল। কারণ ইফতিকার সাহেব ওই সময়েই আমায় ফোন করেছিলেন থানায়—আমার মনে আছে।' বলেন রেড্ডি সাহেব।

'ইফতিকার সাহেব!' পরাশর একটু হেসে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাহলে আপনিই ফোনে পুলিশের কাছে খবরটা দেন।'

'হ্যাঁ।' বললেন ইফতিকার সাহেব, 'আমি সে-রাত্রে বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে ওইটুকু হেঁটে আসতে আসতেই দেখতে পাই বজৌরী সাহেবের ঘরের আলোটা হঠাৎ

নিভে গেল। বজৌরী আমার জন্যেই অপেক্ষা করে থাকার কথা। সুতরাং হঠাৎ আলো নেভার মানে বুঝতে না পেরে আমি একটু চিন্তিতভাবে তার জানালার দিকেই আগে যাই। আমার কাছে রাত্রে সব সময়েই টর্চ থাকে। সেই টর্চের আলো ফেলে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাই। জানালার কাঁচ ভাঙা আর ভেতরে যেভাবে বজৌরীর রক্তাক্ত দেহ খাটের ধারে পড়ে আছে, তাতে খুন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে আর না দাঁড়িয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে এসে রেড্ডি সাহেবকে ফোন করি। আমার জুতোর তলায় কাচের গুঁড়ো যদি লেগে থাকে তখনই লেগেছিল।'

'সে আমি জানি।' বললে পরাশর, 'আর তাই জন্যেই আপনাকে সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে তক্ষুণি বাদ দিয়েছি। রঘুনাথের জুতো আমি পরীক্ষা করে দেখিনি। কিন্তু তাতে কাচের গুঁড়ো বোধহয় পাওয়া যাবে না।'

'না। সে রাত্রে মামাজির ওখানে যেতে আর আমার ইচ্ছেই হয়নি। 'আদমি' ছবিটা দেখে মনটা এমন ভরে গিয়েছিল যে, ওরকম নোংরা কাজ করতে যেতে আর প্রবৃত্তিই হয়নি। ভেবেছিলাম, মামাজি যদি অন্যায় করে আমায় উইলে বঞ্চিত করতে চায় তো করুক। মামাজি যে সেদিন খুন হয়েছেন আমি কল্পনা করতেও পারিনি।'

পরাশর সহানুভূতির সঙ্গে বললে, 'হ্যাঁ, আপনি কি করে জানবেন যে, আপনার শয়তান ভাই খাটের তলায় লুকিয়ে থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় মামাকে গুলি করে মারছে তখন!'

'ঘুমন্ত অবস্থায় মেরেছি!' রামসহায় গলায় বিষ ঢেলে বলে উঠলো, 'তোমার মতো ছুঁচো গোয়েন্দা ওর চেয়ে বেশি কি বুঝবে! শোনো তাহলে আহম্মক, আমি বাইরে থেকে ক'টা ন্যাকড়া আর ভিজে খড়ে আগুন ধরিয়ে তার ধোঁয়া দরজার ফাঁক দিয়ে হাওয়া করে মামার ঘরে চালিয়ে দিয়ে 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার করে মামার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। মামা ভয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠে দরজা খুলতেই অন্ধকারে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে খাটের মাথার খোপ থেকে রিভলবার বার করে তাঁকে গুলি করেছিলাম। বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, আমাকে উইল থেকে বাদ দিলে কি হয়!'

পরাশর হেসে উঠে বললে, 'তারপর সে উইলের খসড়াটাও ঘর থেকে সরিয়ে নষ্ট করে বা পুড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়!' দাঁতে দাঁত চেপে বললে রামসহায়।

পরাশর গম্ভীরভাবে একবার বললে, 'পাষণ্ড বদমায়েসদের দম্ভই তাদের কাল হয় এই আমাদের বাঁচোয়া। নইলে কোনো গোয়োন্দাই বোধহয় তাদের চুলের ডগাও ছুঁতে পারতো না।'



হীরের টুকরো

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। হ্যাঁ, ক'বছর তাও মনে আছে রত্নার। তখন মাত্র এগারো বছরের। বাবার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে ছিল। আগেকার অন্ধকার—বাবা যা গল্প করেন—এখনও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, করতেন বলাই উচিত—তা হোক, সেই সাইরেন বাজানো অন্ধকার—এ তা নয়। এখন সরকারী কর্মচারীদের শৈথিল্যের জন্য কৃত অন্ধকার। বলা নেই কওয়া নেই—ঝুপ করে অন্ধকার হয়ে যায়। চারদিকে ঝলমল করছে আলো, হঠাৎ পাড়াসুদ্ধ নিকষ কালো অন্ধকার।

সেদিন রবিবার। ওঁদের দোকান বন্ধ, বাবা বিকেলে বারতিনেক চা খেয়ে অলস সন্ধ্যাটা উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যেতে মনে হল, বাইরে রাস্তাঘাট দেখার মতো ঘটনা তো অন্যদিন দেখা যায় না—আজ দেখা যাক।

সঙ্গে সঙ্গেই রত্না বেরিয়ে এসেছিল, বাবার লুঙ্গিটা ধরে—তখনই এই ঘটনাটা ঘটল।

আকস্মিক, অকারণ, স্বপ্নাতীত।

ভদ্রলোক ব্যবসাদার। পৈতৃক ব্যবসা, মনোহারীর দোকান। তখন ছিল সামান্য, পরে বড় ছেলে কেশব, তার তখন পঁচিশ বছর বয়স, ছোট মাধবের তেইশ—এরাই খেটেছে। প্রাণপণে খেটেছে। সামান্য থেকেই দোকানটিকে অসামান্য করে তুলেছে। অবশ্যই প্ল্যান-প্রোগ্রাম কেশবেরই, শুধু আমদানী করা মনোহারী বস্তু নয়—কিনে এনে বিক্রি করা—তাতে থামে নি কেশব—কিছু কিছু জিনিস তৈরি করেছে ছোট ছোট কারখানা করে। ক্রমশ সে কারখানা বেড়েছে। সেটা কেশবই দেখেছেন। মাধব দোকানটি।

'ঝাঁপ বন্ধ করা' যাকে বলে—সব বন্ধ করে দুই ভাই হিসেব-নিকেশ নিয়ে বসতেন—ফলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা, এক একদিন বারোটাও বেজে যেত।

অর্থ এলেই অনর্থ—কথাটা প্রতিদিনেই যেন জপমালার মতোই মনে করে রত্না।

এবার একদিন কেশবই কথাটা তুলল। বলল,—'দ্যাখো, এখন তো আমরা একান্নবর্তী নই, স্ত্রীরা এলে একত্তরে থাকাও যায় না। দুজনেরই ছেলেমেয়ে আছে, ভবিষ্যৎ—। তুমি ভাল করেছ পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভাড়াবাড়িতে উঠেছ, এ তোমার মহত্ত্ব। তা তেমনি আমি ভাল জমি কিনে, প্ল্যান পর্যন্ত করে দিয়েছি—বাড়ি উঠতে শুরু করেছে। তোমার না অসুবিধা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখি সর্বদা।

'তা আমি বলি কি, তুমি যেমন মনোহারী দোকানটা দেখছ—তোমার চেষ্টাতেই অনেক বাড়িয়েছ, ওটাই তোমার থাক, আমি কারখানাটা নিই। কী বল?'

মাধব এইটেই আঁচ করেছিল, তার জন্য প্রস্তুত ছিল। বলল, 'তা কেন দাদা, সংসার আলাদা হয়েছে হোক, ব্যবসা একসঙ্গেই থাক, এরও অর্ধেক লাভ তুমি নেবে, আমিও কারখানার অর্ধেক লাভ নেবো। এতে ঝগড়াঝাঁটির তো কারণ নেই। যেমন চলছিল তাই থাক না!'

এই সূত্রপাত।

প্রথমে বুঝিয়ে বলা, তারপর একটু কটু কথা। মনের বিষ উদ্‌গার করা। এটর্নি উকিল আসা-যাওয়া শুরু হল।

এই ভাবেই চলছে, এমন সময়ে এই কাণ্ড।

যে বাড়িতে মাধব আছে—একতলা, নীচু। পাওয়া যায় নি বলেই এ বাড়িতে আসা। তা ছাড়া বাড়ি তৈরি চলছে, একতলা থাকার মতো হলেই সে বাড়ি চলে যাবে। এমন কোন জীবন-মরণ টানাটানির মতো হবে তা মাধব ভাবে নি।

সেদিন রবিবার আগেই বলেছি। ছুটির দিন, অলস দিন, সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল (এ অবস্থা তখন প্রাত্যহিক ছিল না, তবে ছিল)। মাধবের মনে হল এমন অবস্থা কখনও বাড়ি বসে দেখে নি, কারণ কাজের দিন দোকান থেকে ঘরে ফিরতে এখনও দেরি হয়—আজ একবার বাড়ির দরজায় গিয়ে দেখা যাক। সে এসে বাইরে দাঁড়াল। তখনও হ্যারিকেন জ্বালার বোধ হয় সময় হয় নি। অকস্মাৎ একটা লোক সাইকেলে যেতে যেতে একটা রিভলবার থেকে গুলি করেই তীরবেগে চলে গেল। মাধবের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এখনও মনে হয় রত্নার, সেই সন্ধের ঘটনাটা ভাবলে আজও যেন মনের সে অবস্থা হয়ে পড়ে। বিহ্বল? না আরও বেশিরকম কিছু? রত্না তখন বেশ ছোট, বাবার সঙ্গে রত্নাও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, বাবার লুঙ্গির একটা প্রান্ত ধরে।

ঘটনাটা কি হল—ভাবতেই তো খানিকটা সময় গেল। ততক্ষণে অবশ্যই অনেকে বেরিয়ে এল। তারপর পুলিস ইত্যাদি।

কেশব খুব হাহাকার করলেন। ঐ দোকান বেশ মোটা টাকায় বিক্রি করে সব টাকা ভাদ্রবৌয়ের হাতে তুলে দিলেন, কী ভাবে টাকা সব লগ্নী করা যায় তাও শিখিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, বাড়িটা যতদূর সম্ভব তৈরি হয়ে যাক তা তিনি দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করেছেন। গৃহপ্রবেশের দিনও দাঁড়িয়ে থেকেছেন, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে।

কেউ কোন অভিযোগ করতে পারবে না। মহাদেবের মতো বড় ভাই—সকলেই ধন্য ধন্য করলে।

মাধবের একটি মেয়ে—সেটিই রত্না। ছেলেটি মাত্র ছয় বছরের। সুতরাং ব্যবসা করার মতো কেউ সাবালক হয় নি।

রত্না বড় হয়েছে, এম. এসসি. পাস করেছে, কলেজে চাকরি করছে।

বিয়ের কথা তোলে মা, রত্না শুধু বলে 'না মা, সে সময় হয় নি এখনও।'

রত্না সেদিনের কথা ভুলতে পারে নি। সেই অভিশাপপূর্ণ সন্ধ্যারাত্রির কথা।

বাবার এই অপঘাত মৃত্যুর শোধ নেবে সে, তার আগে আর কোন কথা ভাববে না। সে কথা কাউকে বলতে পারে নি, পাছে ঘাতকটি সতর্ক হয়ে ওঠে। খবরের কাগজেও এ সম্বন্ধে কোন 'রাও' তুলতে দেয় নি।

মনে থাকার কথা নয়। বলতে গেলে পলকের কথা, এই ঘটনা। তবু মনে আছে রত্নার—পিস্তলের আলো জ্বলে ওঠার মুহূর্তটিতেই একটি আংটির ছবি চোখে পড়েছিল—মধ্যে কী একটা পাথর তা দেখা যায় নি, পাথরটির দুপাশে ছোট ছোট হীরের দুটো টুকরো চোখে পড়েছিল।

যত ছোটই হোক, তারও জেল্লা অসাধারণ।

একবার মনে হয়, এতে কি—এই সামান্য পাথরের দ্যুতিতে ওকে পথ দেখাতে পারবে?

কিন্তু আকস্মিক ভাবেই ঘটনার যোগাযোগ ঘটল। কলেজের সেমিনার উপলক্ষে দ্বারভাঙায় যেতে হল রত্নাকে। মোকামা জংশনে নেমেছে রত্না, পরের ট্রেনে দ্বারভাঙা যাবে। অকস্মাৎ ওর চোখে পড়ল, আগে মানুষটা নয়, আগেই সেই পাথরটা। মাঝখানে বড় মুক্তো একটি, আর দুপাশে দুটো হীরের টুকরো ছোট ছোট।

চোখ জ্বলে উঠল রত্নার।

এতদিনে পেলাম। তবে কি বাবার আত্মা পথ দেখিয়ে দিল?

কিন্তু যার হাতে আংটি—সে যে ঘাতক হবার মতো নয়।

বাঙালী তো বটেই, বয়স ২৫ থেকে ২৮-এর মধ্যে, অতি সুপুরুষ এবং বড় ঘরের কোন ছেলে।

সম্ভবত কোন কাজেই এসেছেন বা এসেছিলেন।

পরিচয় তো নেই-ই, হঠাৎ কথাটা পাড়লে খারাপ দেখাবে না? অথচ—

না, সময় নেই।

একেবারেই সামনে এসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, এ আংটিটি কোথা থেকে পেয়েছেন?'

ভ্রূকুটি দেখা দেবে বৈকি!

সঙ্গে সঙ্গেই রত্নাও সে ভুলটা বুঝলে।

একেবারে হাতজোড় করল রত্না।

'দেখুন, কথাটা এভাবে বলা উচিত নয়, তা আমি বুঝি, কিন্তু হঠাৎ আপনাকে দেখলুম, এই আংটিটা হাতে—আমার যে এর সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর কথাটা জোর দিয়েই বলছি—স্মৃতি। তাই—'

নরম হলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'আমি তো এত জানি না, কিছুই জানি না। একটা মোকর্দমার ব্যাপারে এসেছি, আমি সবে অ্যাটর্নিগিরি ধরেছি—এসেছিলুম ভাগলপুরে এক উকীলের কাছে, সেই প্রসঙ্গে কথা হতে হতে উকীলবাবু বললেন, আপনার তো টাকা আছে, একটা আংটি কিনবেন? অতি মহার্ঘ্য আংটি, জলের দামে বিক্রি করতে চাইছে একজন। এই উর্দুবাজারের মধ্যেই—এক হাজার টাকা পেলেই দেবে।

'তার মানে চোরাই?

'হ্যাঁ। এসব আংটি চোরাইতে আসে বা খুনোখুনি—। তাতে কি, আপনার শখ থাকে তো নিন, আমি জিম্মাদার।

'তা শখ হল। নিয়ে নিলাম। ইতিহাস এইটুকু।'

রত্না বললে, 'আংটিতে আমার লোভ নেই, ও সর্বনেশে আংটি। আমি সেই লোকটিকে চাইছি। তার হদিশ কোথায় পাবো?'

'তা আমিও জানি না। তবে যাবেন আমার সঙ্গে ভাগলপুরে? আমার যে কৌতূহল হচ্ছে খুব।'

'তাহলে তো আমি বেঁচে যাই। চলুন চলুন।'

উর্দুবাজারে গিয়ে উকিলবাবুকে ধরতে তিনি বললেন, 'কে দিয়েছে তা জানি, কিন্তু সে কি আর এক হাতে এসেছে! দেখি।'

ডেকে পাঠালেন। সে লোকটি—দিলমহম্মদ নাম, প্রাণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এল, আগেই কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'আমি কিছু জানি না হুজুর, ঐ দুধওয়ালা বললে, তার কে আত্মীয় হয়, সেই বললে—'

'ঠিক আছে, তাকে আনতে হবে। দুধওয়ালাকে বলো এসব কোন ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার নয়, একটা ঠিকানা জানতে চাই।'

দুধওয়ালা এবার সঙ্গে করে নিয়ে এল আর একজনকে। সেও কাঁদো-কাঁদো। বললে, 'বাবু, এক বাঙ্গালই আমার কাছে এসে বললে, আমি এটা কমদামেই পেয়েছি, যে বেচেছে সে বোধ হয় কোন চোরাই মাল পেয়ে থাকবে—বলেছে, আমি কাশী চলে যাবো, ওখানে কোন কাম যদি পাই, আমাকে তো কেউ বিশেষ চেনে না—তুমি যা হয় দাও। তা আমি অনেক টানাটানি করে চারশ টাকা দিয়েছিলুম বাবুসাহেব, তারপর এই হাত ঘুরতে ঘুরতে—'

অ্যাটর্নি দেবেশবাবু বললেন, 'তুমি ঠিক জানো সে কাশীই চলে গেছে?'

'তা কী করে জানবো বাবু। তবে অন্য কোন জায়গায় গেছে কিনা—' বলতে বলতে বলে উঠল, 'একবার শুধু বলেছিল, আচ্ছা, দ্বারভাঙা যেতে হলে কোন্ গাড়িতে চড়তে হবে? অবশ্য যাবো না এখন—ওখানে আমার এক বহিন আছে—যা হোক সে পরে হবে।'

'দ্বারভাঙা শহর?'

'তা বলতে পারব না। তবে বাঙালী দ্বারভাঙা শহরেই বেশি।'

আর দেরি করল না দেবেশ আর রত্না। রত্নার তো দ্বারভাঙাতেই যাবার কথা। দেবেশের কৌতূহল ও সংশয় আংটি নিয়ে। উকীলবাবু জোর করে খাইয়ে রাত্রের ট্রেনেই ওদের তুলে দিলেন।

দেবেশের দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় থাকেন দ্বারভাঙায়, নন্দবাবু, তিনিও উকীল। দেবেশরা প্রথমে ওখানেই গেলেন।

'আরে, আসুন আসুন, এ কী ভাগ্য আমার।'—বলতে বলতে সঙ্গে করে সামনের বড় বারান্দায় বসালেন নন্দবাবু। প্রবাসী বাঙালীরা অতিথিপরায়ণ হন। ওখানে চেঁচিয়েই স্ত্রীকে বললেন, 'ওগো শুনছ, দেবেশরা এসেছেন, আগে চা দাও, মুখ হাত ধোওয়ার জল পাঠাও—দেরি কোরো না।'

দেবেশ বললো, 'কী বিপদ, এমন হৈচৈ করবেন জানলে আসতুম না।'

'বটে, অ্যাটর্নি হয়েছেন বলে একেবারে আসতুম না বলে বসলেন! এত অধৈর্য কেন। এই ইনি? বিয়ে হয়েছে, না হবে।'

দেবেশ বললেন, 'সত্যি, এই জন্যেই বলে গাঁওয়ার। দুম্ করে বলে বসলেন। কিছুই না। ইনি একটা জিনিসের জন্যে খুব ব্যগ্র। মোকামা জংশনে পরিচয়, ওঁর জন্যেই উজানে আসতে হল। আর কিছু না।'

নন্দবাবু একটু অপ্রস্তুত হলেন।

যাই হোক, চা এল, প্রচুর লুচি-তরকারী এল, মিঠাই। মুখ-হাত ধোওয়ারও অসুবিধা হল না।

তার মধ্যেই রত্নার আংটির কথাটা উঠল।

সব শুনে নন্দবাবু বললেন, 'বিপদে ফেললেন, এখন দ্বারভাঙা আগের মতো এতটুকু নয়। নতুন এসেছে, বোনের কাছে। এইটুকু শুধু জানেন। খয়ের! দেখি কী করা যায়।'

দেরি হল বিস্তর। নন্দবাবু তিন-চারজনকে লাগিয়ে দিলেন। তাতেও সময় লাগল। স্নান করে উঠেও উদ্বিগ্ন হয়ে বসে রইল রত্না। এই উদ্বেগ নিয়ে সেমিনারের আলোচনাতেও যোগ দিয়ে লাভ হবে না। এই ভদ্রলোককে নিয়ে আসা, খরচাও নিচ্ছেন না—তার সঙ্গে এই আতিথেয়তা। বড় লজ্জায় পড়ে রইল।

তবে বিকেলের মধ্যেই সে লোকটিকে পাওয়া গেল। হ্যাঁ, লোকটি বোনের বাড়িই এসেছে, সেও নাকি অনেকদিন পরে—বিয়ের পরেই বলতে গেলে।

যে লোকটি এল, মাঝারি ধরনের গড়ন। তবে বেশ একটু মাথা উঁচু করা লোক। অপরদের মতো কাঁপতে কাঁপতে আসা নয়।

আরও লক্ষ্য করল রত্না, বাঙালী হয়েও উচ্চারণটা যেন বহুদিনের ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মতো।

প্রশ্নটা নন্দবাবুই তুললেন।

উকীল মানুষ। দেখেই বুঝলেন, এ মাথা উঁচু করা লোক। সেই ভাবেই কথাবার্তা চালালেন।

'তুমি বাপু, এই আংটিটার কথা কিছু জানো?'

'জানি বৈকি বাবু, এর অনেক কাহিনী। আপনারা কেউ শচীদুলালবাবুকে চিনতেন?'

'না, কে শচীদুলাল, শুনি নি তো!'

'আপনাদের অবশ্য জানবার কথাও নয়। সে যাক্, তিনি কলকাতারই লোক, লেখাপড়া জানা। আপনারা কেউ কলকাতারই এক লোক—কেশববাবুকে চেনেন? শুনেছি খুব ভারী ব্যবসার মালিক।'

'জানি বৈকি। আমার জেঠামশাই। তিনি এর মধ্যে—' রত্না উৎকণ্ঠায় বিস্ময়ে কথা শেষ করতে পারল না।

মুখে চু-চু শব্দ করে বললে, 'সে যাক, কথাটা তো পাড়তেই হোত। যাক, আগে শচীদুলালের কথাটাও বলি। ঐ ভবানীপুরেরই মানুষ, লেখাপড়া-জানা লোক, টাকাকড়িও ছিল। বিয়েও হয়েছিল ভাল মেয়ের সঙ্গে—কিন্তু একরকম লোক থাকে জানেন তো, এরা অধঃপাতেই নামতে চায়। প্রথমটা শুরু হল জুয়া খেলার। ঘোড়দৌড় তো বটেই, তা ছাড়া নানারকম শুরু হল। ফলে বাজে বজ্জাত লোকেদের পাল্লায় পড়ল। ঘরে খপসুরত বউ, অথচ একটা কালো ধুমসো মেয়েছেলের সঙ্গে দিন কাটায়। আনুষঙ্গিক তো সবই আছে, এমন লোক অধঃপাতের জন্য ব্যস্ত হবেই।

'টাকা হাতে না থাকলে নানান ফিকিরে টাকার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়ায় ওরা। ক্রমে যেমন সব রকম নেশায় চতুরং, তেমনি সব রকম পাপে। আপনাদের কেশববাবু নাকি এইরকম লোকই চেয়েছিলেন। শচীকে ডেকে এনে বললেন, দ্যাখো, তুমি নাকি সব কুকর্ম করে বেড়াও। মানুষ মারতে পারো? শচী বললে, হ্যাঁ, পারি বৈকি। ওটা অবশ্য এখনও হয় নি। তবে মোটা টাকা পেলে সেটাও শুরু করতে পারি।

'কত চাও? কেশববাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'দশ হাজার চাই। আর পাঁচ বোতল বিলিতী হুইস্কি।

'না,' অত হবে না। পাঁচ হাজার পাবে আর অল প্রোটেকশন।

'এই নিয়ে নাকি অনেকক্ষণ দর-কষাকষি হয়। শেষ পর্যন্ত রফা হল—কিছু মনে করবেন না বাবু, এ ঐ শচীবাবুর কাছেই যা শোনা—ছ হাজার টাকা; একটা রিভলবার, আর ঐ যে কেশববাবুর হাতের আংটি—ওটা চাই।

'কেশববাবু খুব ধস্তাধস্তি করেছিলেন, সদ্য নাকি কোন বিলাইতি সাহেবের কাছ থেকে কিনেছেন আড়াই হাজার টাকা দিয়ে—কিন্তু শচীরও ঐ বুলি ছিল, নইলে হবে না। অগত্যা ঐ আংটি খুলে দিতে হল।

'তারপর—যা মনে হচ্ছে আপনাদের আত্মীয়। খুন করতে এক মিনিটও লাগে নি, তা নিয়ে যতই হট্টগোল হোক, শচীকে কেউ জড়াতে পারে নি। জড়ালেন কেশববাবুই। তাই-ই শচীর সন্দেহ। শচী এটা ভাবে নি কখনও। কে সব লোকজন ছিল, অন্য একটা ব্যাপারে এমন ভাবে ফাঁসিয়ে দিলেন—শচীরও তো অগুণতি ছিদ্র জীবনে—পুলিসও একেবারে প্রস্তুত হয়ে ছিল—মামলা সাজানোরও কোন খুঁত হয় নি—জেলে চলে গেলেন ছ বছরের জন্যে। আর, আমি ওঁর মুখে সব শুনে যা বুঝেছিলুম, ওঁকে আর বাইরের বাতাস পেতে হবে না।'

দেবেশ স্থির মুখে সব শুনে বললেন, 'এসব তুমি জেলের মধ্যেই জেনেছ তো? না?'

'হ্যাঁ হুজুর। মিথ্যে বলব না। ভাল কিছু করতে গিয়ে মন্দ পথে পা দিয়েছিলুম। আমি অবশ্য জেলে গিছলুম শচীবাবুর জেল হবার অনেক পরে। আমার সাজাও ছিল কম, আড়াই বছর।'

'তা ও আংটি তুমি পেলে কি করে?'

'বলছি বাবু, আমি ওঁর মতো পাঁড় বদমাইশ ছিলাম না। কিছু দিক্-এর জন্যই এটা হয়েছিল—সেই জন্যেই হোক, আর এমনিই আমি বাবু নির্বিরোধী মানুষ, তিনিই আমাকে একদিন নিভৃতে বললেন, দ্যাখো, আমার যা শরীরের অবস্থা, অনেক রকম অত্যাচার চালিয়েছি তো এই শরীরটার ওপর—বেশী দিন বাঁচব না, যদি বা বাঁচি, কেশববাবু হয়তো অন্য ফাঁদে জড়াবেন। পুলিস তো ওঁর পয়সা খেয়ে বসে আছে। তোর ওপর আমার একটা ভালবাসা হয়েছে। আমার সবচেয়ে শখের জিনিস একটা আংটি, দামী বলে নয়, বিলিতী সেটিং, এমন আর দেখি নি কখনও—কেশববাবুরও খুব শখের জিনিস, সবে আঙুলে পরেছেন, সেইটে আমি জোর করে আদায় করেছিলুম। কেশববাবু ভেবেছিলেন জেলে পোরবার সময়ে কেড়ে নেবেন—তা পারেন নি। অনেক প্যাঁচ শিখেছি বজ্জাতদের সঙ্গে—সেটা নিতে পারেন নি।...অথচ আমারও ভোগে লাগল না, ওটা অভিশাপের আংটি। তুই নিয়ে যদি কোনমতে বার হতে পারিস, এটা পরবার চেষ্টা করতে যাস নি, যত তাড়াতাড়ি পারিস বেচে দিস, যা পাস।

'সত্যিই শচীবাবু বেশীদিন বাঁচেন নি। আমি জেল থেকে বেরোবার মাস দুই আগেই মারা গেলেন। আমারও বাবু ভয় হয়েছিল, আমি অবিশ্যি কলকাতায় ভাঙাবার চেষ্টা করি নি, চলে এসেছিলুম ভাগলপুরে—যে সব পাড়ায় এই সব কথা নিয়ে ঘোঁট হবে না, সেই জায়গাতেই এটা দিয়েছি আর যা দিয়েছে তাই নিয়েছি। এই আমার কথা। এখন আপনারা মালিক।'

বলে লোকটি চুপ করল।

ওকে কিছু বলার ছিল না, ওকে নিয়ে কোন কাজেরও প্রয়োজন নেই।

সেই আংটি নিয়ে রত্না আর দেবেশ সেই দিনই রওনা হল। ঘটনা সব শোনার পর দেবেশ আংটিটা খুলে রত্নার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। রত্না দেবেশ যে দামে কিনেছিলেন সেই দাম দিতে চেয়েছিল। দেবেশ নেন নি, বলেছিলেন, 'এখন থাক, পরে দেবেন। আমি তো আপনার সঙ্গেই আছি, যবনিকা না ওঠা পর্যন্ত।'

কলকাতায় ফিরে আসার পর একদিন পরে দেবেশকে নিয়ে জেঠার বাড়ি গেল রত্না।

এটা যেন এখন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে, দুজনকে একই সঙ্গে যেতে হবে এ ব্যাপারে।

জেঠার বাড়ি, কেউ কিছু বলার নেই। সবাই অভ্যর্থনা করল, কেবল দেবেশ সম্বন্ধে একটু জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন রয়ে গেল।

রত্না জিজ্ঞেস করল, 'জেঠু কোথায়?'

'ওঁর কদিন শরীরটা ভাল নেই, ডাক্তার আসছে। তা যাও না। তুমি যাবে তার আর কি?'

রত্না চোখের ইঙ্গিতে দেবেশকেও সঙ্গে যেতে বলল। দেবেশ সম্বন্ধে ওঁদের চোখে-মুখে প্রশ্নটা শুধু ফুটে উঠল। রত্না কিছু বলল না।

কেশববাবুর ঘরে ঢুকে রত্না কোন সম্ভাষণের অবকাশ দিল না। সরাসরিই কথাটা পাড়ল আংটিটি বার করে, 'এই যে জেঠু, কেমন আছেন! আপনার একটা শখের জিনিস ছিল, এতদিন পরতে পারেন নি—এই যে সেই আংটিটা। বাবাকে খুন করতে গিয়ে টাকার সঙ্গে এই আংটিটাও দিতে হয়েছিল শচীদুলালকে, তার মরবার পরও আপনি খুঁজে পান নি। ভাইয়ের জীবনের জন্যে টাকার মূল্য যা দিতে হয়েছিল, তার সঙ্গে এটাও ছিল না?'

কেশববাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'এ—এ সব কি, কী বলছিস! এ লোকটা কে?'

প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিতে বলল রত্না, 'ইনি পুলিসেরই লোক। ওঁদের কাছে সবই কাগজপত্র আছে—তা আজ তো আর এ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

কেশব একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রায় আছড়ে পড়ে গেলেন।

আর উঠতে পারলেন না। বোধহয় আর পারবেনও না।

আংটিটা সামনেই গড়িয়ে পড়েছিল মেঝের ওপর। রত্না পায়ের জুতো দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো করে দিল।

হাড়ের পাশা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিরীটী একটা ঘর খুঁজছিল শ্যামবাজার অঞ্চলে।

শুধু শ্যামবাজার অঞ্চলেই নয়, বিশেষ করে শ্যামবাজার ট্রামডিপোর কাছকাছি কোন এক জায়গায় হলেই যেন ভাল হয়।

যে সময়কার কথা বলছি তখনও কলকাতা শহরে ভাড়াটে বাড়ি পাওয়ার বিভ্রাটটা এখনকার মত এতটা প্রকট হয়ে ওঠেনি। রাস্তায় যেতে যেতে অনেক 'টু লেট'ই চোখে পড়ত।

নির্দিষ্ট অঞ্চলে দু'একটা ঘর যে কিরীটী পায়নি তাও নয়, কিন্তু ঠিক পছন্দসই হচ্ছিল না যেন।

বিশেষ করে নির্দিষ্ট একটি পরিধির মধ্যেই নয়, কিরীটী যে একটি ঘর খুঁজছিল ঐ অঞ্চলে—তার কারণও অবশ্য একটা ছিল কিন্তু সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

এমন সময় অকস্মাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে ডালহাউসী স্কোয়ার অঞ্চলে কলেজের একদা সহপাঠী সত্যশরণের সঙ্গে একটা চলমান ট্রামে দেখা হয়ে গেল কিরীটীর। এবং কথায় কথায় সত্যশরণ শ্যামবাজার অঞ্চলেই থাকে শুনে তাকেও ঘরের কথা বলায় সত্যশরণ বললে, আমরা ন্যায়রত্ন লেনে যে সেমি মেসবাড়িটায় থাকি সেইখানেই তো কিছুদিন হলো একটি ঘর খালি পড়ে আছে! সত্যি কথা বলতে গেলে বাড়িটার মধ্যে দোতলায় সেই ঘরটিই সব চাইতে ভাল। আকারে বড়। দক্ষিণ খোলা।

চমৎকার, ঐ ঘরটা তাহলে আমার জন্য ঠিক করে দাও ভাই। কিরীটী অতি মাত্রায় যেন উৎসুক হয়ে ওঠে।

আরে সেজন্যে আটকাবে না। ঘরটা তো দেখেই আগে পছন্দ করো, তাছাড়া বাড়িওয়ালা মন্দ লোক নয়, ভাড়াও দেবে যখন।

পছন্দ ঠিক হয়ে যাবে ভাই। অন্ততঃ তোমার মুখে শুনে তাই মনে হচ্ছে। ঘরটা আজই পাওয়া যায় কিনা বল। তাহলে সন্ধ্যার পর তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো!

ব্যাপার কি হে! তোমার যে একেবারে তর সইছে না। তোমার সে শিয়ালদার বাণীভরন মেস কি হলো?

সেখানে ঠিক সুবিধা হচ্ছে না ভাই। তাই অনেক দিন থেকেই ছেড়ে দেবো দেবো ভাবছি।

বেশ তাহলে চল। আমি তো এখন বাসাতেই ফিরছি।

ঠিক আছে, তাই চল। শুভস্য শীঘ্রম।

দ্বিপ্রহরের কর্মব্যস্ত কলকাতা শহর।

ট্রাম চলছে ঠং ঠং ঘন্টি বাজিয়ে শ্যামবাজার অভিমুখেই।

কিরীটী সত্যশরণের পাশে বসে মনে মনে ভাবছিল তারই দেওয়া সংবাদটির কথা।

ঘরটা দেখেই কিরীটীর বিশেষ পছন্দ হয়ে গেল।

ন্যায়রত্ন লেনে এমন একটি ঘর পাওয়া যাবে এবং একেবারে ঠিক এতটা মনোমত জায়গায় কিরীটী ভাবেনি—আশাও করেনি, অদ্ভুত যোগাযোগ।

দিন কয়েক আগে কিরীটীর পূর্বপরিচিত শ্যামপুকুর থানার ও. সি. বিকাশ সেনের ওখানে কিরীটী নিজেই ঘুরতে গিয়েছিল বলতে গেলে একপ্রকার তার নিজের কৌতূহলেরই তাগিদে।

গত তিন মাসের মধ্যে শ্যামবাজার ট্রামডিপোর আশেপাশে তিন-তিনটি অত্যন্ত রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

তিনজন নিহতের মধ্যে একজন অবাঙালী বেহারী মধ্যবয়সী, একজন অল্পবয়েসী পাঞ্জাবী মুসলমান ও সর্বশেষজন ৩৫/৩৬ বৎসর বয়স্ক বাঙালী যুবক।

এবং কোনবারই মৃতের দেহে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কেবল প্রত্যেকেরই গলায় একটি সরু কালো দাগ দেখা গিয়েছে মাত্র।

এবং করোনার্স রিপোর্ট হচ্ছে ঃ শ্বাসরোধে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে।

নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের এবং বলতে গেলে নির্দিষ্ট একটি পরিধির মধ্যে গত তিন-চার মাসের মধ্যে তিন-তিনটি রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড এবং প্রত্যেকেরই শ্বাসরোধে মৃত্যু ও প্রত্যেকেরই গলায় একটি করে সরু কালো দাগ—সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ সংবাদটি কিরীটীর কৌতূহলকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এবং ঐ অঞ্চলের থানা অফিসার বিকাশের সঙ্গে কিছুটা পূর্বপরিচয় থাকায় শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই কিরীটী বিকাশের ওখানে গিয়ে এক সন্ধ্যারাত্রে হাজির হয়।

একথা সেকথার পর আসল কথা উত্থাপন করায় বিকাশ সেন বলেন, ব্যাপারটা যেন আগাগোড়াই মিস্টিরিয়াস কিরীটী। অনেক অনুসন্ধান করেও কোন হদিস করতে পারিনি আজ পর্যন্ত।

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ বিকাশ, তিন-তিনটি হত্যাব্যাপারে minutely observe করলে একটা কথাই মনে হয় না কি কোথায় যেন একটি অদৃশ্য যোগসূত্র ঐ হত্যা-ব্যাপারগুলোর মধ্যে বর্তমান আছে! কিরীটী জবাব দিয়েছিল।

তুমি যেন বেশ একটু interested বলেই মনে হচ্ছে রায় ঐ ব্যাপারে! বিকাশ জবাব দেন।

সত্যি কথা বলতে কি সেন, সেইজন্যই আমার আসা।

হ্যাঁ,তা বেশ তো, দেখ না, যদি কোন কিনারা করতে পার ব্যাপারটার। আমরা পুলিশ বাধ্য হয়ে হাত ধুয়েই বসে আছি ও ব্যাপারে।

বলা বাহুল্য সেই রহস্যপূর্ণ ব্যাপারটার একটা ভাল করে অনুসন্ধান করবার মতলবেই তারপর থেকে কিরীটী ঐ অঞ্চলে একটা থাকবার আস্তানা খুঁজছিল। কারণ তার ধারণাই হয়েছিল ঐ হত্যা-ব্যাপারগুলোর পশ্চাতে বিশেষ কোন একটা রহস্য

আছে। এবং ঐ রহস্যের কিনারা করতে হলে সর্বাগ্রে অকুস্থানের আশেপাশে বা নিকটে কোথাও তাকে কিছুদিন ডেরা বেঁধে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

ট্রাম চলেছে মন্থর গতিতে।

কিরীটীর আত্মচিন্তায় বাধা পড়ল হঠাৎ সত্যশরণের কথায়।

তোমাকে একটা কথা পূর্বেই খুলে বলে রাখা ভাল কিরীটী। সত্যশরণ যেন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে কথাটা বলতে গিয়েও।

কি বল তো?

বলছিলাম কি ঘরটা পাওয়া যাবে ঠিকই। বাড়ীওয়ালাও ভাড়াটে পেলেই ভাড়াও দেবেন। কিন্তু—

কিন্তু কি? বল না ভাই কি বলতে চাও?

বলছিলাম ঐ ঘরটা সম্পর্কেই। ঘরে যিনি পূর্বে ছিলেন, মানে আমাদের অনিলবাবু, আজ থেকে ঠিক একমাস আগে হঠাৎ একদিন ভোরে তাঁকে মেসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, তারপর খুঁজতে খুঁজতে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় শ্যামবাজার ট্রামডিপোর ঠিক সামনে বড় লাল দোতলা বাড়িটার গাড়ি-বারান্দার নিচে। সংবাদপত্রেও অবশ্য ব্যাপারটা প্রকাশিত হয়েছিল—পড়েছিলে কিনা জানি না।

সত্যশরণের কথায় কিরীটী চমকে ওঠে।

ঐ অঞ্চলের শেষ হত্যাকাণ্ডটির কথা মনের পাতায় সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে। অদ্ভুত যোগাযোগ তো! মনের কৌতূহল দমন করে কিরীটী শান্ত কণ্ঠে বলে, তাতে আর হয়েছে কি!

না, তাই বলছিলাম আর কি। হাজার হলেও বন্ধুমানুষ তুমি, সব কথা তোমাকে আগে থাকতে খুলে বলাই ভাল। আর ঠিক তার পাশের ঘরেই আমি থাকি কিনা।

বটে! তা ভদ্রলোক মানে সেই অনিলবাবুর সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ-পরিচয় ছিল সত্য? কিরীটী এবারে পাল্টা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, তা একটু-আধটু ছিল বৈকি। পুলিস অবশ্য সেজন্য আমাকে প্রশ্ন করে কম হয়রানি করেনি!

অনিলবাবু তোমাদের ওখানে কতদিন ছিলেন?

তা প্রায় মাস দশেক তো হবেই। তাই তো বলছিলাম, শান্তশিষ্ট নিরীহ ভদ্রলোক, তিনি যে হঠাৎ ঐ ভাবে মারা যাবেন ভাবতেই পারিনি।

জীবন-মৃত্যুর কথা তো বলা যায় না সত্যশরণ। তাছাড়া কার জীবনে কখন কোন্ পথে যে কোন্ আকস্মিক ঘটনার আবির্ভাব ঘটে কেউ তো তা বলতে পারে না।

তা যা বলেছ ভাই!

তা ছাড়া হয়ত এমনও হতে পারে, তোমরা তার সম্পর্কে যতটুকু জানতে তার বাইরে এমন কোন ব্যাপার হয়ত তার জীবনে ছিল যেখানে তার ঐ আকস্মিক মৃত্যুর কোন যোগসূত্র ছিল।

কিরীটীর কথায় সত্যশরণ যেন হঠাৎ চমকে ওঠে, বলে, আশ্চর্য! তুমি—তুমি সেকথা জানলে কি করে কিরীটী?

কিরীটীও কম বিস্মিত হয়নি সত্যশরণ ঐ ভাবে হঠাৎ তার কথায় চমকে ওঠায়। নিছক কথার পিঠে কথা হিসাবেই কথাটা কিরীটী বলেছিল।

তাই পরক্ষণেই মৃদুকণ্ঠে বলে, এর মধ্যে আর জানাজানির কি আছে! এ তো অনুমান মাত্র। আর এমন কিছু অসম্ভবও নয়।

আমি অবশ্য পুলিসের কাছে বলিনি কিছুই। কারণ পুলিসের ব্যাপার তো জানই। তিলকে তাল করতে তারা সিদ্ধহস্ত। ওদের যত এড়িয়ে চলা যায় ততই বুদ্ধিমানের কাজ।

সত্যশরণের কথায় কিরীটী বেশ যেন একটু চাঞ্চল্য অনুভব করে এবং আরো একটু ঘেঁষে বসে প্রশ্ন করে, সত্যিই কোন interesting ব্যাপার কিছু ছিল নাকি তোমাদের সেই অনিলবাবুর জীবনে?

তেমন কিছু না অবশ্য। সত্যশরণ এবারে আমতা আমতা করে জবাব দেয়।

কিরীটী বুঝতে পারে, সত্যশরণ ঝোঁকের মুখে হঠাৎ কথাটা শুরু করে এখন কোন কারণে এড়িয়ে যেতে চাইছে তাকে।

কিরীটী তাই এবারে বন্ধুকে যেন একটু উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেই কণ্ঠে আরো ঘনিষ্ঠতার সুর ঢেলে বলে, আহা, বলই না! শোনাই যাক না! প্রেম-টেম ঘটিত কিছু নাকি?

আশ্চর্য, সত্যি তাই! But how the devil you could guess!

আন্দাজে অন্ধকারে ঢিলটা নিক্ষেপ করলেও লক্ষ্যভেদ করেছে। কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দেয়, আরে এ আর এমন কি কঠিন ব্যাপার? Young man—ওইটাই তো স্বাভাবিক!

সত্যিই তাই। অনিলবাবুর জীবনে সাত বছরের এক মধুর প্রেমকাহিনী ছিল।

বটে!

বিনতা দেবীর সঙ্গে ছিল অনিলবাবুর ভালবাসা। অবস্থার উন্নতি না করা পর্যন্ত বিবাহ হবে না, তাই চলেছিল ওঁদের উভয়ের অপেক্ষার পালা। অনিলবাবু প্রায়ই বলতেন আমাকে, ছোট একটি নিজস্ব নিরালা গৃহকোণ, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ও শান্ত নিরুপদ্রব জীবন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর গত ফাল্গুনে তাদের বিবাহের সব স্থিরও একপ্রকার হয়ে গিয়েছিল, সামনের বৈশাখেই শুভকাজটা সম্পন্ন করবেন তাঁরা। এবং অনিলবাবুর আকস্মিক রহস্যজনক মৃত্যুর দিন দুই আগেই ঐ আসন্ন উৎসবের কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনাও হয়েছিল।

অনিলবাবুর সেই পরিচিতা বিনতা দেবীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি?

না। ফটোই দেখেছি কেবল, সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি।

উভয়ের আসা-যাওয়া ছিল না?

ছিল। তবে একতরফা অনিলবাবুই যেতেন দেখতাম মধ্যে মধ্যে বিনতা দেবীর ওখানে। বিনতা দেবীকে কখনো আসতে দেখিনি এখানে।

অনিলবাবুর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েও আসেনি?

না। তবে তাঁর দাদা এসেছিলেন ভাগলপুর থেকে। মেসে অনিলবাবুর জিনিসপত্র যা ছিল নিয়ে যেতে।

বিনতা দেবী কলকাতাতেই কোন স্কুলে বুঝি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেন?

না। শুনেছি বাগনান গার্লস স্কুলের শিক্ষায়িত্রী তিনি।

ইতিমধ্যে গাড়ি শ্যামবাজারের কাছাকাছি এসে পড়ায় তখনকার মত আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। পরবর্তী স্টপেজে উভয়ে ট্রামগাড়ি থেকে অবতরণ করে।

অবশ্য ন্যায়রত্ন লেনে সত্যশরণের বর্ণিত নির্দিষ্ট বাসাটা ঠিক বাসা নয়, সেমি মেস-বাড়ি, পূর্বেই সে কথা সত্যশরণ কিরীটীকে জানিয়েছিল।

বাড়িটা দোতলা, ওপরে ও নীচে চার ও তিন সর্বসমেত সাতটি ঘর। এবং বাড়িটা নাতিপ্রশস্ত গলির একপ্রকার শেষপ্রান্তে।

ওপরের তলার চারটি ঘরই মাঝারি আকারের। ছোটও নয় খুব, প্রশস্তও নয়। এবং চারটি ঘরের মধ্যে সর্বশেষ ঘরের আগের দক্ষিণখোলা ঘরটিই খালি ছিল। ঘরটা কিরীটীর পছন্দ হওয়ায় গৃহকর্তার সঙ্গে সত্যশরণই কিরীটীর হয়ে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করে দিল এবং কিরীটী যথারীতি পরের দিনই দ্বিপ্রহরে এসে ঘরটি অধিকার করল।

ঘরটি তার পছন্দ হয়েছে এবং বলতে গেলে পূর্বের ভাড়ার চাইতে কয়টি টাকা কম ভাড়াতেই পাওয়া গিয়েছে সত্যশরণের সুপারিশে।

কিরীটীর ঘরে কিরীটী একা। বাকী তিনটি ঘরে সত্যশরণকে নিয়ে মোট ছয়জন বোর্ডার আছেন। সত্যশরণকে বাদ দিয়ে বাকী পাঁচজনের মধ্যে দুইজন হরবিলাস ও শ্যামবাবু উভয়েই প্রৌঢ় এবং সর্বাপেক্ষা পুরাতন বাসিন্দা এ বাড়ির। এবং বলতে গেলে তাঁরাই বাকী বোর্ডারদের জুটিয়ে দোতলাটাকে সেমি মেসে পরিণত করেছেন। দু'জনেই মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন এবং প্রতি শনিবার অফিস থেকে আর বাসায় না ফিরে সোজা একেবারে দেশের বাড়িতে চলে যান। শনি ও রবিবারটা সেখানে কাটিয়ে সোমবার ভোরের গাড়িতে ফিরে আর মেসে না গিয়ে সোজা একেবারে অফিস করতে চলে যান। এমনি করেই প্রতি শনি ও রবিবারটা দেশের বাড়িতে কাটিয়ে সোমবার ভোরের গাড়িতে ফিরে অফিস করেন ছাপোষা নিরীহ কেরানীর মত। এবং একেবারে ঘোরতর সংসারী ওঁরা দুইজন এক ঘরেই থাকেন।

আর তিনজনই অল্পবয়সী। জীবনবাবু একটা সিনেমার গেটকীপার। মাসে ত্রিশটি টাকা পান ও এক জায়গায় টিউশনি করেন। সুধাংশুবাবু কোন একটি বিলাতী ঔষধের কোম্পানীর নন-মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ এবং রজতবাবু একটি নামকরা বিলাতী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ভ্রাম্যমাণ দালাল। সত্যশরণ বাসাটা সেমি মেস বলেছিল, কারণ ওখানে কেবল থাকবারই ব্যবস্থা আছে। আহারের কোন ব্যবস্থাই নেই। দু'টি ভৃত্য আছে, বলাই ও রতন, বাবুদের প্রয়োজনমত দিনের বা রাত্রের আহার্য সামনের ট্রামরাস্তার ঠিক ওপরেই অন্নপূর্ণা হোটেল থেকে নিয়ে আসা থেকে চা জলখাবার ও

অন্যান্য যাবতীয় সর্বপ্রকার ফুট-ফরমাসই খেটে থাকে। বেশীর ভাগ সময় দু' বেলা বোর্ডাররা অবশ্য যে যার হোটেলে গিয়েই আহারপর্বটা সেরে আসেন প্রত্যহ।

অন্নপূর্ণা হোটেলটির ব্যবস্থাও ভালই। দামেও সস্তা এবং সাধারণ ডাল ভাত তরকারি মাছের ঝোল এবং মধ্যে মধ্যে মাংসও পাওয়া যায়।

অন্নপূর্ণা হোটেলটি অনেক দিনকার। এবং তার সামনের অংশে ছোটখাটো একটা পার্টিশন তুলে ও গোটা দু'তিন ভাঙা নড়বড়ে টেবিল ও চেয়ার বেঞ্চ পেতে রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থাও একটা আছে। অন্নপূর্ণা হোটেল রেস্তোরাঁ।

অন্নপূর্ণা হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিক একজন ঢাকার লোক।

ভদ্রলোকের নাম ভূপতিচরণ চাটুয্যে। সরু প্যাঁকাটির মত রোগা ডিগ্‌ডিগে এবং কালো কালির মত গায়ের রং।

দাড়িগোঁফ কামানো, তেল-চক্‌চকে ভাঙা তোবড়ানো একখানা মুখ। পানের রস ও দোক্তার মেছেতা পড়া ইঁদুরের মত ছোট-ছোট দু'পাটি দাঁত। গরুর মত দিবারাত্রই প্রায় সর্বদা মুখে পানের জাবর কাটছেন।

লোকটি কিন্তু ভারি অমায়িক ও মিশুকে প্রকৃতির। খদ্দেরের সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধা বেশ বোঝেন। হৃদয় আছে লোকটার। এবং সেইজন্যই পাড়াতে হোটেল বনাম রেস্তোরাঁটি চলেও বেশ ভালই।

সত্যশরণদের মেসবাড়ি অর্থাৎ দোতলায় ওঠবার সিঁড়িটার কাছেই নীচের বাঁধানো উঠানের মধ্যে পার্টিশন তুলে উপরের তলার অধিবাসীদের কল-পায়খানার ব্যবস্থা হয়েছে। মোট কথা ওপরের তলার বাসিন্দাদের সঙ্গে নীচের তলার অর্থাৎ বাড়িওয়ালা ও তাঁর পরিবারবর্গের কোন সম্পর্কই নেই, যদিও ওপরের ঘরের জানালা ও বারান্দা থেকে নীচের তলার পার্টিশনের অপর পার্শ্বের বাঁধানো উঠানের প্রায় সবটাই এবং ঘরের সামনেকার বারান্দার কিছুটা অংশ চোখে পড়ে।

নীচের তলায় থাকেন সবটাই নিয়ে বাড়ির মালিক কবিরাজ শ্রীশশিশেখর ভিষগ্‌রত্ন সপরিবারে। শান্ত নির্বিরোধী ভদ্রলোক শশিশেখর ভিষগ্‌রত্ন।

কালো আলকাতরার মত গাত্রবর্ণ। মেদবহুল থলথলে চেহারা। পিঠ ও বুকভর্তি ঘন কুঞ্চিত রোমপ্রাচুর্যে মনে হয় যেন একটি অতিকায় রোমশ ভাল্লুক। বিশেষ করে যখন তিনি বাইরের ঘরের তক্তপোশের ওপরে বিস্তৃত মলিন ফরাসের ওপরে বসে থাকেন একটি থেলো হুঁকো হাতে নিয়ে।

দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মাথায় তৈলসিক্ত বাবরি চুল। কপালে আঁকা সর্বদাই একটি রক্তসিন্দুরের ত্রিপুণ্ড্রক। মূলোর মত সাদা ঝকঝকে দন্তপাটি হাসতে গেলেই শুধু যে বিকশিত হয়ে পড়ে তাই নয়, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবনে অভ্যস্ত কালচে বর্ণের মাড়িটিও যেন খিঁচিয়ে ওঠে। তাতেই হাসিটা বিশ্রী কুৎসিত দেখায় আরো। কুৎসিত সেই হাসি শশিশেখরের পুরু কালচে ওষ্ঠপ্রান্তে যেন লেগেই আছে। কথায় কথায়ই তিনি হাসেন সেই কুৎসিত হাসি। তবে সশব্দ নয়, নিঃশব্দ। এবং কথা বলেন অত্যন্ত কম। স্বল্পভাষী। শশিশেখরকে কেউ বড় একটা কথা বলতেই

দেখে না। ভদ্রলোকের সংসারে স্ত্রী—যাকে কখনো বড় একটা দেখাই যায় না এবং গলাও যার বড় একটা শোনাই যায় না, মুখের উপরে সর্বদাই দীর্ঘ একটি অবগুণ্ঠন টানা। বাড়ির বাইরেও বড় একটা তাকে দেখা যায় না।

এবং একটি ছেলে অনিলশেখর, বয়স বাইশ-তেইশ হবে।

আর একটি মেয়ে অমলা, বয়স বছর উনিশ-কুড়ির বেশী হবে না।

কি চেহারায় বা গাত্রবর্ণে কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে তার ছেলে ও মেয়ে অনিলশেখর বা অমলার যেন কোন সৌসাদৃশ্যই নেই।

অনিলশেখর ও অমলার রূপ যেন ঝলমল করে। যেমনই সুঠাম সুন্দর চেহারা তেমনই উজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ।

সংসারে আরো একটি প্রাণী আছে। কবিরাজ মশাইয়ের দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নে দ্বিজপদ।

ছেলেটির বয়স তেইশ-চব্বিশের মধ্যেই। দ্বিজপদই কবিরাজ মশাইয়ের কম্পাউণ্ডার বা অ্যাসিস্টেন্ট। নীচের তলার তিনখানি ঘরের মধ্যে বাইরের প্রশস্ত ঘরটিতেই কবিরাজ মশাইয়ের রোগী দেখা হতে শুরু করে ডিসপেনসারীর, ঔষধের কারখানা এবং দ্বিজপদর থাকা-শোয়ার সব কিছু ব্যবস্থা।

ঘরের $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৩}$ অংশের মধ্যে একটি কাঠের ফ্রেমে চটের পার্টিশন বসানো।

পার্টিশনের একদিকে খানচারেক পুরানো সেকেলে সেগুন কাঠের তৈরি ভারী বার্নিশ ওঠা আলমারি। তার মধ্যে তাকের উপরে সাজানো ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের শিশি, বোতল, বয়ম, জার—নানাবিধ কবিরাজী তৈল, ভস্ম, গুলি, বটিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধে ভর্তি।

সামনাসামনি বড় বড় দুটি তক্তপোশ, পাশাপাশি জোড়া দিয়ে উপরে একটি তৈল-চিটচিটে মলিন ফরাস বিছানো এবং তদুপরি অনুরূপ চারটি তাকিয়া।

শশিশেখর ভিষগ্‌রত্ন ঐ চৌকির ওপরে উপবিষ্ট অবস্থাতেই রোগীদের দেখা ও তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালান। একপাশে একটি বেঞ্চ পেতে রঙিন পুরাতন একটি শাড়ি দড়ির সাহায্যে টাঙিয়ে আড়াল তুলে স্ত্রীরোগীদের দেখবারও ব্যবস্থা আছে।

বাড়িটার উপরের তলাটা ভাড়া দিয়ে, কবিরাজী ব্যবস্যা করে, নিজস্ব তৈরি পেটেন্ট দ্রাক্ষারিষ্ট, মহাবলচূর্ণ, অক্ষয় অমৃত সঞ্জীবনী সুধা, পারিজাত মোদক, মুক্তাভস্ম, মহাশান্তি বৃহৎ বনরাজী তৈল, ব্যাঘ্রাবল রসবটিকা, নয়নরঞ্জন সুর্মা ইত্যাদি সব বিক্রয় করে কবিরাজ মশায়ের যে বেশ দু' পয়সা উপার্জন হয় সেটা তাঁর সচ্ছল অবস্থা দেখলেই অনুমান করতে একটুও কষ্ট হয় না। প্রতিমাসে ২রা তারিখে একটিবার করে সকালে কবিরাজ মশাইয়ের কাষ্ঠপাদুকার খট্‌খট্ শব্দ উপরে ওঠবার সিঁড়ির মুখে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

বোর্ডারদের সামনে এসে একের পর এক দাঁড়ান দন্ত ও মাড়িযোগে নিঃশব্দ কুৎসিত তাঁর সেই পেটেন্ট হাসিটি নিয়ে।

দেহরোম ও মেদবাহুল্যের জন্যই বোধ হয় কবিরাজ মশাইয়ের গ্রীষ্মবোধটা একটু বেশিই। শীত গ্রীষ্মে কোন প্রভেদ নেই। কবিরাজ মশাই তন্ত্রমতে কালীসাধক।

কপালের রক্তসিন্দুরের ত্রিপুণ্ড্রকটিই তার পরিচয়।

মাথার ঘন বাবরি চুল হতে উগ্র কটু একটা কবিরাজী তেলের গন্ধ কবিরাজ মশাই সামনে এসে দাঁড়ালেই যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

গা পাক দিয়ে ওঠে, বমনোদ্রেক আনে।

কবিরাজ মশাই বলেন, তেলটি তাঁরই নিজস্ব আবিষ্কার। মহাশক্তি-দায়িনী বৃহৎ বনরাজী তৈল। মস্তিষ্ক শান্ত ও শীতল রাখার অব্যর্থ মহৌষধি।

উপরে এসে একটিমাত্র কথাই বলেন কবিরাজ মশাই, গরীব ব্রাহ্মণকে দয়া করুন।

ভাড়াটে ও বাড়িওয়ালা পরস্পরের মধ্যে মাসান্তে একটিবার মাত্র ও ঐ একটি কথারই আদান-প্রদান ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই।

ঘরভাড়া অবশ্য যে যার সকলেই চুকিয়ে দেন চাওয়া মাত্রই।

বলতে গেলে উপরের তলার অধিবাসীরা প্রতি মাসের দুই তারিখের ঐ সময়টির জন্য যেন পূর্ব হতে প্রস্তুতই হয়ে থাকেন।

দিন পনের হলো কিরীটী এই বাড়ীতে এসেছে এবং ইতিমধ্যেই সকলের সঙ্গেই অল্পবিস্তর আলাপ-পরিচয়ও হয়ে গিয়েছে। সত্যশরণকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বাদবাকি পাঁচজন সহ-বোর্ডারদের মধ্যে একমাত্র ইনসিওরেন্সের দালাল রজত বাবুই যেন কিরীটীর দৃষ্টি একটু বেশি আকর্ষণ করেছেন।

কিরীটীর ঘরের একপাশে থাকেন রজতবাবু ও অন্যপাশে সত্যশরণ।

রজতবাবুর বয়স যাই হোক না কেন, ৩০-৩১-এর বেশি নয় বলেই মনে হয়। রোগাটে ছিপছিপে গড়ন। উজ্জ্বল শ্যাম গাত্রবর্ণ। চোখেমুখে বুদ্ধির একটা অদ্ভুত ধারালো তীক্ষ্মদীপ্তি। চোখে সরু সোনার ফ্রেমের শৌখিন চশমা। ভদ্রলোকের বেশভূষাতেও সর্বদা একটা শৌখিন পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনসিওরেন্সের দালালীতে যে তাঁর অর্থাগমটা ভালই ভদ্রলোকের চাল-চলন আচার-ব্যবহার ও রুচিবিলাস হতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। হাতও বেশ দরাজ।

কারণ এই বাড়ির সহ-বোর্ডারদের প্রায়ই এটা ওটা পাঁচরকম দামী খাবার এনে খাওয়ান ও নিজেও খান এবং মধ্যে মধ্যে সিনেমা-থিয়েটারেও নিয়ে যান।

ভ্রাম্যমাণ দালাল, সেইজন্য মধ্যে মধ্যে দু'চার-পাঁচদিনের জন্য এবং কখনো-কখনো দশদিনের জন্য কলকাতার বাইরে বাইরে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়।

উপরের তলার অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র রজতবাবুরই নীচে কবিরাজ মশাইয়ের বহিঃ ও অন্দরমহলে যে যাতায়াত আছে, প্রথম দুচারদিনেই কিরীটীর সেটা নজর এড়ায়নি। এবং রজতবাবুর নীচের তলার ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে উপর তলার বোর্ডার সিনেমার গেটকীপার জীবনবাবুর দুচারটে অম্লমধুর রসালো মন্তব্য যে কিরীটীর

সদাসতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়কে এড়িয়ে গিয়েছে তাও নয়। কিরীটী লক্ষ্য করেছিল নীচের তলাকার অধিবাসীদের মধ্যে কবিরাজ মশাইয়ের ছেলে ও মেয়ে অনিলশেখর ও অমলা উভয়ের সঙ্গেই রজতবাবুর কিঞ্চিৎ বেশ যেন আলাপ-পরিচয় আছে। কেবলমাত্র অবগুণ্ঠনের অন্তরালবর্তিনী, নিঃশব্দচারিণী কবিরাজের গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে কিনা সেটা জানাবার সুযোগ হয়নি কিরীটীর। কবিরাজ-গৃহিণীকে তো কখনোও বাইরে বের হতে দেখা যেত না, কারণ শোনা যায় কবিরাজ মশায়ই নাকি সেটা পছন্দ করেন না। তাঁকে নিজেকেও বড় একটা বাইরে বের হতে দেখা যায় না। বেশীর ভাগ সময় সকাল সাতটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত ও দ্বিপ্রহর দুটো থেকে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত ও সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে রাত্রি এগারটা প্রত্যহই এবং কোন কোন রাত্রে বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কবিরাজ মশাই বাইরের ঘরেই থাকেন। এবং তিনি যে আছেন সেটা মধ্যে মধ্যে একটি মাত্র তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত শব্দে জানা যেত ঃ মাগো করালবদনী নৃমুণ্ডমালিনী, সবই তোর ইচ্ছা মা—

প্রায় সদা নিঃশব্দ লোকটির বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ হতে ঐ করালবদনী নৃমুণ্ডমালিনী শব্দ দুটি যেন সমস্ত নীচের তলাটা গম গম করে তুলত।

কবিরাজ ও তস্য গৃহিণীকে বাড়ির বাইরে না দেখা গেলেও দ্বিজপদ, ঝি সুন্দরী ও কবিরাজের ছেলে অনিলশেখর ও মেয়ে অমলাকে প্রায়ই আসতে যেতে দেখা যেত।

তাদের চেহারা চালচলন বেশভূষা কোনটারই যেন কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যেত না কবিরাজের সংস্কৃতির সঙ্গে।

পরিচ্ছন্ন ছিমছাম বেশভূষা উভয়েরই।

অনিলশেখর বি. এ. ক্লাসের চতুর্থ বার্ষিকীর ছাত্র এবং মেয়ে অমলা আই. এ. ক্লাসের ছাত্রী।

একদিন সন্ধ্যার দিকে নিত্যকারের মত সান্ধ্যভ্রমণে বের হয়ে গলির মুখে নিম্নকণ্ঠে ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনারত অমলা ও রজতবাবুকে দেখে কিরীটী বুঝতে পেরেছিল রজতবাবুর নীচের তলায় সত্যকারের আকর্ষণটি কোন্‌খানে।

কিন্তু ন্যায়রত্ন লেনের উপর ও নীচের তলার অধিবাসীদের লক্ষ্য করার চাইতেও যে উদ্দেশ্যে কিরীটী খুঁজে-পেতে কষ্ট করে ঐ অঞ্চলে এসে ডেরা বেঁধেছিল, কিরীটীর চিন্তাধারাটা বেশির ভাগ সময় বিক্ষিপ্ত ভাবে তারই মধ্যে আবদ্ধ থাকত বলাই বাহুল্য।

দিন পনের গত হয়ে গেল কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিশেষ কোন কিছুই ঐ অঞ্চলের কিরীটীর অনুসন্ধিৎসু মনকে নাড়া দিতে পারেনি।

তবু তার সতর্কতার অভাব ছিল না। বাইরে থেকে বেকার শান্তশিষ্ট ও একান্ত নির্লিপ্ত তাকে মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তার তীক্ষ্ম শ্রবণ-মননশক্তি চারিদিকেই সমভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকত।

সকালে ও দ্বিপ্রহরে কিরীটী নিজের ঘর থেকে বড় একটা বেরই হত না। বের হত একেবারে সন্ধ্যা সাতটার পর। এবং রাত বারোটা, কখনো কখনো বা একটা দেড়টা পর্যন্ত আশেপাশে সমস্ত অঞ্চলটার পথে গলিতে সদাসতর্ক দৃষ্টিতে, অথচ বাইরে নির্লিপ্ত পথিকের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

এমনি করেই দিন চলছিল।

সহসা এমন সময় একদিন শান্তস্থির পুষ্করিণীর জলরাশিতে ছোট্ট একটি লোষ্ট্রাঘাতে যেমন তরঙ্গ জাগে এবং ক্রমে সেই চক্রাকারে ক্রমবিস্তৃতমান তরঙ্গ চক্র তটপ্রান্তে আছড়ে পড়ে শব্দ তোলে, ঠিক সেইভাবেই ব্যাপারটা শব্দায়িত হয়ে উঠলো আচমকা।

বিকেল চারটে হবে।

উপরের তলার সেমি-মেসের বোর্ডাররা কেউই তখন অফিস ও কর্মস্থল থেকে ফেরেন নি, একমাত্র রজতবাবু ব্যতীত। অবশ্য কিরীটী তার ঘরে নিত্যকারের মত দরজাটা ভেজিয়ে ঐদিনকার বহুবার পঠিত সংবাদপত্রটাই আবার উল্টে-পাল্টে দেখছিল।

রজতবাবু দিন চারেক ছিলেন না মেসে। ঐদিন সকালের দিকে পাটনা থেকে ফিরেছেন টুর সেরে।

গুনগুন করে সর্বদাই প্রায় যতক্ষণ রজতবাবু তাঁর ঘরে থাকেন, গান করা তাঁর একটা অভ্যাস। এবং কিরীটী পাশের ঘর থেকে তাঁর সেই গুনগুনানি শুনেই বুঝতে পেরেছিল রজতবাবু তাঁর ঘরেই আছেন। আর মাত্র মিনিট কুড়ি আগে যে রজতবাবু নীচে নেমেছিলেন তাঁর জুতোর শব্দেই বুঝতে পেরেছিল কিরীটী।

হঠাৎ নীচের তলা থেকে, বলতে গেলে এখানে আসবার পর এই প্রথম কিরীটী ভিষগ্‌রত্নের নাতি-উচ্চ কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে সত্যিই চমকে ওঠে।

ভদ্রলোক! জেন্টেলম্যান! ঢের ঢের দেখা আছে আমার। ফের এ-বাড়িমুখো হয়েছো কি ঠ্যাং ভেঙে খোঁড়া করে দেবো জন্মের মতো। বেরোও! বেরিয়ে যাও!

কৌতূহলে কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ ও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

কবিরাজের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় রজতবাবুর মেয়েলী ঢংয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপনি বা অত চেঁচাচ্ছেন কেন বলুন তো মশাই ! বিবাহ করবো তো আমি, আর বিবাহটা হবে অমলার সঙ্গে—আপনি তো অবান্তর তৃতীয় পক্ষ।

বাঘের মতই যেন ভিষগ্‌রত্ন এবারে গর্জে উঠলেন, কি, কি বললি বেটা! আমি তার জন্মদাতা বাপ, আমি তৃতীয় পক্ষ! আর তুই কোথাকার এক ভবঘুরে ইনসিওরেন্সের দালাল, তুই হলি প্রথম পক্ষ! বেরো। বেরো এখান থেকে—

বেরিয়ে আমি নিশ্চয়ই যাবো। মনে রাখবেন কেবল স্রেফ ভদ্রতার খাতিরেই কথাটা বলতে এসেছিলাম, নচেৎ মেয়েও আপনার সাবালিকা এখন। এ বিয়ে আপনি চেষ্টা করলেও আটকাতে পারবেন না।

রজতবাবুর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই ভিষ্‌গরত্নের কণ্ঠ আবার শোনা গেল, কালই তুই আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। নইলে তোর মত কুকুরদের কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি। বেটা নচ্ছার পাজী ছুঁচো—

থামুন থামুন--অত চেঁচাবেন না, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো মশাই!

ওঃ অথ বিবাহঘটিত! প্রেম-প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ব্যাপার!

সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনতুন পঞ্চশরের ফুলবাণ পর্ব!

হায় হায় সন্ন্যাসী! কি করেছো তুমি পঞ্চশরের ভস্মরাশি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে জানতে যদি! কিন্তু এ যে বেশ গুরুতর ব্যাপার!

প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে, বিবাহটা শেষ পর্যন্ত যদি ঘটে যায়ই, ভদ্রলোক শৌখিন রজতবাবুর পক্ষে তাঁর রোমশ ভল্লুকাকৃতি কবিরাজ শ্বশুরমশাইটির তো একেবারে বদহজম ঘটাবে!

নাঃ, আজকালকার আধুনিক মতিগতির ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশি যেন দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

আবার রজতবাবুর কণ্ঠস্বর কিরীটীর কানে এলো, শুনুন মশাই, ভালর জন্যই বলছি, বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না এ নিয়ে। অমলাকে আমি বিবাহ করবোই, আপনার পিতৃত্বের পেনাল-কোডের আইন-কানুন ধোপে টিকবে না। মিথ্যে মিথ্যে কেন ঝামেলা করছেন! ভালয় ভালয় রাজী হয়ে যান। ভদ্রভাবে ব্যাপারটা চুকেবুকে যাক, all expense আমার I promise!

কে তোমার Promise চায় হে ছোকরা! দ্বিজপদ, আমার লাঠিটা দাও তো—কবিরাজ মশাই হাঁক দিলেন।

পূজ্যপাদ ভাবী শ্বশুরের লাঠি! ভাবী পত্নীর পূজনীয় পিতৃদেব হলেও এ যুগের আধুনিক হবু জামাইয়ের বোধ হয় আর সাহসে কুলায় না। সবেগে প্রস্থান করলেন। বেচারী রজতবাবু!

এমনিতে বাইরে শৌখিন প্রকৃতির ও নিরীহ শান্তশিষ্ট দেখতে হলে হবে কি, রজতবাবু ভদ্রলোকটিকে তো কিরীটীর মনে হচ্ছে এখন বেশ করিতকর্মাই।

ইতিমধ্যে একসময় কখন এক ফাঁকে দিব্বি সুন্দরী কবিরাজ-নন্দিনীর মনোরঞ্জন করে বসে আছেন এবং স্বয়ং পিতৃদেব হয়েও ভিষগ্‌রত্ন ব্যাপারটির বিন্দু বিসর্গ টের পাননি।

কিরীটী সংবাদপত্রে আর মনোনিবেশ করতে পারে না।

এবং একটু পরেই রজতবাবুর পদশব্দ সিঁড়িতে আবার শোনা গেল।

কিরীটী বুঝতে পারে রজতবাবু তাঁর ঘরে এসে প্রবেশ করলেন এবং আবার সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দে বোঝা গেল বাইরে বের হয়ে গেলেন।

সেই যে রজতবাবু গেলেন, দিন দুই আর ফিরলেন না মেসে।

কিন্তু আশ্চর্য, উক্ত ব্যাপার নিয়ে সেই দিন বা তার পরের দিনও নীচে ভিষগ্‌রত্নের অন্দরমহলে কোনপ্রকার সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না!

এমন কি পরের দিন দ্বিপ্রহরের দিকে কিরীটীকে একটু বের হতে হয়েছিল, ফিরবার পথে গলির মাথায় অমলার সঙ্গে চোখাচোখিও হয়ে গেল। সঙ্গে তার এক সহপাঠিনী বা বান্ধবী বোধ হয় ছিল। পরস্পরের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে কবিরাজ-গৃহের দিকেই আসছিল।

রজতবাবু ফিরে এলেন দিন দুই পরে দ্বিপ্রহরে।

জ্যৈষ্ঠের শেষ। প্রখর রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে আকাশটা যেন একটা তামার টাটের মত পুড়ে ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বাতাসে যেন আগুনের উগ্র একটা বিশ্রী ঝাঁজ।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কিরীটী একটা টেবিলফ্যান চালিয়ে একজোড়া তাস নিয়ে পেসেন্স খেলছিল—বাইরে থেকে রজতবাবুর গলা শোনা গেল।

ভিতরে আসতে পারি কিরীটীবাবু!

আরে কে ও, রজতবাবু যে! আসুন আসুন।

দরজা ঠেলে রজতবাবু এসে কিরীটীর ঘরে প্রবেশ করলেন।

বেশভূষা যেন সামান্য একটু মলিন, মাথার চুল অযত্ন-বিন্যস্ত, মুখখানি কিন্তু বেশ প্রফুল্লই মনে হল।

হঠাৎ রজতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কেন যেন কিরীটীর মনে হয়, মাত্র এই দুই দিনেই ভদ্রলোকের বয়সটা যেন হু হু করে বেড়ে গিয়ে গালে ও কপালে বয়সের রেখা পড়েছে।

বসুন বসুন—তারপর কি খবর রজতবাবু? এ দু দিন ছিলেন কোথায়?

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে রজতবাবু বললেন, একটু কাজে গিয়েছিলাম বর্ধমানে।

কিরীটী উঠে টেবিলফ্যানটা একটু ঘুরিয়ে দিল রজতবাবুর দিকে। বললে, ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে বোধ হয়?

না। দাদামশাইয়ের একটা বাড়ি আছে বর্ধমানে। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ঐখানেই তো ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বাড়িটা তালা দেওয়াই পড়েছিল। কথাগুলো বলে একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, কলকাতায় আর নয় ভাবছি, এবার সেখানে গিয়েই থাকবো।

কাজকর্মের আপনার অসুবিধা হবে না কলকাতা ছেড়ে গেলে?

না মশাই। কলকাতা শহর তো নয় যেন একটা বাজার। ঘেন্না ধরে গিয়েছে আপনাদের এই ধুলো বালি ধোঁয়া আর ছত্রিশ জাতের মানুষের ভিড়ের কলকাতা শহরের ওপরে। মানুষ থাকে এখানে!

কিরীটী আজকে রজতবাবুর কথাগুলো শুনে যেন বেশ একটু অবাক হয়। কারণ কয়েকদিন আগেও রজতবাবুকে কিরীটী বলতে শুনেছে, ছোঃ ছোঃ, আপনাদের গ্রাম্যজীবন আর সুবার্ব মাথায় থাক আমার! বেঁচে থাক আমার এ কলকাতা শহর। কথাটা বলছিলেন রজতবাবু সিনেমার গেটকীপার জীবনবাবুকে। আজকাল মানুষের সেরা তীর্থস্থান হল কলকাতা আর বোম্বাই—এই দুটি শহর, বুঝলেন মশাই!

কিন্তু কিরীটী মুখে জবাব দেয়, তা যা বলেছেন।

হঠাৎ পরক্ষণেই রজতবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আচ্ছা চলি মশাই। দক্ষিণ পাড়ায় একটা জরুরী কাজ আছে, সেরে আসি।

রজতবাবু আর দাঁড়ালেন না। বের হয়ে গেলেন। হঠাৎ যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎই যেন প্রস্থান করলেন।

কেনই বা এলেন আবার হঠাৎ কেনই বা চলে গেলেন কিরীটী যেন ঠিক বুঝতে পারে না।

বর্ধমানে গিয়েছিলেন এই সংবাদটুকু মাত্র কিরীটীকে দেবার এমনই বা কি প্রয়োজন ছিল! না, ভদ্রলোকের আরো কিছু বলবার বা কিছু জানাবার ছিল কিরীটীর কাছে। অন্যমনস্ক ভাবে কিরীটী তাসগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ নির্জনতায় একটা ক্লান্ত রিক্‌শার ঘন্টির ঠুং ঠুং শব্দ নীচে গলির পথে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

বাইরে বারান্দায় রেলিংয়ের ওপরে বসে একটা কাক কর্কশ স্বরে কা কা করে ডাকছে।

ঐদিনই রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা হবে।

নিত্যনৈমিত্তিক রাতের টহল সেরে কিরীটী ন্যায়রত্ন লেনের বাসায় ফিরছিল। নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে পাড়াটা। গলির মুখে গ্যাসের বাতিটাও যেন স্তিমিত মধ্যরাত্রির ক্লান্ত রাতজাগা প্রহরীর মত একচক্ষু মেলে পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে আছে একান্ত নির্লিপ্ত ভাবে।

গলিপথের শেষ পর্যন্ত শেষ গ্যাসের আলোটি পর্যাপ্ত নয়। অস্পষ্ট ধোঁয়াটে একটা আলোছায়ায় যেন রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে গলিপথের শেষপ্রান্তে।

মধ্যগ্রীষ্মে রাতের আকাশের যে অংশটুকু মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে সেখানে শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঝকঝকে তারা।

অন্যমনস্ক ভাবে শ্লথ পায়ে কিরীটী ফিরছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিরীটী। গলিপথের শেষ প্রান্তের প্রায় সমস্তটাই জুড়ে একটা কালো রঙের সিডন বডি গাড়ির পশ্চাৎ দিকের অংশটা যেন সামনের শেষ পথটুকুর সবটাই প্রায় রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আবছা আলো-আঁধারিতে গাড়ির পেছনের প্রজ্বলিত লাল আলোটা যেন শয়তানের রক্তচক্ষুর মত ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে।

এবং পথের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কিরীটীর অন্যমনস্ক নিষ্ক্রিয়তাটা কেটে যায়।

সমস্ত ইন্দ্রিয় তার সজাগ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে মুহূর্তে।

এই পরিচিত অপ্রশস্ত গলির মধ্যে এত রাত্রে অত বড় চক্‌চকে গাড়িতে চেপে কার আবার আবির্ভাব ঘটলো!

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর মনে পড়ে, ইতিপূর্বে আরো দুদিন এই গলিপথেই কোন গাড়ি ঠিক আসতে বা যেতে তার নজরে না পড়লেও—গাড়ির টায়ারের কাদা-মাখা ছাপ তার চোখে পড়েছে।

তবে হয়ত এই গাড়িরই টায়ারের ছাপ ও দেখেছে।

গাড়ির পিছনের নাম্বার-প্লেটটার দিকে ও তাকাল।

W.B.B. 6690

আবছা আলো-অন্ধকারেও গাড়ির কালো সমৃণ বডিটা চক্‌চক্ করছে।

হঠাৎ কিরীটী আবার সতর্ক হয়ে ওঠে গাড়ির দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দে।

তারপরই কানে এলো দুটি কথা।

আচ্ছা, তাহলে ঐ কথাই রইল। একটি চাপা পুরুষ-কণ্ঠ।

দ্বিতীয় কণ্ঠটি কোন নারীর হলেও কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যায়। গাড়িটা ব্যাক করছে।

দ্রুতপদে কিরীটী পিছিয়ে গিয়ে ঐ গলির মধ্যেই বাড়ির মধ্যবর্তী সরু অন্ধকার প্যাসেজটার মধ্যে আত্মগোপন করে দাঁড়াল।

গাড়িটা ধীরে ধীরে ব্যাক করে গলিপথ থেকে বের হয়ে গেল।

দামী গাড়ি, ইঞ্জিনের বিশেষ কোন শব্দই শোনা গেল না।

আরো চার-পাঁচ মিনিট বাদে কিরীটী আবার অগ্রসর হল বাসার দিকে অন্যমনস্কভাবে ভাবতে ভাবতে।

এবং একটু এগিয়ে যেতেই তার নজরে পড়লো নীচের তলায় কবিরাজ মশাইয়ের বাইরের ঘরের খোলা জানলাপথে তখনও আসছে আলোর একটা আভাস।

সদর দরজাটা বন্ধ কিন্তু গলির দিককার জানালা খোলা।

হঠাৎ কৌতূহলকে দমন করতে না পেরে কিছুমাত্র দ্বিধা না করে সতর্ক পদসঞ্চারে শিকারী বিড়ালের মত পা টিপে টিপে আলোকিত বাইরের ঘরের জানালাটার সামনে এগিয়ে গেল কিরীটী।

জানালার নীচের পাট বন্ধ, উপরের পাটটা খোলা।

রাস্তা থেকে জানালা এমন কিছু উঁচু নয়, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকালেই ভিতরের সব কিছু সহজেই নজরে পড়ে।

জানালার কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ত্যারচাভাবে কিরীটী আলোকিত কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করল। রোমশ ভল্লুকের মত উদ্‌লো গায়ে জোড়াসন হয়ে কবিরাজ ভিষগ্‌রত্ন ফরাসের উপরে বসে আছেন।

আর তাঁর অদূরে ঘরের মধ্যেকার পার্টিশনের পর্দাটা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন চিত্রার্পিতের মত অপরূপ লাবণ্যময়ী এক নারী। বয়স কিছুতেই ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হবে না বলেই মনে হয়।

পরিধানে ধব্‌ধবে সাদা কালো চওড়া শান্তিপুরী শাড়ি। মাথার অবগুণ্ঠন খসে কাঁধের উপরে এসে পড়েছে।

গলার চক্‌চকে সোনার হারের কিয়দংশ দেখা যায়। হাতে সোনার চুড়ি। কপালে দুই টানা বঙ্কিম ভ্রূর ঠিক মধ্যস্থলে একটি সিন্দুরের টিপ, কিন্তু ঐ সামান্য বেশভূষাতেও তার রূপ যেন ছাপিয়ে যাচ্ছে।

কোন মানুষ নয়, যেন পটে আঁকা নিখুঁত একখানি চিত্র। মুগ্ধ কিরীটীর দুচোখের দৃষ্টি যেন বোবা স্থির হয়ে থাকে।

হঠাৎ চাপাকণ্ঠে সেই নারীচিত্র যেন কথা বলে উঠলো, যথেষ্ট তো হয়েছে, আর কেন! এবারে ক্ষমা দাও।

নিঃশব্দ কুৎসিত হাসিতে ভল্লুকসদৃশ ভিষগ্‌রত্নের মুখখানা যেন আরো বীভৎস হয়ে উঠলো মুহূর্তে। কেবল একটি কথা সেই নিঃশব্দ কুৎসিত হাসির মধ্যে শোনা গেল, পাগল!

আচ্ছা তুমি কি! শয়তান না মানুষ!

আবার সেই কুৎসিত নিঃশব্দ হাসি ও সেই পূর্বোচ্চারিত একটিমাত্র শব্দ, পাগলী!

ছিঃ ছিঃ, গলায় দড়ি জোটে না তোমার!

দুঃসহ ঘৃণা ও লজ্জায় যেন ছিঃ ছিঃ শব্দ দুটি নারীকণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল।

এবারে আর প্রত্যুত্তরে হাসি নয়।

সেই পরিচিত দুটি কথা।

মাগো! করালবদনী নৃমুণ্ডমালিনী সবই তোর ইচ্ছা মা—

কবিরাজ মশাইয়ের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, যাও। যাও—ভিতরে যাও। পাগলামি করো না, আমার পূজার সময় হল।

এরপর আর ভদ্রমহিলা দাঁড়ালেন না। কেবলমাত্র তীব্র তীক্ষ্ণ একটা কটাক্ষ হেনে মাথায় ঘোমটাটা তুলে দিয়ে নিঃশব্দে অন্দরেই বোধ হয় প্রস্থান করলেন। এবং যাবার সময় তাঁর দুচোখের দৃষ্টিটা যেন মুহূর্তের মধ্যে ধারালো ছুরির ফলার মত ঝিকিয়ে উঠলো বলে কিরীটীর মনে হলো।

ভিষগ্‌রত্ন মহিলাটির গমনপথের দিকে বারেকমাত্র তাকিয়ে আবার সেই নিঃশব্দ কুৎসিত হাসি হাসলেন দন্তপাটি বিকশিত করে। এবং নিম্নকণ্ঠে বললেন, মাগো করালবদনী নৃমুণ্ডমালিনী।

ভদ্রমহিলাটি কে?

ইতিপূর্বে কিরীটী ওকে কখনও দেখেনি।

তবে কি উনিই কবিরাজ মশাইয়ের সেই অন্তঃপুরচারিণী সদা-অবগুণ্ঠনবতী সহধর্মিণী! কিন্তু যদি তাই হয়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুব একটা প্রীতির সম্পর্ক আছে বলে তো মনে হল না কিরীটীর, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্ষণপূর্বের কথাগুলো শুনে।

আর অতবড় চক্‌চকে গাড়ি হাঁকিয়েই বা এই গভীর রাত্রে কে এসেছিল কবিরাজগৃহে।

দিনের বেলায় তো কখনো কাউকে অতবড় গাড়ি হাঁকিয়ে কবিরাজ-ভবনে কিরীটী আসতে দেখেনি আজ পর্যন্ত। হোক আগন্তুক, তাকে গাড়িতে বিদায় দিতে গিয়েছিল নিশ্চয়ই ঐ মহিলাই। কবিরাজ মশাই যাননি।

তিনি ঘরের মধ্যেই ছিলেন।

অনেক রাত পর্যন্ত কিরীটীর মাথায় ঐ চিন্তাগুলোই ঘোরাফেরা করতে থাকে বারংবার। কে ঐ মহিলা! আর কেই বা সেই আগন্তুক নিশীথ রাত্রে গাড়ি হাঁকিয়ে এসেছিলেন কবিরাজ-ভবনে!

কিরীটী এই কয়দিনে পাড়ার দুচারজনের কাছ থেকে ও অন্নপূর্ণা রেস্তোরাঁয় চায়ের কাপ নিয়ে বসে বসে কবিরাজ মশাইয়ের সম্পর্কে যে সংবাদটুকু আজ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পেরেছে তাতে করে এইটাই বোঝা যায় যে ভিষগ্‌রত্ন লোকটি মন্দ নয়।

নির্বিবাদী, শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক; পাড়ায় কারো সঙ্গে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। নিজের কবিরাজী ব্যবসা ও ঔষধপত্র নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।

মিতভাষী কবিরাজ মশাই পাড়ার কারো সঙ্গেই বড় একটা মেশামেশি করেন না। যদিও তাঁর পুত্রকন্যার সঙ্গে অনেকেরই আলাপ-পরিচয় আছে পাড়ার মধ্যে।

কবিরাজ মশাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে নতুন করে আবার কিরীটীর অনিলবাবুর কথা মনে পড়ে।

কিরীটীর ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন।

ঐ মধ্যরাত্রির শান্ত নিস্তব্ধতায় একাকী ঐ ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি যেন কিরীটীর মনকে অক্টোপাশের ক্লেদাক্ত অষ্টবাহুর মত চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরতে থাকে।

মাত্র মাস দেড়েক আগে হঠাৎ করে একদিন প্রত্যুষে তাঁকে এ ঘরে আর দেখা গেল না—এবং পরে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পিছনের রাস্তায়। ভদ্রলোকের প্রেম ছিল একটি তরুণীর সঙ্গে।

বাগনান গার্লস স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী। নাম বিনতা দেবী।

আচ্ছা, ভদ্রমহিলা অনিলবাবুর আজ পর্যন্ত কোন খোঁজখবর নিলেন না কেন?

হঠাৎ মনে হয় কিরীটীর, বাগনানে গিয়ে বিনতা দেবীর সঙ্গে একটিবার দেখা করলে কেমন হয়!

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী ঠিক করে ফেলে, কাল সকালে উঠেই সোজা সে একবার বাগনানে যাবে সর্বপ্রথম।

দেখা করবে সে বিনতা দেবীর সঙ্গে একবার।

সত্যি সত্যি পরের দিন সকালে উঠে কিরীটী সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে গোমো প্যাসেঞ্জারে উঠে বসল বাগনানের একটা টিকিট কেটে। বেলা সাড়ে নয়টা নাগাদ কিরীটী বাগনান স্টেশনে এসে নামল।

গার্লস স্কুলটির নাম 'বিদ্যার্থী মণ্ডল'। এবং স্কুলটা স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে ছোট্ট শহরের মধ্যেই।

ভাঙাচোরা কাঁচা মিউনিসিপ্যালিটির সড়কটি বোধ হয় শহরের প্রবেশের একমাত্র রাস্তা।

লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে বেলা এগারটা নাগাদ কিরীটী স্কুলে গিয়ে পৌঁছাল।

এম. ই. স্কুল।

ছোট একতলা একটা বাড়ি। শতখানেক ছাত্রী হবে।

স্কুলে তখন বসেছে।

অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকল কিরীটী।

চোখে পুরু কাঁচের চশমা সুতা দিয়ে মাথার সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা, মাথায় টাক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা ভাঙা চেয়ারের উপর বসে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে একটা মোটা বাঁধানো খাতায় কি যেন একমনে লিখছিলেন। সামনে আরো খান-দুই ভাঙা চেয়ার ও একটা নড়বড়ে ভাঙা বেঞ্চ।

ও মশাই শুনছেন! কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ডাকে।

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন পুরু লেন্সের ওধার থেকে

ভদ্রলোক একটু বেশ কানে খাটো, কিরীটীর গলার শব্দটাই কেবল বোধ হয় গোচরীভূত হয়েছিল, বললেন, বগলাবাবু চলে গেছেন।

বগলাবাবু! বগলাবাবু আবার কে?

কী বললেন, কাকে?

বলছি শুনছেন—, কিরীটী এবারে কানের কাছে এসে একটু গলা উঁচিয়েই বলে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে স্মিতহাস্যে।

ভদ্রলোকও বোধ হয় এবারে শুনতে পান।

বললেন, কি বলছেন?

বিনতা দেবী বলে কোন শিক্ষয়িত্রী আপনাদের স্কুলে আছেন?

আছেন। কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমার তাঁরই সঙ্গে।

তাহলে বসুন, এখন তিনি ক্লাসে। টিফিনে দেখা হবে।

টিফিন কখন হবে?

ঠিক একটায়। বলেই ভদ্রলোক আবার নিজ কাজে মনোনিবেশ করলেন।

অগত্যা কী আর করা যায়, কিরীটীকে বসতেই হল। একটা চেয়ার টেনে কিরীটী তার উপরে বসে আসবার সময় স্টেশন থেকে কেন ঐদিনকার সংবাদপত্রটা খুলে চোখ বুলাতে লাগল। সবে বেলা এগারটা। এখনো টিফিন হতে দুঘন্টা দেরি!

খবরের কাগজটা খুলে বসলেও তার মধ্যে কিরীটী মন বসাতে পারছিল না।

বিনতা দেবীর কথাই সে ভাবছিল। হঠাৎ তো মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে এখানে চলে এলো!

ভদ্রমহিলা কোন্ টাইপের তাই বা কে জানে!

তাকে কি ভাবে তিনি নেবেন তাও জানা নেই।

ভাল করে তিনি যদি কথাই না বলেন, কোন কথা না শুনেই যদি তাকে বিদায় দেন!

কিন্তু কিরীটী অত সহজে হাল ছাড়বে না। যেমন করে হোক তাঁর কাছ থেকে সব শুনে যেতেই হবে।

কিরীটী বসে বসে ভাবতে থাকে কি ভাবে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা শুরু করবে।

কিন্তু বেলা একটা পর্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে কিরীটীকে অপেক্ষা করতে হল না।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই একটি নারীকণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে কিরীটী মুখ তুলে তাকাতেই তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়স্কা এক তরুণীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

পাতলা দোহারা চেহারা। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। চোখ মুখ চিবুক বেশ ধারালো। মাথায় পর্যাপ্ত কেশ এলো খোঁপা করা। দুহাতে একগাছি করে সরু তারের সোনার বালা। পরিধানে সরু কালাপাড় একখানি তাঁতের শাড়ি।

কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তরুণী দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে অদূরে লিখনরত উপবিষ্ট বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন, অবিনাশবাবু, আমার মাইনেটা কি আজ পাবো?

অবিনাশবাবু বোধ হয় শুনতে পাননি, বললেন, জমানো—জমানো টাকা আবার কোথা থেকে এলো আপনার?

জমানো টাকা নয়, বলছি মাইনেটা আজ মিলবে?

না, আজও ক্যাশে টাকা নেই। কাল-পরশু নাগাদ পেতে পারেন। হ্যাঁ—ঐ ভদ্রলোকটি আপনাকে খুঁজছিলেন বিনতা দেবী।

আমাকে খুঁজছেন!

বিনতা দেবী যেন কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে কিরীটীর মুখের দিকে ঘুরে তাকালেন।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল এবং নমস্কার করে বললে, আপনি অবিশ্যি আমাকে চেনেন না বিনতা দেবী। আমার নাম কিরীটী রায়। কলকাতা থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

আমার সঙ্গে!

হ্যাঁ। অবশ্য বেশী সময় আপনার আমি নেবো না।

কি বলুন তো?

কথাটা একটু মানে—, কিরীটী একটু ইতস্তত করতে থাকে।

বিনতা দেবী বোধ হয় বুঝতে পারেন। বললেন, চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

পাশের ঘরটি ঠিক বসবার উপযুক্ত নয়। স্কুলের বাড়তি জিনিসপত্র ভাঙ্গাচোরা চেয়ার বোর্ড ইত্যাদিতে ঠাসা ছিল।

একপাশে একটা ছোট বেঞ্চ ছিল, তারই উপরে কিরীটীকে বসতে বলে বিনতা দেবীও তার পাশেই বসলেন নিঃসংকোচেই।

কিরীটী বিনতা দেবীর সপ্রতিভ ব্যবহারে প্রথম আলাপেই বুঝে নিয়েছিল ভদ্রমহিলার বিশেষ কোন সঙ্কোচের বালাই নেই।

বলুন কি বলছিলেন।

কিরীটী কোনরূপ ভণিতা না করেই স্পষ্টাস্পষ্টি সোজাসুজিই তার বক্তব্য শুরু করে, দেখুন আপনাকে আগেই বলেছি বিনতা দেবী, আমি আসছি কলকাতা থেকে এবং অনিলবাবুর আকস্মিক রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে—

অনিল! চমকে কথাটা বলে বিনতা কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

হ্যাঁ। অনিলবাবু আপনার যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন তা আমি জানি।

কিন্তু আপনি—

আমার একমাত্র পরিচয় একটু আগেই তো আপনাকে আমি দিয়েছি। তার বেশী বললেও তো আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। তবে ঐ সঙ্গে সামান্য একটু যোগ করে বলতে পারি মাত্র যে অনিলবাবুর মৃত্যুরহস্যটা জানবার আমি চেষ্টা করছি।

বিনতা অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। প্রায় মিনিট দুয়েক। তারপর মুখ তুলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা সেজন্য আমার কাছে আপনি এসেছেন কেন? আপনি কি পুলিসের কোন লোক?

না না—পুলিসের লোক ঠিক আমি নই। তবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার।

কিন্তু সেজন্য আমার কাছে না এসে পুলিসের সাহায্য নিলেই তো আপনি পারতেন।

কথাটা ঠিক তা নয়।

তবে?

পুলিস অনেক সময় অনেক কিছুই জানতে পারে না। ঐ ধরনের হত্যারহস্যের সঙ্গে এমন অনেক কিছুই হয়ত রহস্য থাকে যা জানতে পারলে পুলিসের পক্ষেও অনেক জটিলতার সমস্যা হয়তো সহজেই মিলতে পারত। বুঝতে পারছেন বোধ হয় আমি ঠিক কি বলতে চাইছি আপনাকে।

বিনতা দেবী চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

কিরীটী আবার ডাকে, বিনতা দেবী?

বলুন।

আপনি তাঁর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাই আপনার কাছে এসেছি যদি তাঁর সম্পর্কে এমন কোন বিশেষ খবর—

কি জানতে চান আপনি কিরীটীবাবু?

আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করবো, তার জবাব পেলেই আমি সন্তুষ্ট হবো।

কিন্তু—, বিনতা দেবী ইতস্ততঃ করতে থাকেন।

আপনি কি তাঁকে—কিছু মনে করবেন না, ভালবাসতেন না?

প্রত্যুত্তরে বিনতা দেবী কোন জবাব দেন না।

কেবল কিরীটী দেখতে পায় তার চোখের কোল দুটি যেন হঠাৎ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

তাই বলছিলাম, আপনি কি চান বিনতা দেবী, তার মৃত্যুর রহস্যটা উদঘাটিত হোক?

চাই।

তবে বলুন, অনিলবাবুর মৃত্যুর কয়দিন আগে শেষবার কবে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল?

তার মৃত্যুর আগের দিন রবিবার কলকাতায় আমি গিয়েছিলাম। সেই সময়েই শেষবার আমাদের দেখা হয়েছিল।

আচ্ছা তাঁর মৃত্যুর আগে ইদানীং এমন কোন কথা কি তাঁর মুখে আপনি শুনেছেন বা তিনি আপনাকে বলেছেন বা তাঁর ঐ সময়কার ব্যবহারে এমন কোন কিছু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যেটা আপনার অন্যরকম কিছু মনে হয়েছিল! বুঝতে পারছেন নিশ্চয় আশা করি কি আমি বলতে চাইছি?

একটু চুপ করে থেকে বিনতা বললেন, না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না। তবে—

তবে? কিরীটী একটু যেন কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

তবে শেষবার দেখা হওয়ার আগে এক শনিবার সে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কথায় কথায় বলেছিল, ন্যায়রত্ন লেনের বাসা নাকি—

কি! কি বলেছিলেন অনিলবাবু?

বলেছিল ন্যায়রত্ন লেনের বাসা নাকি সে ছেড়ে দেবে।

একথা কেন বলেছিলেন?

তা তো জানি না। তবে বলেছিল বাসাটা নাকি ভাল না।

অন্য কোন কারণ বলেননি বাসাটা ছেড়ে দেবার?

না।

আচ্ছা বাড়িওয়ালা কবিরাজ মশাই সম্পর্কে বা তাঁর ফ্যামিলির অন্য কারো সম্পর্কে কোন কথা কি তিনি আপনাকে বলেছিলেন কখনো কোন দিন কোন কথাপ্রসঙ্গে?

না, তবে—

তবে কি?

তবে কবিরাজ মশাইয়ের পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল শুনেছিলাম তারই মুখে একদিন কথায় কথায়।

ও। আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অনিলবাবু কতদিন ঐ ন্যায়রত্ন লেনের বাড়িতে ছিলেন ঘর নিয়ে?

তা মাস আষ্টেক হবে।

তার আগে কোথায় ছিলেন?

এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাসায় যাদবপুরে।

আর একটা কথা বিনতা দেবী, অনিলবাবুর ইদানীং আয় কি একটু বেড়েছিল?

কিরীটীর প্রশ্নে বিনতা ওর মুখের দিকে বারেকের জন্য চোখ তুলে তাকালেন এবং তাঁর ভাবে বোধ হল যেন একটু ইতস্তত করছেন। কিরীটী তাঁর ইতস্তত ভাবটা বুঝতে পেরে বলে, ভয় নেই আপনার বিনতা দেবী, নির্ভয়ে আমার কাছে সব কথা বলতে পারেন।

মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন এবারে বিনতা দেবী, হ্যাঁ। অন্তত মুখে সে না বললেও হাবে-ভাবে-আচরণে সেটা আমার কাছে চাপা থাকেনি, তাছাড়া—, কথার শেষাংশে পৌঁছে বিনতা যেন আবার একটু ইতস্তত করতে থাকেন।

তাছাড়া কি বিনতা দেবী?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিনতার মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী শেষের কথাগুলো উচ্চারণ করল।

তাছাড়া অবস্থার সে উন্নতি করতে পারছিল না বলেই আমাদের বিবাহের ব্যাপারটা সে পিছিয়ে দিচ্ছিল বার বার এবং নিজে থেকেই উপযাচক হয়ে যেদিন সে আমার কাছে এসে আমাদের বিবাহের কথা তোলে সেদিন একটু অবাক হয়েই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সত্যিই কি এতদিনে তাহলে সে অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছে?

তাতে তিনি কি জবাব দিলেন?

বিনতা প্রশ্নের জবাবে এবারে চুপ করে থাকেন।

হুঁ। তা আপনি আর কিছু জিজ্ঞসা করেননি? কেমন করে অবস্থার উন্নতি হলো?

না।

কেন?

কারণ আমি আশা করেছিলাম সব কথা সে নিজেই খুলে বলবে। তা যখন বললো না, আমিও আর কিছু ও সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি।

নিজে থেকেও নিশ্চয়ই আর কিছু তিনি বলেননি?

না।

সামান্য আলাপ-পরিচয়েই কিরীটী বুঝতে পারে যথেষ্ট বুদ্ধি রাখেন ভদ্রমহিলা। এবং ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরবর্তী কথাপ্রসঙ্গে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, অনিলবাবুর ইদানীংকার ব্যবহারটা একটু কেমন যেন রহস্যজনক হয়ে উঠেছিল। অর্থ জন প্রতিপত্তির লিপ্সা মানুষ মাত্রেরই থাকে। তবে অনিলবাবুর যেন একটু বেশীই ছিল। কতদিন বিনতা বলেছেন, বেশী দিয়ে আমাদের কি হবে! তার জবাবে নাকি অনিলবাবু বলেছেন, সাধারণ ভাবে জীবনযাপন তো সকলেই করে। তার মধ্যে thrill কোথায়! এমনভাবে বাঁচতে আমি চাই যাতে দশজনের মধ্যে মাথা উঁচু করে আমি থাকতে পারি, সত্যিকারের সুখ ও প্রাচুর্যের মধ্যেই। অতি সাধারণ ভাবে বাঁচার মধ্যে জীবনের কোন মাধুর্য উপভোগ করবার মত কিছু নেই। সেটা একপক্ষে মৃত্যুরই নামান্তর।

বিনতা দেবী আরো অনেক কথাই কিরীটীকে বললেন, যা থেকে কিরীটীর বুঝতে কষ্ট হয় না, তিনি অনিলবাবুকে সত্যি সত্যিই ভালবাসতেন। সে ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। যদিচ অনিলবাবুর ইদানীংকার ব্যবহারের মধ্যে তার দিক থেকে একটা স্বার্থপরতার ভাব দেখা দিয়েছিল, তথাপি বিনতার ভালবাসায় কোন তারতম্য হয়নি।

বরং মনে মনে একটু আঘাত পেলেও মুখে কখনো সেটা অনিলবাবুকে জানতে দেননি তিনি।

আর অনিলবাবুকে বিনতা সত্যিকারের ভালবাসতেন বলেই তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর স্মৃতি নিয়েই কাটাচ্ছেন।

আড়াইটের ফিরতি ট্রেনটা না ধরতে পারলে ফিরতে রাত হবে তাই কিরীটী অতঃপর বিনতা দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নমস্কার জানিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়ায়।

দুপুরের ট্রেনেই কিরীটী কলকাতা ফিরে এল।

ঐদিনটা শনিবার থাকায় অফিসের ছুটি হয়ে গিয়েছিল। সত্যশরণ তার ঘরেই ছিল।

কিরীটীকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সত্যশরণ কিরীটীর ঘরে এসে ঢুকল। কিরীটী জামার গলার বোতামটা খুলছে তখন।

কিরীটী।

কে, সত্যশরণ, এসো—এসো—

গিয়েছিলে কোথায়?

এই কলকাতার বাইরে একটু কাজ ছিল—

এদিকে পাড়ার ব্যাপার শুনেছো তো সব?

না, কি বল তো?

আজ সকালে যে আবার একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে এই পাড়ায়!

বল কি? কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী সত্যশরণের দিকে ফিরে তাকায়।

জামার বোতাম আর খোলা হয় না।

হ্যাঁ, এবারে অবিশ্যি একেবারে ট্রাম-রাস্তার উপরে—ঐ যে মোড়ে চারতলা ব্যালকনীওয়ালা লাল বাড়িটা আছে, তারই বারান্দার নীচে মৃতদেহ পাওয়া গেছে এবারে।

বল কি? বাঙ্গালী?

হ্যাঁ। এবং পোশাক দেখে মনে হয় বেশ ধনীই লোকটা ছিল। বাঁ হাতের দুই আঙুলে দুটো হীরে-বসানো সোনার আংটি ছিল—

কিরীটী রীতিমত উৎসাহী হয়ে ওঠে।

তারপর?

তারপর আর কি! পুলিস এসে মৃতদেহ রিমুভ করে—

মৃতদেহের গলায় তেমনি সরু কালো দাগ ছিল?

সরু কালো দাগ!

কথাটা সত্যশরণ বুঝতে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ।

তা তো জানি না ঠিক।

ওঃ—

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে কিরীটীও বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল।

সত্যশরণ জিজ্ঞাসা করে, মৃতদেহের গলায় কি সরু কালো দাগের কথা বলছিলে কিরীটী?

কিরীটী অগত্যা যেন কথাটা খোলাখুলি ভাবে না বলে একটু ঘুরিয়ে বলে, সংবাদপত্রে তোমরা লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না, এর আগের বার মৃতদেহের Description প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল মৃতদেহের গলায় একটা সরু কালো দাগের কথা। তা পুলিস কাউকে arrest করেছে নাকি?

না। তবে আশেপাশের বাড়ির লোকদের অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে শুনলাম।

মৃতদেহ প্রথম কার নজরে পড়ে?

তা ঠিক জানি না।

সন্ধ্যার দিকেই কিরীটী থানায় গেল বিকাশের সঙ্গে দেখা করতে।

বিকাশ তখন ঐ এলাকারই একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টের রিপোর্ট নিচ্ছিলেন। কিরীটীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, এই যে কিরীটী, এসো—বসো, এই রিপোর্টটা শেষ করে নিই—কথা আছে।

রিপোর্ট শেষ করে ঘর থেকে সকলকে বিদায় করে দিয়ে বিকাশবাবু বললেন, শুনেছো নাকি তোমাদের পাড়ার সকালের ব্যাপারটা?

সকালের ট্রেনেই কলকাতার বাইরে একটু গিয়েছিলাম। এসে শুনলাম।

আমি তো ভাই আজকের ব্যাপারে একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছি। এই কয় মাসে চার-চারটে মার্ডার একই এলাকায়—বলে একটু থেমে যেন দম নিয়ে আবার বললেন, বড় সাহেবের সঙ্গে আজ তো একচোট হয়েই গিয়েছে। Inefficient, অমুক-তমুক, কত কি ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই করে বললেন অফিসের মধ্যে।

কিরীটী বুঝতে পারে অফিসে বড়কর্তার কাছে মিষ্টি মিষ্টি বেশ দুটো কথা শুনে বিকাশ বেশ একটু চঞ্চল হয়েই উঠেছে। সত্যই তো, একটার পর একটা খুন হয়ে যাচ্ছে অথচ আজ পর্যন্ত তার কোন কিনারা হল না!

কিরীটী হাসতে থাকে।

বিকাশ বলেন, তুমি হাসছ রায়—

ব্যস্ত হয়ে তো কোন লাভ নেই। ব্যাপার যা বুঝছি, বেশ একটু জটিলই। সব কিছু গুছিয়ে আনতে একটু সময় নেবে। কিরীটী আশ্বাস দেয়।

বিকাশ কিরীটীর শেষের কথায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, কিছু বুঝতে পেরেছো নাকি?

না, মানে—

দোহাই তোমার, যদি কিছু বুঝতে পেরে থাকো তো সোজাসুজি বল। আমি ভাই সত্যিই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তাড়াহুড়োর ব্যাপার তো নয় ভাই এটা। খুব ধীরে ধীরে এগুতে হবে।

তারপর আবার জিজ্ঞাসা করে কিরীটী বিকাশকে, হ্যাঁ ভাল কথা—মৃতদেহের identification হয়েছে?

না, কই আর হলো! এখন পর্যন্ত কোন খোঁজই পড়েনি!

মৃতদেহ তো মর্গেই এখনো আছে তাহলে?

হ্যাঁ। কাল পোস্টমর্টেম্ হবে।

মৃতুদেহের আশেপাশে বা মৃতদেহে এমন কিছু নজরে পড়েছে তোমার suspicion হওয়া মত, বা কোন clue?

না, তেমন কিছু নয়—তবে কাল শেষরাত্রে বোধ হয় বৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে সেই বাড়ির ব্যালকনির ধার ঘেঁষে গাড়ির টায়ারের দাগ পাওয়া গিয়েছিল রাস্তায়।

আর কিছু? মানে মৃতদেহের জামার পকেটে কোন কাগজপত্র বা কোন রকমের ডকুমেন্ট বা—

না।

মর্গে গিয়ে একবার মৃতদেহটা দেখে আসা যেতে পারে?

তা আর যাবে না কেন!

আজ এখুনি?

হ্যাঁ।

বিকাশবাবু কি একটু ভেবে বললেন, বেশ চল।

দুজনে থানা থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ময়নাঘরে এলেন।

ময়নাঘরের ইনচার্জ ডোমটা ময়নাঘরের সামনেই একটা খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিল। ইউনিফর্ম পরিহিত বিকাশকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিল।

আজ সকালে শ্যামবাজার থেকে যে লাশটা এসেছে সেটা দেখবো, ভিতরে চল।

কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে ডোমটা দরজা খুলতেই একটা উগ্র ফর্মালীন ও অনেকদিনের মাংসপচা চামসে মিশ্রিত গন্ধ নাসারন্ধ্রে এসে ঝাপটা দিল।

হলঘরটা পার হয়ে দুজনে ডোমের পিছনে পিছনে এসে ঠাণ্ডাঘরে প্রবেশ করল।

একটা স্ট্রেচারের উপরে সাদা চাদরে ঢাকা মৃতদেহটা মেঝেতেই পড়ে ছিল।

ডোমটা চাদরটা সরিয়ে দিল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট মধ্যবয়সী একজন ভদ্রলোক।

মুখটা যেন কালচে মেরে গিয়েছে। নিখুঁতভাবে দাড়ি–গোঁফ কামানো। ডান গালের উপরে একটা মটরের মত কালো আঁচিল।

পরিধানে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি ও সরু কালোপাড় মিহি মিলের ধুতি।

আদ্দির জামার তলা দিয়ে নেটের গেঞ্জি চোখে পড়ে।

কিরীটী নীচু হয়ে দেখলে, গলায় আধ ইঞ্চি পরিমাণ একটা সরু কালো দাগ গলার সবটাই বেড় দিয়ে আছে।

চোখ দুটো যেন ঠেলে কোটর থেকে বের হয়ে আসতে চায়, চোখের তারায় সাব-কনজাংটাইভ্যাল হিমারেজও আছে।

মুখটা একটু হাঁ করা; কষ বেয়ে ক্ষীণ একটা লালা–মিশ্রিত কালচে রক্তের ধারা জমাট বেঁধে আছে।

মৃতদেহ উল্টেপাল্টে দেখল কিরীটী, দেহের কোথাও সামান্য আঘাতের চিহ্নও নেই।

স্পষ্টই বোঝা যায় কোন কিছু গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করেই হত্যা করা হয়েছে।

ডান হাতের উপর উল্কিতে 'A' ইংরাজী অক্ষর লেখা।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল, চল বিকাশ, দেখা হয়েছে।

মর্গ থেকে বের হয়ে কিরীটী আর বিকাশবাবুর সঙ্গে গেল না। বিকাশবাবুর ভবানীপুরের দিকে একটা কাজ ছিল, তিনি ভবানীপুরগামী ট্রামে উঠলেন।

কিরীটী শ্যামবাজারগামী ট্রামে উঠল।

রাত বেশী হয়নি। সবে সাড়ে আটটা।

কলকাতা শহরে গ্রীষ্মরাত্রি সাড়ে আটটা তো সবে সন্ধ্যা!

ট্রাম থেকে নেমে কিরীটী সোজা একেবারে অন্নপূর্ণা হোটেল রেস্তোরাঁয় এসে উঠলো।

এক কাপ চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হবে।

রেস্তোরাঁ তখন চা–পিপাসীদের ভিড়ে বেশ সরগরম।

কিরীটী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একপাশে নিত্যকার মত ছোট একটা টেবিল নিয়ে কাউন্টারের মধ্যে বসে আছেন অন্নপূর্ণা হোটেল ও রেস্তোরাঁর আদি ও অকৃত্রিম একমাত্র মালিক ভূপতিচরণ।

রেস্তোরাঁটায় পাড়ার ছেলেদেরই বেশী ভিড়। নানা আলোচনা চলছিল খদ্দেরদের মধ্যে চা–পান করতে করতে ঐ সময়টায়।

হঠাৎ কানে এলো কিরীটীর, তার ডান পাশের টেবিলে চারজন সমবয়সী ছোকরা চা–পান করতে করতে সকালের ব্যাপারটাই আলোচনা করছে।

কিরীটী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

লালচুলওয়ালা পাঞ্জাবি ও শার্টের কমবিনেশন জামা গায়ে ৩০/৩২ বছরের একটি যুবক তার পাশের যুবকটিকে বলছে, তোদের বাড়ি তো একেবারে সাত নম্বর বাড়ির ঠিক অপজিটে, আর তুই তো শালা রাত্রিচর, তোরও চোখে কিছু পড়েনি বলতে চাস ফট্‌কে?

সম্বোধিত ফটিক নামধারী যুবকটি প্রত্যুত্তরে বলে, একেবারে যে কিছুই দেখিনি মাইরি তা নয়, তবে ধেনোর নেশার চোখে খুব ভাল করে ঠাওর হয়নি।

কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় শিকারী বিড়ালের কানের মত সতর্ক সজাগ হয়ে ওঠে।

ধেনো! বলিস কি ফটকে! তোর তো সাদা ঘোড়া চলে না রে!

ফটিক তার বন্ধু রেবতীর কথায় ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে থাকে। বোঝা যায় কথাটা তার মনে লেগেছে। তারপর বলে, কি করি ভাই! জানিস তো অভাবে স্বভাব নষ্ট। গত মাস থেকে মা আর দুশোর বেশি একটা পয়সা দেয় না। শালা দুশো টাকা মাসের পনের তারিখেই ফুটুস ফুঁ। তাই ঐ ধেনোই ধরতে হয়েছে। কাল রাত্রে নেশাটাও একটু বেশী হয়েছিল—

মুখবন্ধ ছেড়ে ব্যাপারটা বল্ তো! রেবতী বলে ওঠে।

তখন বোধ করি ভাই সাড়ে তিনটে হবে। নেশাটা বেশ চড়চড়ে হয়ে উঠেছে—

ফটিকের শেষের কয়েকটা কথা কিরীটী শুনতে পেল না, কে একজন খরিদ্দার চপের কিমার মধ্যে নাকি কাঠের গুঁড়ো পেয়েছে, চেঁচাচ্ছে, বলি ওহে বংশীবদন! আজকাল কিমার বদলে স্রেফ বাবা কাঠের গুঁড়ো চালাচ্ছ? ধর্মে সইবে না বাবা, ধর্মে সইবে না। উচ্ছন্নে যাবে।

ভূপতিচরণ হোটেলের মালিক হন্তদন্ত হয়ে প্রায় এগিয় এলেন, কি বলছেন স্যার! আন্নপূর্ণা হোটেল রেস্তোরাঁর প্রেস্টিজ নষ্ট করবেন না!

খানিকটা গোলমাল ও হাসাহাসি চলে। হোটেলের সবেধন নীলমণি ওয়েটার বংশীবদন একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে বোকার মত। ফটিক তখন বলছে, এক পসলা তার আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দিব্যি ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে—দেখলাম পূর্বদিক থেকে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল—তারপর সেই গাড়ি থেকে একজন লোককে দেখলাম কি একটা ভারী মত জিনিস ধরে গাড়ি থেকে রাস্তায় নামিয়ে রাখল। তবে শালা গাড়িটা যখন চলে যায় না তখন দেখছি গাড়িটা একটা ট্যাক্সি–

বলিস কি ফটকে! ট্যাক্সি।

হ্যাঁ। আর এ পাড়ারই ট্যাক্সি।

মাইরি!

তবে আর বলছি কি! W.B.T. 307। গঙ্গাপদর সেই কালো রঙের চক্‌চকে প্রকাণ্ড ডিসোটো ট্যাক্সি গাড়িটা—

তারপর?

তারপর আর কিছু জানি না বাবা। কোথায় মাঝরাতে কে কি করছে না করছে জেনে লাভ কি! সোজা গিয়ে বিছানায় লম্বা। ঘুম ভাঙল আজ সকালে প্রায় আটটায়, তখন আমার বোন চিনুর কাছে শুনি আমাদের বাড়ির সামনে নাকি হৈ-হৈ কাণ্ড! সাত নম্বর বাড়ির করিডরের সামনে কাল একটা লাশ পাওয়া গিয়েছে। পুলিস এসেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল গত রাত্রির কথা। তাড়াতাড়ি উঠে আগে শালা জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। তবু কি বেটারা রেহাই দেয়! ধাওয়া করেছিল আমার বাড়ি পর্যন্ত। বললে, সামনের বাড়িতে থাকেন, দেখেছেন নাকি কিছু? স্রেফ বলে দিলাম—মাল টানা অভ্যাস আছে মশাই। অত রাত্রে কি আর জ্ঞানগম্যি থাকে!

কথাটা শেষ করে শ্রীমান ফটিক বেশ রসিয়ে রসিয়ে আবার হাসতে লাগল।

কিরীটীরও মনে পড়ে ন্যায়রত্ন লেনের মোড়ে অনেকদিন ওর নজরে পড়েছে ঝক্‌ঝকে ডিসোটো ট্যাক্সি গাড়িটা। নম্বরটা যার W.B.T. 307।

ড্রাইভিং সীটে মোটা কালোমত যে লোকটাকে বসে বসে প্রায়ই ঝিমুতে দেখা যায়, তার বসন্তের ক্ষতচিহ্নিত গোলালো মুখখানাও কিরীটীর মানসনেত্রে উঁকি দিয়ে গেল ঐ সঙ্গে।

ডিসোটো ট্যাক্সি গাড়ি,—W.B.T. 307.

গাড়ির কথাটা ও নম্বরটা বার বার কিরীটীর মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে।

এই পাড়ায় গত কয়েক মাস ধরে যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আজ পর্যন্ত চার-চারটি রহস্যময় মৃত্যু কেবলমাত্র লাশের মধ্যে প্রমাণ রেখে গিয়েছে, ঐ W.B.T. 307 নম্বরের গাড়ির সঙ্গে কি তার কোন যোগাযোগ আছে?

পরের দিনও সন্ধ্যার পর কিরীটী আবার থানায় গেল।

বিকাশ একটা জরুরী কাজে যেন কোথায় বের হয়েছিলেন, একটু পরেই ফিরে এলেন।

কিরীটীকে বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন, এই যে কিরীটী। কতক্ষণ?

এই কিছুক্ষণ। তারপর ময়না তদন্ত হল?

বিকাশ বসতে বসতে বললেন, হ্যাঁ, ময়না তদন্তও হয়েছে—লোকটার identityও পাওয়া গিয়েছে।

পাওয়া গিয়েছে নাকি?

হ্যাঁ। লোকটার নাম অরবিন্দ দত্ত। এককালে চন্দননগরের ঐ দত্তরা বেশ বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল। এখন অবিশ্যি পড়তি অবস্থা। তিন ভাই—বীজেন্দ্র, মহেন্দ্র, অরবিন্দ। ঐ মানে অরবিন্দই ছোট সবার।

হ্যাঁ, তা লোকটার স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল ইত্যাদি কোন-কিছু খোঁজ-খবর পেলে?

পেয়েছি, আর সেইখান থেকে মানে বীজেন্দ্রবাবুর ওখান থেকেই আসছি। বীজেন্দ্রবাবু আজ বছর দশেক হল আলাদা হয়ে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ হিসাবে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের বাড়িখানা নিয়ে বসবাস করছেন।

তা বীজেন্দ্রবাবুর সংবাদ পেলে কি করে?

সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার!

কি রকম?

সেও এক ইতিহাস হে! বলে বিকাশ বলতে শুরু করেন, বলেছি তো বীজেন্দ্রবাবুরা চন্দননগরের বাসিন্দা। বছর আষ্টেক আগে বীজেন্দ্রবাবুদের এক বিধবা বোন ছিলেন—সুরমা। সেই বোন ও দুই ভাই মহেন্দ্র ও অরবিন্দ কাশী যান। কাশীতে দত্তদের একটা বাড়ি আছে বাঙালীটোলায়। তাঁরা গিয়েছিলেন মাস দুই কাশীতে থাকবেন বলেই। মধ্যে মধ্যে তাঁরা ঐ ভাবে দু'এক মাস কাশীর বাড়ীতে গিয়ে নাকি কাটাতেন। যা হোক সেবারে চার মাস পরে দুই ভাই তাঁদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে যখন ফিরে এলেন সুরমা ফিরল না তাঁদের সঙ্গে। ফিরে এসে ওঁরা রটালেন সুরমা নাকি কাশীতে হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মারা গিয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়—সুরমা মরেনি, গৃহত্যাগ করেছিল এক রাত্রে।

বীজেন্দ্রবাবু বললেন নাকি ও-কথা?

হ্যাঁ, শোন—বললাম তো একটা গল্প! অরবিন্দ মধ্যে মধ্যে কলকাতায় এসে দাদার এখানে উঠতেন। দু'চার দিন থেকে আবার চলে যেতেন। শুকনো জমিদারীর কোনরূপ আয় না থাকলেও অরবিন্দবাবুর অবস্থাটা কিন্তু ইদানীং বছর আষ্টেক মন্দ যাচ্ছিল না। বরং বলতে গেলে বেশ একটু অর্থসচ্ছলতাই ছিল তাঁর। যা হোক যা বলছিলাম, এবারে অরবিন্দবাবু গত শনিবার মানে প্রায় আটদিন আগে কলকাতায় আসেন চন্দননগর থেকে। এবং অন্যান্য বারের মত দাদার ওখানেই ওঠেন। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার হঠাৎ রাত্রি দেড়টায় বাড়ি ফিরে দাদা বীজেন্দ্রবাবুকে ডেকে বলেন, সুরমার খোঁজ তিনি পেয়েছেন। এবং তখনই তিনি তাঁর দাদাকে সুরমা সম্পর্কে আট বছর আগেকার সত্য কাহিনী খুলে বলেন। বীজেন্দ্রবাবু এর আগে আসল রহস্যটা সুরমা সম্পর্কে জানতেন না।

তারপর?

তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত—

কি রকম?

বৃহস্পতিবার রাত্রের পর শেষ দেখা হয় অরবিন্দবাবুর সঙ্গে বীজেন্দ্রবাবুর শুক্রবার সকালে। তারপর আর দেখা হয়নি। এবং রবিবার সকালের ডাকে একখানা খামের চিঠি পান বীজেন্দ্রবাবু।

চিঠি! কার?

সুরমা দেবীর।

কি চিঠি?

এই দেখ সে চিঠি—, বলতে বলতে বিকাশ চিঠিটা বের করে কিরীটীর হাতে দিলেন। খামের উপরে ডাকঘরের ছাপ আছে। শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের ছাপ।

কিরীটী ছেঁড়া খাম থেকে ভাঁজকরা চিঠিটা টেনে বের করল। সংক্ষীপ্ত চিঠি।

শ্রীচরণেষু বড়দা,

ছোটদা মারা গিয়েছেন। তাঁর মৃতদেহ বেওয়ারিশ লাশ হিসাবে পুলিস মর্গে চালান দিয়েছে। সৎকারের ব্যবস্থা করবেন। ইতি—

আপনাদের হতভাগিনী বোন সুরমা

একবার দুবার তিনবার কিরীটী চিঠিটা পড়ল।

সুরমা গৃহত্যাগিনী বোন মৃত অরবিন্দ দত্তের! কিন্তু সে অরবিন্দর মৃত্যুসংবাদ জানলে কি করে?

নিশ্চয়ই অকুস্থানে সুরমা উপস্থিত ছিল, না হয় তার জ্ঞাতেই সব ব্যাপারটা ঘটেছে। অন্যথায় সুরমার পক্ষে ঐ ঘটনা জানা তো কোনমতেই সম্ভবপর নয়। লাশ পাওয়া গিয়েছে শ্যামবাজারেই।

চিঠির ওপরে ডাকঘরের ছাপও শ্যামবাজারের। তবে কি পলাতকা সুরমা শ্যামবাজারেই কোথায়ও আত্মগোপন করে আছে!

কিরীটীর চিন্তাসূত্রে বাধা পড়ল বিকাশের প্রশ্নে, কি ভাবছো কিরীটী?

কিছু না! হুঁ, ময়না-তদন্তের রিপোর্ট কি?

Throttle করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি কিরীটী, বীজেন্দবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর থেকে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আরো গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে—

কিরীটী বলে, কিছু clue তো আমাদের হাতে এসেছে। এইবার তো মনে হচ্ছে আমরা তবু এগুবার পথ পেয়েছি!

কি বলছো তুমি কিরীটী?

আমি তোমাকে আরো একটা clue দিচ্ছি—এই অঞ্চলে একটা ডিসোটা ট্যাক্সি গাড়ি আছে। নম্বরটা তার W. B. T. 307। ট্যাক্সিটার ওপরে একটু নজর রাখ। হয়তো আরো এগিয়ে যেতে পারবে।

বিকাশ যেন বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান, কি বলছো তুমি! ট্যাক্সির ড্রাইভার গঙ্গাপদ যে আমার বেশ চেনা লোক হে! অনেকবার আমার প্রয়োজনে ভাড়ায় খেটেছে। তাছাড়া গঙ্গাপদ লোকটাও spotless, ওর সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন রিপোর্টই তো পাইনি।

কিন্তু সেইটাই বড় কথা নয় বিকাশ। মৃদু হেসে কিরীটী বলে।

কিন্তু—, বিকাশ তবু ইতস্তত করতে থাকেন।

বললাম তো, প্রদীপের নীচেই বেশী অন্ধকার। যাহোক আজ উঠি—আবার দেখা হবে।

কিরীটী আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলো।

কিরীটী বাসায় ফিরে এলো যখন রাত প্রায় নটা।

রজতবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে দেখে কিরীটী দাঁড়ালো দরজাগোড়ায়। রজতবাবু তা হলে ফিরেছেন। পরশু যে সেই দক্ষিণ কলকাতায় কাজ আছে বলে চলে গিয়েছিলেন, এ দু'দিন আর ফেরেননি। রজতবাবুর গলা কানে এলো, বেশ ভালো করে বাঁধ—রাস্তায় যেন আবার খুলে না যায়।

রজতবাবুর ঘরের দরজাটা অর্ধেকটা প্রায় খোলাই ছিল। সেই খোলা দ্বারপথে উঁকি দিয়ে কিরীটী দেখল, রজতবাবু মেসের ভৃত্য রতনের সাহায্যে বাক্স-বিছানা সব বাঁধাছাঁদা করছেন।

ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল কিরীটী, কি ব্যাপার রজতবাবু—বাঁধাছাঁদা করছেন সব?

হ্যাঁ মিঃ রায়, এ বাসা ছেড়ে আমি আজ চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছেন!

তা নয়ত কি? মশাই অপমান সহ্য করেও পড়ে থাকবো?

তা কোথায় যাচ্ছেন?

বালিগঞ্জে—একেবারে লেক অঞ্চলে। দোতলার ওপরে একটা চমৎকার ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছে—ভাড়াটা অবশ্য কিছু বেশী। তা কি করা যাবে, এ হতচ্ছাড়া জায়গায় কোন ভদ্রলোক থাকে? যেমন বাড়ি তেমনি বাড়িওয়ালা! বেটা অভদ্র ইতর—

কবিরাজ মশাইয়ের ওপরে বড্ড চটে গিয়েছেন দেখছি—

চটবো না! অভদ্র ইতর কোথাকার!

মেসের দ্বিতীয় ভৃত্যও এসে ঘরে প্রবেশ করল, ট্যাক্সি এসে গেছে, বাবু!

ট্যাক্সি গলির মধ্যে এনেছিস তো?

হ্যাঁ স্যার—একেবারে দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছি। বলতে বলতে ভৃত্যের পশ্চাতে যে লোকটা ঘরে এসে প্রবেশ করল, কিরীটী কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখের দিকে নিজের অজ্ঞাতেই তাকিয়ে থাকে।

বসন্ত-ক্ষতচিহ্নিত সেই গোলালো মুখ গঙ্গাপদর। W. B. T. 307-এর ড্রাইবার গঙ্গাপদ।

জিনিসপত্র কি কি যাবে? গঙ্গাপদ আবার প্রশ্ন করে।

বিশেষ কিছু নয়। এই যে দেখছো ঐ দুটো সুটকেস, ঐ বেডিংটা, ব্যাস!

অতঃপর ভৃত্যের সঙ্গে ধরাধরি করে গঙ্গাপদই মাল ট্যাক্সিতে নিয়ে গিয়ে তুলল।

রজতবাবুর ঘরটা খালি হয়ে গেল।

রাত দশটার সময় ঐ রাত্রেই সিঁড়িতে কবিরাজ মশায়ের খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে কিরীটী বাইরে এসে দেখলে ভিষগ্‌রত্ন রজতবাবুর খালি ঘরটার দরজায় একটা তালা লাগাচ্ছেন। কিরীটীকে দেখে কবিরাজ মশাই বললেন, শূন্য ঘর থাকা ভাল নয় রায় মশাই! তাই তালাটা লাগিয়ে দিয়ে গেলাম। মূষিকের উপদ্রব হতে পারে।

আরো দিন দুই পরে। বেলা দ্বিপ্রহর। মেসের ভৃত্য বলাই আগেই চলে গিয়েছে, রতনও যাবার জন্য সিঁড়িতে নেমেছে, পিছন থেকে কিরীটীর ডাক শুনে রতন ফিরে দাঁড়াল।

রতন!

কি বলছেন? রতনের মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তি। ভাবটা—যাবার সময় আবার পিছু ডাকা কেন!

যাবার পথে অন্নপূর্ণা রেস্তোরাঁয় বংশীবদনকে বলে যেও তো এক কাপ চা আমার ঘরে দিয়ে যেতে।

আজই প্রথম নয়। মধ্যে মধ্যে এরকম দ্বিপ্রহরে কিরীটীর চায়ের প্রয়োজন হয় এবং বখ্‌শিশের লোভে বংশীবদন দিয়েও যায় চা।

চার পয়সা চায়ের কাপের দামের উপর আরো তিন আনা উপরি লাভ হয় বংশীবদনের। পুরো একটা সিকিই দেয় কিরীটী।

যে আজ্ঞে। বলে রতন সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

মিনিট কুড়িক বাদেই বংশীবদন এক কাপ চা নিয়ে এসে কিরীটীর ঘরে প্রবেশ করল।

বাবু চা—

চা-পান করতে করতে কিরীটী বংশীবদনের সঙ্গে আলাপ চালাতে লাগল।

দুচারটা সাধারণ কথাবার্তার পর হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে, এ পাড়ার ট্যাক্সি-ড্রাইভার গঙ্গাপদকে চিনিস বংশী?

কোন্‌ গঙ্গাপদ? ঐ যে হুদকো মোটা কেলে লোকটা?

হ্যাঁ।

খুব চিনি। ডেকে দেবো নাকি লোকটাকে? গাড়ি চাই বুঝি?

হ্যাঁ, তোর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?

না। তবে কত্তার সঙ্গে খুব ভাব। মাঝে মাঝে রাত্রে কত্তার ঘরে আসে যে!

কে, ভূপতিবাবুর সঙ্গে?

হ্যাঁ।

তোর কত্তার ঘরে রাত্রে কে কে আসে রে?

ঐ গঙ্গাপদই আসে বেশী। আর কই কাউকে তো আসতে দেখিনি বড় একটা, তবে মাঝে মাঝে এই মেসের রজতবাবু যেতেন।

রজতবাবু যেতেন!

হ্যাঁ।

ট্যাক্সি বুঝি গঙ্গাপদরই?

না বাবু, শুনেছি কোন এক বাবুর। গঙ্গাপদ তো মাইনে-করা লোক।

খুব ভাড়া খাটে ট্যাক্সিটা, নারে?

ছাই! ভাড়া আর খাটে কোথায়? তবে হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যারাত্রে চলে যায়—ফেরে পরের দিন আবার সন্ধ্যায়!

ভাবছি কাল একবার ট্যাক্সিটা ভাড়া নেবো। পাঠিয়ে দিতে পারিস ওকে একবার?

কাল বোধ হয় ও যেতে পারবে না বাবু!

কেন?

কাল রাত্রে গঙ্গাপদ যে বলছিল, পরশু মানে কাল রাত্রে ভাড়ায় যাবে। ফিরবে পরদিন—সারা রাত ভাড়া খাটালে অনেক পায় কিনা।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

একটা সিকি ও চায়ের কাপটা নিয়ে বংশীবদন চলে গেল।

পরের দিন রাত তখন সোয়া আটটা হবে। কিরীটী এক কাপ চা নিয়ে রেস্তোরাঁর দরজার ধারে একটা টেবিলের সামনে বসে স্থির দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

W. B. T. 307 ট্যাক্সিটা খোলা দরজা বরাবর রাস্তার ওধারে ফুটপাত ঘেঁষে লাইটপোস্টটার অল্প দূরে পার্ক করা আছে। এতদূর থেকেও আবছা অস্পষ্ট বোঝা যায় গাড়ির চালকের সীটে বসে আছে একজন ছায়ামূর্তি। কিরীটী অন্যমনস্কের মত চা-পান করলেও তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছিল W. B. T. 307 ট্যাক্সিটার ওপরেই। বড় রাস্তার ঠিক মোড়েই সেই সন্ধ্যা থেকে আরো একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে রাতের প্রহর গড়িয়ে চলে। একটি দুটি করে রেস্তোরাঁর খরিদ্দার চলে যেতে থাকে। রাত প্রায় দশটার সময় কিরীটী হঠাৎ যেন চমকে ওঠে।

আপাদমস্তক চাদরে আবৃত্ত একটি নারীমূর্তি এসে W. B. T. 307 ট্যাক্সি গাড়িটার সামনে দাঁড়াতেই নিঃশব্দে ট্যাক্সির দরজাটা খুলে গেল।

নারীমূর্তি ট্যাক্সিতে উঠে বসল এবং উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করে।

কিরীটীও আর মুহূর্তে বিলম্ব না করে রেস্তোরাঁ থেকে উঠে সোজা গিয়ে দ্রুতপদে বড় রাস্তার মোড়ে যে দ্বিতীয় ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করছিল তার মধ্যে গিয়ে উঠলো।

বড় রাস্তায় পড়লেও W. B. T. 307 ট্যাক্সিটা ট্রামের জন্য আটক পড়ে তখনও বেশীদূর এগোতে পারেনি। কিরীটী ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করে। ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ট্যাক্সিটা প্রস্তুত হয়েই ছিল পূর্ব হতে সঙ্কেতমত। কিরীটী চাপা গলায় ড্রাইভার মনোহর সিংকে কি যেন নির্দেশ দিল।

গ্রীষ্মের রাত্রি দশটায় কলকাতা শহর এখনো লোকজনের চলাচল ও যানবহনের বৈচিত্র্যে সরগরম।

আগেকার গাড়িটা সোজা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট ধরে এগিয়ে গিয়ে বৌবাজারের কাছাকাছি বাঁয়ে বাঁক নিয়ে শিয়ালদহের দিকে এগিয়ে চলল। শিয়ালদহের

মোড়ে এসে ডাইনে বেঁকে এবারে চলল সারকুলার রোড ধরে সোজা। জোড়াগির্জা ছাড়িয়ে সারকুলার রোডের কবরখানা ছাড়িয়ে বাঁয়ে বেঁকল।

আগের গাড়িটা চলেছে এবারে আমীর আলি অ্যাভিনু ধরে।

হঠাৎ একসময় আগের গাড়ির স্পীডটা কমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মনোহরও তার পা-টা তুলে নেয় গাড়ির অ্যাকসিলারেটারের ওপর থেকে।

ট্রাম ডিপোটা ছাড়িয়ে বাঁ-হাতি একটা সরু গলির মুখে গাড়িটা দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে পূর্ববর্তী সর্বাঙ্গে চাদরে আবৃত মহিলাটি নেমে গেলেন এবং ট্যাক্সিটাও সামনের দিকে চলে গেল। হাত-দশেক ব্যবধানে মনোহর তার ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছিল। বিকাশ প্রশ্ন করেন, ব্যপার কি কিরীটী?

কিরীটী ট্যাক্সির দরজা খুলে নামতে নামতে বললে নামুন—এবং মনোহরের দিকে ফিরে তাকে ও কনস্টেবলকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে চলল।

বিকাশ কিরীটীকে অনুসরণ করেন। সরু গলিপথ, গলির মুখে একটিমাত্র লাইটপোস্ট। গলির পথ জুড়ে অদ্ভুত একটা আলোছায়ার লুকোচুরি চলছে যেন।

কিন্তু গলির মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না কিরীটী। তবু কিন্তু কিরীটী গলির মধ্যে ঢুকে এগিয়ে চলে। ব্লাইন্ড গলি। কিছুটা এগুতে শেষ হয়ে গিয়েছে। সামনেই নিরেট দেওয়াল। গলির দুপাশে দোতলা তিনতলা সব বাড়ি আলোছায়ায় যেন স্তূপ বেঁধে আছে।

সব কয়টি বাড়িরই দরজা বন্ধ। মাত্র একটি বাড়ির খোলা জানালাপথে খানিকটা আলোর আভাস লাগছে গলিপথে।

জানালাপথে উঁকি দিয়ে দেখল কিরীটী, সাহেবী কেতায় সোফা-সেটী-কাউচে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। এবং সেই ড্রয়িংরুমের মধ্যে একটি সোফার উপরে পাশাপাশি বসে একটি তরুণবয়স্ক পুরুষ ও একটি নারী।

চমকে ওঠে কিরীটী। কারণ পুরুষটিকে না চিনলেও নারীটিকে চিনতে তার কষ্ট হয়নি দেখা মাত্রই। সেই ভদ্রমহিলা! যাকে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে রাত্রে ভিষগ্‌রত্নের বাইরের ঘরে অনবগুণ্ঠিতা দেখেছিল সে।

কিন্তু ভদ্রমহিলাটির আজকের সাজসজ্জার ও সে-রাত্রের সাজসজ্জার মধ্যে ছিল অনেক তফাৎ। গা-ভর্তি জড়োয়া গহনা, পরিধানে দামী সিল্কের শাড়ি।

অপূর্ব রূপ খুলেছে দামী সিল্কের শাড়ি ও জড়োয়া গহনায়। চোখ যেন একেবারে ঝলসে যায়। আর পুরুষটির পরিধেয় সাজসজ্জা দেখলে মনে হয় ধনী কোন গুজরাট দেশীয় লোক। কিন্তু চিনতে পারল না চোখে কালো চশমা থাকায়। পুরুষটি হঠাৎ স্পষ্ট বাংলায় বলে, এসেছ?

আমার গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে—চল—

কিন্তু মাল?

মালও গাড়িতেই আছে।

বেশ, তবে চল।

কিন্তু টাকাটা?

ও হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলে গিয়েছিলাম একদম—বলতে বলতে জামার পকেটে হাত চালিয়ে একতাড়া নোট বের করে মহিলার হাতে তুলে দিল পুরুষটি।

গুনতে হবে নাকি?

তোমার খুশি—

মহিলাটি মৃদু হেসে নোটগুলো এক এক করে সত্যই গুনে দেখল। সব একশো টাকার নোট। নোটগুলো গুনে ব্লাউজের মধ্যে চালান করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

চল—

আর একটু বসবে না?

একটু কেন—সারারাতই তো থাকবো সঙ্গে সঙ্গে। চল—ওঠ।

যুবকটি উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু মহিলাটি হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে, একটু বোস, আসছি।

মহিলাটি ভিতরে চলে গেল। যুবকটি বসে আছে। হঠাৎ পা টিপে টিপে কে একজন কালো মুখোশে মুখ ঢেকে সোফার উপরে উপবিষ্ট যুবকের অজ্ঞাতেই তার পশ্চাতে এসে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে দপ্‌ করে ঘরের আলো গেল নিভে।

কি হল! আলো নিভে গেল যে! বিকাশ চাপা কণ্ঠে বলেন।

চুপ! কিরীটী সাবধান করে দেয়।

অন্ধকারে একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ, একটা ঝটাপটি শোনা যাচ্ছে।

পরক্ষণেই কিরীটী আর দেরি না করে গিয়ে বন্ধ দরজার উপরে ধাক্কা দেয়।

দরজায় ধাক্কা দিতেই বুঝলে দরজা ভিতর হতে বন্ধ।

প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিতে দিতে একসময় মট্‌ করে শব্দ তুলে ভিতরের খিলটা বোধ হয় ভেঙে দরজা খুলে গেল।

দুজনে হুড়মুড় করে অন্ধকার বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করে। পাশের ঘরে ঢুকে অন্ধকারে হাতের টর্চের আলো ফেলতেই কিরীটী চমকে উঠলো।

মেঝের উপর পূর্বদৃষ্ট তরুণ যুবকটি উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

ঘরের আলোর সুইচটা সন্ধান করে আলোটা জ্বালানো হল। ভূপতিত যুবকটিকে তুলে ধরতে গিয়েই বোঝা গেল সে আর বেঁচে নেই। কিন্তু তার চোখের চশমাজোড়া খুলে ফেলতেই কিরীটী চমকে ওঠে। অস্ফুট কণ্ঠে তার শব্দ বের হয় একটি মাত্র, এ কি! রজতবাবু! এবং মৃত্যু তার পূর্বের মতই। গলায় সেই সরু কালো দাগ।

বিকাশ বললেন, চেনো নাকি লোকটাকে?

হ্যাঁ। রজতবাবু—আমাদের মেসেই ছিল!

কিন্তু সেই মহিলাটি গেলেন কোথায়?

চল, বাড়িটা খুঁজে একবার দেখি। যদিও মনে হচ্ছে পাওয়া যাবে না আর।

সত্যিই তাই। বাড়ির মধ্যে দোতলার ও একতলার সব ঘরগুলিতেই তালা বন্ধ। কোথাও মহিলাটির সন্ধান পাওয়া গেল না।

চল, ফিরি।

কিরীটী ও বিকাশ দ্রুতপদে নিজেদের ট্যাক্সিতে এসে উঠে বসতেই মনোহর ইঙ্গিত করে দেখাল ওধারে ফুটপাতে W. B. T. 307 ট্যাক্সিটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিরীটী ঠিক করলো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।

বেশীক্ষণ কিন্তু অপেক্ষা করতে হল না। দেখা গেল দুটো বাড়ির পরের গলির ভিতর থেকে একজন চাদরে আবৃত মহিলা বের হয়ে সোজা তাদের ট্যাক্সির দিকেই এগিয়ে আসছে।

নেহাৎ হিসাবেরই ভুল বোধ হল কিরীটীর।

অন্ধকারে ভুল ট্যাক্সির খোলা দরজা-পথে ট্যাক্সির মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি ভুল বুঝতে পারলেও তখন আর ফিরবার পথ ছিল না। বিকাশের হাতে উদ্যত লোডেড পিস্তল।

কিন্তু মহিলাটি যেন নির্বিকার।

গোলমাল করে কোন লাভ হবে না। চুপটি করে বসে থাকুন। বলেই কিরীটী মনোহরকে নির্দেশ দিল সোজা থানার দিকে গাড়ি চালাতে।

ট্যাক্সিটা এসে থানার সামনে দাঁড়াতেই, সর্বাগ্রে কিরীটী বিকাশকে ডেকে চুপি চুপি কি কতকগুলো নির্দেশ দিয়ে ভদ্রমহিলাটিকে নিয়ে থানার ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। ভদ্রমহিলাটি এতক্ষণ গাড়িতে সারাটা পথ একটি কথাও বলেননি; ওরাও তাঁকে কোন কথা বলাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেনি। কিরীটীর চোখের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে সচল পাষাণমূর্তির মত ভদ্রমহিলা কিরীটীকে অনুসরণ করে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী একটি চেয়ার দেখিয়ে বললে, বসুন। যদি ভুল না হয়ে থাকে তো মনে হচ্ছে আপনিই বোধ হয় বীজেন্দ্রবাবু ও নিহত অরবিন্দবাবুদের বোন সুরমা দেবী!

ভদ্রমহিলা কিরীটীর কথায় বারেক চমকে ওর মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বললেন না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

বসুন সুরমা দেবী!

ইতিমধ্যে বিকাশ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আর একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

বসুন! আবার কিরীটী অনুরোধ জানাল।

এবং সুরমা দেবী এবারে একটা চেয়ারে উপবেশন করলেন।

বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়, নেহাৎ ভাগ্যচক্রেই আপনি আমাদের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছেন। শুনুন সুরমা দেবী, আপনি হয়তো এখনো বুঝতে পারেননি যে আমরা আটঘাট বেঁধেই আপনাকে আজ সন্ধ্যার পর অনুসরণ করেছিলাম যখন আপনি ন্যায়রত্ন লেনের বাসা থেকে বের হয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে চাপেন।

কিরীটীর শেষের কথায় সুরমা উপর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

হ্যাঁ, আপনি মুখ বুজে থাকলেও অবশ্যম্ভাবীকে আপনি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না সুরমা দেবী। আমরা জাল যে মুহূর্তে গুটিয়ে আনবো সেই মুহূর্তেই আপনাদের দলের অন্যান্য সকলের সঙ্গে আপনাকেও তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আমি তা

চাই না। আপনি যদি স্বেচ্ছায় সব স্বীকার করেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—সকলের মধ্যে টেনে এনে আপনাকে দাঁড়াবার লজ্জা ও অপমান হতে নিষ্কৃতি দেবো। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, এই বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে যতটুকু আপনি আপনার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক জড়িত হয়ে পড়েছেন, সেটা হয়ত আপনাকে এক-প্রকার বাধ্য হয়েই হতে হয়েছে। আরো একটা কথা আপনার জানা দরকার। আমীর আলি অ্যাভিনুর বাড়িতে আজ কিছুক্ষণ পূর্বে রজতবাবুর হত্যা-ব্যাপারটাও আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

দ্বিতীয়বার চমকে সুরমা কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কয়েকটি মুহূর্ত অতঃপর স্তব্ধতার মধ্যে দিয়েই কেটে গেল।

কিরীটী সুরমা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল সোজাসুজি আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার আর তাঁর ক্ষমতা নেই। কোন নারীই ঐ অবস্থায় নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না!

নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকালেন সুরমা দেবী কিরীটীর মুখের দিকে আবার।

দুজনের চোখের দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল।

কিরীটী চোখে চোখ রেখেই প্রশ্ন করল, তাহলে কি ঠিক করলেন সুরমা দেবী?

সুরমা দেবী নিশ্চুপ।

বুঝতেই পারছেন আর চুপ করে থেকে কোন লাভ হবে না! মাঝ থেকে কেবল পুলিশের টানা-হেঁচড়াতে কেলেঙ্কারিই বাড়বে।

কি বলবো বলুন?

আপনার যা বলবার আছে—

আমার?

হ্যাঁ।

কয়েকটা মুহূর্ত আবার নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বসে রইলেন সুরমা দেবী, তারপর মাথা তুলে ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ, বলবো।

তবে বলুন।

হ্যাঁ বলবো, সব কথাই বলবো। নইলে তো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

বলতে বলতে সুরমা দেবীর দুচোখের কোল বেয়ে দুটি অশ্রুর ধারা নেমে এলো।

সুরমা দেবী বলতে লাগলেনঃ

আপনারা তো আমার পরিচয় জানতেই পেরেছেন। তাই পরিচয় দিয়ে মিথ্যা সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। সব বলছি, পনের বছর বয়সের সময় আমার বিবাহ হয়। এবং বিবাহের ঠিক দশ দিন পরেই, দুর্ভাগ্য আমার, সর্পাঘাতে আমার স্বামীর মৃত্যু হয় তাঁর কর্মস্থল ময়ূরভঞ্জে। তিনি ছিলেন ফরেস্ট অফিসার। আমার স্বামীর একটি ছোট জ্যাঠতুত ভাই ছিল সত্যেন। সত্যেন মধ্যে মধ্যে আসত আমাদের বাড়িতে। স্বামীকে চেনবার আগেই তাঁকে ভাগ্যদোষে হারিয়েছিলাম। আমার তখন ভরা যৌবন। সেই সময় সত্যেন এসে আমার সামনে দাঁড়াল। শ্বশুরবাড়ির দিক দিয়ে আমার বৃদ্ধা শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই বিধবা হবার পরও মধ্যে মধ্যে সেখানে আমায় যেতে হতো।

এবং গিয়ে দুচার মাস সেখানে থাকতামও। ক্রমে সত্যেনের সঙ্গে হলো ঘনিষ্ঠতা। বলতে বলতে সুরমা দেবী চুপ করলেন।

সুরমা দেবীর জবানবন্দীতেই বলি।

সত্যেনের সঙ্গে সুরমার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতায় যা হবার তাই হল। সুরমা যখন নিজে বুঝতে পারল তার সর্বনাশের কথা, ব্যাকুল হয়ে উঠলো সে এবং লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে তখুনি সত্যেনকে একদিন ডেকে সব কথা খুলে বলতে একপ্রকার বাধ্য হল!

সত্যেন লোকটা ছিল কিন্তু আসলে একটা শয়তান। সে বললে, আরে তার জন্যে ভয়টা কি। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ব্যবস্থা! কিসের ব্যবস্থা?

কিসের আবার! গোলমাল সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু ভেবো না তুমি। তার জন্যে ভয়টা কি! সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সুরমা সত্যেনের কথায় রাজী হয় না। ইতস্তত করে বলে, দেখ একটা কাজ করলে হয় না?

কি?

আমি রাজী আছি। বিবাহটাই হয়ে যাক।

বিয়ে!

হ্যাঁ কেন, তুমি তো—

ক্ষেপেছো! বিয়ে করবো তোমাকে!

তার মানে?

ঠিক তাই।

কিন্তু এতদিন তো তুমি—

পাগল না ক্ষেপা! ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও সুরমা। আমার ব্যবস্থা তোমায় মেনে নিতেই হবে।

লোহার মত কঠিন ও ঋজু হয়ে এল সুরমার দেহটা মুহূর্তে। তীক্ষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে সে কেবল বলল, ঠিক আছে, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।

সুরমা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল।

শোন, শোন সুরমা—, সত্যেন ডেকে বাধা দেয় সুরমাকে।

সুরমা কেবল বললে, চলে যাও এখান থেকে।

পরের দিনই সুরমা চন্দননগরে দাদাদের ওখানে চলে এলো।

মা ও অরবিন্দ সমস্ত ব্যাপারটাই জানতে পারল। কেবল জানতে পারল না আসল ব্যক্তিটি কে। সুরমা কিছুতেই প্রকাশ করল না।

বোন সুরমাকে নিয়ে তারা চলে এলো কাশীতে।

সেইখানেই একদিন কবিরাজ চন্দ্রকান্তর সঙ্গে আলাপ হয় অরবিন্দর।

চন্দ্রকান্তকে দিয়েই তারা কাঁটা তুলবার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু চন্দ্রকান্ত সে-পথ দিয়েই গেলেন না। কাশীতে তিনি মুক্তাভস্ম নাম দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চোরাই কোকেনের কারবার চালাচ্ছিলেন। এবং ঐ সময়টায় পুলিশ অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠায় চন্দ্রকান্তও কাশীর ব্যবসা গুটিয়ে অন্যত্র কোথাও সরে যাবার মতলব করছিলেন। তাঁর সংসারে ছিল আগের পক্ষের একটি ছেলে ও মেয়ে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, শোন সুরমা, তুমি যদি রাজী থাকো আমি তোমাকে বিবাহ করতে রাজি আছি—কেন ও মহাপাপে মা হয়ে নিজেকে জড়াবে! ভ্রূণহত্যা মহাপাপ।

সুরমা প্রথমটায় কবিরাজের প্রস্তাবে বিহ্বল হয়ে যায়। চন্দ্রকান্ত তাকে বিবাহ করে সম্মান দেবে! পরে অনেক ভেবে রাজী হয়ে গেল সুরমা চন্দ্রকান্তরই প্রস্তাবে। কারণ সে নিজেও ওই কথাটা ভাবতে পারছিল না।

এক রাত্রে সে গৃহ থেকে পালাল কবিরাজ চন্দ্রকান্তর সঙ্গে।

কবিরাজ সুরমাকে নিয়ে এসে একেবারে কলকাতায় উঠলেন কাশীর সমস্ত ব্যবসাপাট তুলে দিয়ে। কিন্তু যে আশায় সুরমা গৃহত্যাগ করলো সে আশা তার ফলবতী হল না।

জন্মমুহূর্তেই সন্তানটিকে সেই রাতেই চন্দ্রকান্ত যে কোথায় সরিয়ে দিল তার অজ্ঞাতে সুরমা তা জানতেও পারলে না আর।

বিবাহও হল না এবং সন্তানও সে পেল না। অথচ বন্দিনী হয়ে রইলো সুরমা চন্দ্রকান্তর গৃহে তারই কূট চক্রান্তে।

সন্তানকে একদিন ফিরে পাবে, এই আশায় আশায় চন্দ্রকান্ত সুরমার গতিরোধ করে রাখল। শুধু তাই নয়, অতঃপর চন্দ্রকান্ত সুরমাকে দিয়েই তার ব্যবসা চালাতে লাগল। সুরমাকে টোপ ফেলে বড় বড় রুই–কাতলা গাঁথতে লাগল। সুরমা প্রথম প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছে, তার জবাবে চন্দ্রকান্ত বলেছে, আমার কথামত যদি না চল তো তোমার ছেলেকে একদিন হত্যা করে তোমার সামনে এনে ফেলে দেব।

চোখের জলের ভিতর দিয়েই সুরমা বলতে লাগলেন, সেই ভয়ে আমি সর্বদা সিঁটিয়ে থাকতাম কিরীটীবাবু। আর আমার সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে যত কুৎসিত জঘন্য কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিত। শেষটায় ওই চোরাই ব্যাপারে এলো একদিন সত্যেন।

সত্যেন!

হ্যাঁ। রজতবাবুর আসল নাম সত্যেন। ঘোমটার আড়ালে সে আমাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু আমি তাকে চিনেছিলাম। আর ওই সত্যেনের সাহায্যেই ওই চন্দ্রকান্ত, যাকে আপনারা শশিশেখর বলে জানেন, তার অন্য এক অংশীদার অন্নপূর্ণা রেস্তোরাঁর মালিক ভূপতি চাটুয্যের সাহায্যে অতর্কিতে একটা কালো ফিতের সাহায্যে পিছন থেকে ফাঁস লাগিয়ে চোরাই কারবারের ব্যাপারটা যার কাছে এতটুকু জানাজানি হয়ে যেত বা আমার ওপরে যারই লোভ পড়ত তাকে হত্যা করতো। এমনি করেই দিনের পর দিন চলছিল নারকীয় কাণ্ড, এমন সময় একদিন আমার দুর্ভাগ্য ছোড়দাও এর মধ্যে এসে পড়লেন ঘটনাচক্রে।

লজ্জায় মুখ ঢাকলেন সুরমা।

তারপর আবার বলতে লাগলেন, এদিকে শয়তান সত্যেন তখন চন্দ্রকান্তর মেয়ে অমলাকে ভুলিয়েছে। সত্যেনের মিষ্টি কথায় অমলা ভুললেও আমি তো জানি তার মানে সত্যেনের আসল ও সত্যকারের পরিচয়। আমি সতর্ক করে দিলাম চন্দ্রকান্তকে। চন্দ্রকান্ত আমার মুখে সব কথা শুনে কি যেন কী ভেবে রজতকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিল। তারপরই আমার হতভাগ্য ছোড়দাকে এক রাত্রে রেস্তোরাঁর মধ্যেই সেই ফিতের সাহায্যে ফাঁস দিয়ে হত্যা করলে ওরা। এবং রজতকে শেষ করার মতলব করলে। এদিকে ছোড়দার মৃত্যুতে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। দাদাকে চিঠি দিয়ে জানালাম তার মৃত্যুর কথা।

আমরা জানি সে চিঠির কথা। কিরীটী বলে।

জানেন?

হ্যাঁ। তারপর বলুন।

রজতকে তাড়াবার পর সে আসবে না জানতাম। তাই আমিই তাকে একটা চিঠি দিই চন্দ্রকান্তর পরামর্শমত—যে আমি নিজে টাকার বিনিময়ে ভুলিয়ে নিয়ে তার হাতে অমলাকে তুলে দেবো; এই আশ্বাস দিয়ে পার্ক সার্কাসের গার্ডেনের রজতের সঙ্গে ঝগড়ার পর তাকে ডেকে পাঠাই। এদিকে রজতের দ্বারা অনিষ্ট হতে পারে এই ভেবে চন্দ্রকান্তও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলার জন্য। আর সেই সঙ্গে আমারও ছিল প্রতিহিংসা। আমার আজকের এই চরম দুর্গতির জন্য তো সে-ই দায়ী। সে-ই তো আমাকে লোভে ফেলে এই চরম সর্বনাশের পথে একদা টেনে এনেছিল। তাই প্রতিজ্ঞা করলাম মনে মনে, যেতেই যদি হয় তাকে শেষ করে যাবো এবং এইবারই সর্বপ্রথম ও শেষবার চন্দ্রকান্তর দুষ্কৃতিতে তাকে সাহায্য করতে সর্বান্তঃকরণে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আপনি কিরীটীবাবু এখানে এনে আমাকে বলেছিলেন, নিয়তি-চালিত হয়েই নাকি আপনাদের গাড়িতে এসে আমাকে উঠতে হয়েছে, কিন্তু তা নয়।

কি বলছেন আপনি সুরমা দেবী? বিকাশ প্রশ্ন করেন।

ঠিক তাই। স্বেচ্ছায় আমি আপনাদের গাড়িতে উঠেছি।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ। আপনারা যে ট্যাক্সি করে আমাদের অনুসরণ করছেন সেটা আমি পূর্বাহ্নেই টের পেয়েছিলাম। আজ রাত্রে রজতকে শেষ করে পুলিশের কাছে এসে সব বলে দেবো পূর্ব হতে সেটা মনে মনে স্থির-সংকল্প হয়েই আমি প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। কথাটা বলতে বলতে কিসের একটা পুরিয়া হঠাৎ সুরমা দেবী হাতের মুঠোর থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন চোখের পলকে।

বাধা দেবেন না কিরীটীবাবু আর। আমাকে যেতে দিন। সত্যই কলঙ্কিনী আমি।

আর কথা বলতে পারলেন না সুরমা দেবী।

শেষের কথাগুলো জড়িয়ে তাঁর অস্পষ্ট হয়ে গেল।

কিরীটী বললে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে, কিন্তু আর তো দেরি করা চলে আমাদের এখুনি যেতে হবে। নচেৎ পাখী উড়ে যেতে পারে।

সুরমার মৃতদেহ ঐখানেই পড়ে রইলো। ওরা থানা থেকে বের হয়ে গেল।

থানা থেকে একজন এ.এস.আই. ও জনাতিনেক কনস্টেবলকে অন্নপূর্ণা রেস্তোরাঁয় ভূপতিচরণকে গ্রেপ্তার করতে পাঠিয়ে দিয়ে কিরীটী ও বিকাশ নিজেরা গেল ন্যায়রত্ন লেনের বাসার দিকে সোজা।

রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ বিকাশ ও কিরীটী সাধারণ বেশেই এসে ভিষগ্‌রত্নের সদর দরজায় ধাক্কা দিল।

দ্বিজপদ এসে দরজা খুলে দিল চোখ মুছতে মুছতে।

কবিরাজ মশাই আছেন?

হ্যাঁ—উপরে ঘুমোচ্ছেন।

যাও, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো গে। বলো এক ভদ্রলোক বিশেষ জরুরী কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

একটু পরেই খড়মের খট্‌খট্ শব্দ শোনা গেল।

খালিগায়ে কবিরাজ ভিষগ্‌রত্ন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন, ব্যাপার কি মশাই!

আপনার ডিসপেনসারী সার্চ করবো। ওয়ারেন্ট আছে, আমি থানা থেকে আসছি। বিকাশ সেনই বললেন।

কবিরাজ মশাই তখন ফ্যালফ্যাল করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। এবং বিকাশের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে কিরীটীকেই সম্বোধন করে বললেন, আমাদের রায় মশাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। চিনতে পেরেছেন দেখছি তাহলে!

হ্যাঁ। এসবের মানে কি?

ওঁর মুখেই তো শুনলেন। কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু কেন, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

সে-কথাটা ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না।

জিজ্ঞাসা আর করতে হল না, বিকাশবাবুই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জবাব দিলেন, মুক্তাভস্ম বলে যে মূল্যবান বস্তুটি এখানে আপনার বিক্রি হয়, শুনলাম সেটার অন্য একটি পরিচয়ও আছে—অর্থাৎ আবগারীতে নিষিদ্ধ মাদক পদার্থের লিস্ট অনুযায়ী যাকে বলা হয় কোকেন।

কোকেন! আমার এখানে? কবিরাজ মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

হ্যাঁ—কোকেন। কোথায় হে দ্বিজপদ, মুক্তাভস্মর যে প্যাকেটগুলো তোমাদের এখান থেকে চালান যায় সর্বত্র, সেগুলো বের কর তো বাবা!

মশাই কি রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে এনে আমার সঙ্গে রসিকতা শুরু করলেন? ভিষগ্‌রত্ন বলেন।

অনেক রসিকতাই এই ক-বছর ধরে করেছেন কবিরাজ মশাই আমাদের সঙ্গে আপনি—এবারে আমরা একটু-আধটু যদি করিই। বিকাশ ব্যঙ্গোক্তি করেন।

জানেন, এ ধরনের অত্যাচার নীরবে আমি সহ্য করব না? কবিরাজ মশাই গর্জে ওঠেন।

হিসাবে একটু ভুল করছেন শশিশেখরবাবু। সুরমা দেবী ইতিপূর্বেই সব আমাদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন। এবং তিনি এখনো থানাতেই বসে আছেন।

মানে? কি বলছেন যা-তা?

এবারে কিরীটী কথা বললে, কবিরাজ মশাই, মহাভারতখানা আপনার নিশ্চয়ই পড়া ছিল, তবে এ ভুল করলেন কেন? শকুনির হাড়ের পাশা অমোঘ ছিল সত্য, কিন্তু সেই পাশাই কি শেষ পর্যন্ত শকুনির মৃত্যুর কারণ হয়নি? পাশার সাহায্যে যে কুরুক্ষেত্র রচিত হয়েছিল সেই কুরুক্ষেত্রেই কি শকুনিকেও শেষ নিঃশ্বাস নিতে হয়নি? আপনার সেই হাড়ের পাশা, সুরমা দেবীই সব স্বীকার করেছেন। অমোঘ সে হাড়ের পাশার দান—যখন একবার পড়েছে, আর তো তা ফিরবে না। অনেক দিন ধরে জুয়োখেলায় জিতে আসছিলেন, কিন্তু এবার আপনার হারবার পালা কবিরাজ মশাই!

কিরীটীর কথায় মুহূর্তে শশিশেখরের মুখের সমস্ত রক্ত কেউ যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিল। নির্বাক স্থাণুর মত শশিশেখর দাঁড়িয়ে রইলেন।

তা ছাড়া পাঁচটা মার্ডার—

মার্ডার! কথাটা উচ্চারণ করে চমকে তাকালেন বিকাশ ও কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ। এ পাড়ার সব কটি মার্ডারের মূলেই কবিরাজ মশাইয়ের মুক্তাভস্ম। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যারা প্রাণ দিয়েছে তারাও এই মুক্তাভস্মেরই চোরাকারবারী ও অংশীদার ছিল। তাছাড়া আইন নিশ্চয়ই জানেন, মার্ডার ও abatement of murder দুটোরই শাস্তি পিনালকোডে একই ধারায়।

সত্যি নাকি!

হ্যাঁ, চলুন থানায় সব বুঝিয়ে দেবো।

সুশান্ত থমথমে চোখে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। ঘরের মধ্যেকার মৃদু আলোয় তার বন্য মুখখানা আরও বন্য হয়ে উঠেছে।... এ কি! এ সে কোথায় এসেছে।! এতক্ষণ পরে সুশান্তর খেয়াল হল। এ জয়গাটা তো তার অচেনা, অজানা! তবু আবার খানিকটা সাহস সংগ্রহ করে সুশান্ত বললে, দেখুন, আমি একটি মেয়েকে এ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখেছি।

স্বচক্ষে দেখেছেন, এ বাড়ির মধ্যে ঢুকল?

হ্যাঁ, একরকম তাই। রাস্তার মোড় ঘুরলেই তো এই একখানা মাত্র বাড়ি এদিকে! ওকে আমি দেখলাম মোড় ঘুরতে। তার পেছনে পেছনে আমিও আসছিলাম। মোড়ের মাথায় আসতেই তাকে আর দেখলাম না। একটা মানুষ তো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না! স্বভাবতই আমার সন্দেহ হল, এ বাড়িতে সে ঢুকেছে। আর তো দ্বিতীয় কোন বাড়ি নেই এদিকে।

সুশান্ত যথেষ্ট বুদ্ধির প্রকাশ দেখাল তার কথায়।

কি জানি কেন, লোকটা সুশান্তর কথায় খানিকটা ভদ্র হল। বললে, আপনি ভুল করেছেন। এটা পোড়ো বাড়ি। এখানে—

লোকটা এক মুহূর্ত থেমে কি ভেবে গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে বললে, এখানে মানুষ আসে না। যান—পালিয়ে যান; দাঁড়াবেন না বেশিক্ষণ!

আতঙ্কজনক লোকটা অদ্ভুত থমথমে গলায় তার কথা শেষ করল। তার চোখে-মুখে কোথাও আর সেই অশ্লীলতা নেই—কেমন করে না জানি নেমে এসেছে একটা অব্যক্ত শোকের গভীর ছায়া। তার চোখে কেমন একটা সুদূর অন্ধকারের আবেশ।

কিন্তু—। সুশান্ত দো-মনা হল।

বিশ্বাস না করেন, ঘরে আপনাকে আমি আসতে দিতে পারি—তন্ন তন্ন করে দেখে যেতে পারেন সব। কিন্তু তারপরে? কোন দায়িত্ব—'

থাক।—সুশান্ত বাধা দিল, আমি ফিরে যাচ্ছি।

দ্বিতীয় আর কোন কথা না বলে সুশান্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সমস্ত দেহে-মনে অদ্ভুত একটা জমাট ভয় কাপড়ের মত জড়িয়ে ধরেছে তাকে।

পেছন থেকে লোকটার সেই বন্য হাসি শোনা গেল। তারপর যেমন করে হঠাৎ ঝড়ে-খোলা দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তেমনিভাবে সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

চমকে উঠল সুশান্ত; দ্রুত হয়ে উঠল তার হৃদস্পন্দন! যেমন ভীতার্ত অবস্থায় সে এসেছিল, ঠিক তেমনিভাবেই নেমে যেতে লাগল অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে।

পথে নেমে হনহন করে হাঁটতে লাগল সুশান্ত। মাথা তার তখনও গরম হয়ে রয়েছে; জ্বালা করছে চোখ দুটো; হাতগুলো কেমন যেন অসাড়।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকটা হেঁটে সুশান্ত বাঁধের কাছাকাছি মাঠটার সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। তবু এখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভ্রাম্যমাণ ছেলে-মেয়ে-বুড়ো—এদের দেখা যায়। সুশান্তর প্রায় গা ঘেঁষে অশোক মিত্র তার নতুন বউয়ের হাত ধরে চলে গেল। কে ওটা! কে ওটা—ওই যে ছড়ির ওপর ভর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে এদিকে! পরিতোষবাবু না? হ্যাঁ, পরিতোষবাবুই তো! সুশান্ত অন্যদিকে হাঁটতে শুরু

করল! কে জানে কেন, পরিতোষবাবুকে একদম সে সহ্য করতে পারে না আজকাল। অথচ ভদ্রলোক প্রতিবেশী; একদা যথেষ্ট বন্ধু ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণদের ভিড় থেকে সরে এসে একটা পাথরের ওপর বসল সুশান্ত। সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে ধোঁয়া গিলল। মাথার চুলগুলো জোরে জোরে আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে টানল অনেকক্ষণ। তারপর পাথর থেকে নেমে ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়ল। আকাশের তারায় থমকে থাকল তার চোখ।

কি আশ্চর্য! সুশান্ত প্রথম থেকে ভাবতে লাগল। এ নিয়ে দু-দুবার! অর্চনাকে সে দু-দুবার দেখল এখানে। কি করে যে তা হয়—ভাবতেও অবাক লাগে। যে লোক মরে গেছে, তাকে কি করে আবার দেখা সম্ভব? অদ্ভুত—অদ্ভুত কাণ্ড! গত সপ্তায় 'ভ্যারাইটি স্টোরস' থেকে সিগারেট কিনে পথে নেমে দাঁড়াতেই ঠিক উল্টো রাস্তায় ওর দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল অর্চনাকে। অর্চনাকে বলা কি ঠিক? হ্যাঁ, সুশান্তর তাই মনে হল। পেছন থেকে লোক চেনা কষ্টকর সত্যি! কিন্তু অর্চনা তো শুধু চেনা নয়, অনেক দিনের চেনা—অনেক আলো, অনেক অন্ধকারের জানা। ঠিক তেমনি হেলে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি। গায়ে সেই তার খুব-প্রিয় কমলা রঙের শাড়ি, আর তার বরাবরের অভ্যেস এলো খোঁপা বাঁধা! অর্চনা ছাড়া অন্য কোন মেয়ে সে হতে পারে না! সুশান্তর চোখ অর্চনার মাথার চুল দেখে চিনে নিতে পারে—আর সে কিনা গোটা দেহটাকে দেখে ভুল করবে! নাই-বা দেখল মুখ!

সুশান্ত প্রথমটা চমকে উঠেছিল, তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে—এমন সময় অর্চনা হাঁটতে শুরু করল। একটু এগিয়েই ও ঢুকল একটা গলির মধ্যে, তারপর মিলিয়ে গেল কোথায়। সুশান্ত সেদিন পিছু ধাওয়া করে নি—কেননা, সে অবসরই পায় নি। তা ছাড়া এত বেশি হকচকিয়ে গিয়েছিল যে পা বাড়াবার সংবিত ফিরে পাবার আগেই একরকম অর্চনা চলে গেল। তারপর সুশান্ত অনেক ভেবেছে। শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়েছে, ওটা চোখের ভুল—মরা মানুষ কখনো বেঁচে উঠতে পারে না। কিংবা হয়তো-বা এ শহরে আর একজন কেউ এসেছে—যাকে পেছন থেকে অর্চনার মতই দেখায়, আর সেই নবাগন্তুক মেয়েটি অর্চনার মতনই কমলালেবু রঙের শাড়ি পরে, হেলে দাঁড়ায়, এলো খোঁপা বাঁধে।

অর্চনাকে—কি বলা যায়—অর্চনার মত অবিকল সেই মূর্তি দেখে সুশান্তর মনে প্রথম যে ঝড় ওঠে, অনেক ভাবনা-চিন্তা, অনেক মানসিক গবেষণার পর ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে আসে। মানসিক বিক্ষিপ্ততাও ক্রমে জুড়িয়ে গুটিয়ে আসে। আকস্মিকতার দোহাই মেনে মনে মনে সে আবার স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে।

হয়তো সুশান্তর এরকম মানসিক ভারসাম্য অব্যাহতই থাকত, যদি না আজ আবার—আবার সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটত। আজকের ঘটনাটা পুরোপুরি সুশান্ত আবার প্রথম থেকে ভাবতে শুরু করল।

বিকেলের রোদটুকু হাল্‌কা হতে না হতে সুশান্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। 'প্লেজার কর্নারে' বিপ্রদাসের সঙ্গে চা খাবার কথা ছিল। সেখান থেকে চা খেয়ে গল্পগুজব করে বেরুতে ওর প্রায় বিকেল গড়িয়ে এল। পথে নেমে খানিকটা এসে

'ভ্যারাইটি স্টোরস'। সিগারেট কিনে সুশান্ত পথে নামতেই খানিকটা দূরে আবার ঠিক সেই আগের মতনই দেখল অর্চনার প্রতিমূর্তি। এবার যেন আরও পরিষ্কার, আরও স্পষ্ট। সুশান্ত দেখল, সেই কমলালেবু রঙের শাড়ি, এলো খোঁপা, হেলে দাঁড়ানো। এ ছাড়া লক্ষ্য পড়ল আরও একটা জিনিসের ওপর। অর্চনার হাতের লেডিস ছাতাটা। অবিকল সেইরকম ছাতা তার হাতে।

সুশান্তর বুকটা কেঁপে উঠল; চোখ দুটো বিস্ময় আর বিহ্বলতা নিয়ে থমকে থাকল খানিকক্ষণ। কয়েক মুহূর্ত অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির মধ্যে কেটে গেল। হঠাৎ সুশান্ত দেখল, অর্চনার সেই মূর্তি হাঁটতে শুরু করেছে—এগিয়ে যাচ্ছে! সুশান্ত তাড়াতাড়ি পথে নেমে তার অনুসরণ করলে। আশ্চর্য, সুশান্ত যত পা চালায়—তার গতিবেগ বৃদ্ধি করে, সামনের সেই অস্পষ্ট মূর্তিও তত দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। একেই তো অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, তার ওপর ক্রমশ এরকম দূরত্ব রেখে পিছু ধাওয়া অত্যন্ত অসুবিধাজনক। ওই তো এ রাস্তা শেষ হয়ে এল। তারপরেই মল্লারবাগের মোড়। গাছের ছায়ায় ঢাকা আঁকাবাঁকা মল্লারবাগের রাস্তায় যে-কোন্ মুহূর্তে অর্চনার ছায়ামূর্তি হারিয়ে যেতে পারে।

কথাটা মনে হতেই সুশান্ত দৌড়তে শুরু করল। সামনের মূর্তি যদিও দৌড়ল না, তবু মনে হল যেন তার হাঁটার গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুশান্ত এবার আরও জোরে দৌড়তে শুরু করলে।

হয়তো এভাবে খানিকটা ছুটলে সুশান্ত মূর্তিটিকে অনায়াসে ধরে ফেলতে পারত, কিন্তু বাধ সাধল তাতে গৌতম। পেছন থেকে সাইকেল সমেত এসে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর।

অন্য লোক হলে কি হত বলা যায় না, গৌতমকে দেখে অনেক কষ্টে রাগ সামলে সুশান্ত বললে, সাইকেল-রেস দিচ্ছ নাকি?

গৌতম সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে হাসল। বললে, না, এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। যাব একবার হিরণদের আড্ডায়। সন্ধের আগেই পৌঁছবার কথা ছিল। দেরি হয়ে গেল, তাই স্পীডের মাথায়—

বুঝলাম।—সুশান্ত গৌতমকে থামিয়ে হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করে বললে, স্পীডের ঝোঁকে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটালে আমি নাহয় চুপ করে থাকতুম। অন্য লোক হলে যে গালাগাল দিত—চাই কি থানায় টেনে নিয়ে যেত।

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে গৌতম শুধু হাসল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—ভালই। আমাকে আজ রাত্তিরেই হয়তো যেতে হত তোমার কাছে।

কেন?—সুশান্ত সামনের দিকে তাকিয়ে বিরক্তি চেপে বললে।

অর্চনার সেই মূর্তি আরও অস্পষ্ট হয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু তবুও পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি। যদি এখনও আগের মতন ছুটে ধাওয়া করতে পারে, হয়তো তাকে ধরতেও পারবে। ব্যগ্র হয়ে উঠল সুশান্ত।

আমার কিছু টাকার দরকার।—গৌতম বললে।

কত?

শ' খানেক

অন্য সময় হলে সুশান্ত বোধ হয় চিৎকার করে উঠত; কিন্তু এখন সে একশ' কেন, তার বেশিও যদি চাইত গৌতম, শুধু তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে সুশান্ত রাজী হয়ে যেত। সুশান্ত বললে, বেশ, রাত্রে বাড়িতে এস।

ধন্যবাদ।—গৌতম সুশান্তর পিঠ চাপড়ে বললে, দাও, একটা সিগারেট দাও—যাই।

সিগারেট ধরিয়ে গৌতম সাইকেলে উঠতেই সুশান্ত বললে, মাঠের মধ্যে দিয়ে শর্ট-কাট করে যাও—হিরণদের আড্ডায় পৌঁছে যাবে।

তাই যাব।—দ্বিতীয় কোন কথা না বলে গৌতম মাঠের রাস্তা দিয়ে নেমে গেল সাইকেল সমেত।

গৌতম যদি সোজা যেত,—সুশান্ত ভাবল—তাহলে সেও বোধ করি অবাক হত। কিন্তু সুশান্ত তা যেন চায় নি আর।

সৌভাগ্যের কথা, গৌতম মল্লারবাগের রাস্তায় না গিয়ে মাঠের রাস্তা নিল।

গৌতম চলে যাবার পর সুশান্ত আবার ছুটতে শুরু করলে।

অপসৃয়মান মূর্তি কখনও ভেসে ওঠে, কখনও মিলিয়ে যায়। অনেক কষ্টের পর যদিও-বা তার কাছাকাছি আসা গেল—দুর্ভাগ্য সুশান্তর, আবার মোড় পড়ল তার পথে। মোড়ের আড়ালে মূর্তিটা যে কোথায় মিলিয়ে গেল, কে জানে! সুশান্ত ভেবেছিল, বুঝি-বা মোড়ের পরই যে বাড়িখানা আছে, সেখানেই ঢুকে পড়েছে মেয়েটি। তাই এমন একটা দৃঢ় সন্দেহের ওপর আস্থা রেখেই সুশান্ত বাড়ির মধ্যে ঢুকে খোঁজ নিতে গিয়েছিল।

আশ্চর্য, সেই বীভৎস লোকটা কিছুতেই স্বীকার করল না—কোন মেয়ে সেখানে ঢুকেছে। সুশান্ত সে কথা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি, তারপর তা বিশ্বাস করেছে। কারণ, প্রথমে না হলেও সুশান্ত পরে বুঝতে পেরেছিল, ওটা অর্জুন সিং-এর চোরাই আড্ডা। চাল, মদ, আফিং—এসবের গুদাম! ভয়ে—হ্যাঁ, ভয়েই আর সুশান্ত ঢুকতে রাজী হয় নি ভেতরে। কে জানে, কি বিপদ ঘটবে। আর এও সত্যি কথা, ও আড্ডায় স্বেচ্ছায় কোন মেয়ে কোনদিন ঢুকবে না। যারা ঢোকে, তারা স্বেচ্ছায় নয়—শয়তানের হাতে পড়ে ঢোকে। আর সে ঢোকাই তাদের শেষ; ফিরে আসে না আর—সুদূর দেশে বিভিন্ন শহরে দেহের ব্যবসা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়। ..... না, অর্চনা তো দূরের কথা, ওর মতন কোন মেয়েই ও বাড়িতে ঢোকে নি, ঢুকতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, যে কোন মেয়েই হোক—সে গেল কোথায়? কেমন করেই-বা মিলিয়ে গেল? একটা গোটা মানুষ ভূতের মতন—ছায়ার মতন—মিলিয়ে যায়? এ যে অসম্ভব!

সুশান্তর সমস্ত মাথা গরম হয়ে উঠল ভাবতে ভাবতে। একবার নয়, দু-দুবার সে দেখল একই জিনিস। অর্চনার প্রত্যেকটা ভঙ্গির সঙ্গে সুশান্ত যত পরিচিত, এতটা বোধ করি গৌতম ছাড়া আর কেউ নয়! ভুল হবার জিনিস তো এ নয়, তবে?

অনেক ভেবেও সুশান্ত কোন কূল-কিনারা পায় না। রাত বেড়ে ওঠে। ফাঁকা হয়ে আসে মাঠ। দমকা ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা-টা তার শিরশিরিয়ে ওঠে। সুশান্ত একবার ভাবে, গৌতমকে তখন কথাটা বললে কেমন হত! পরক্ষণেই তার বুকটা ধক্ করে কেঁপে ওঠে। না, না—না বলাই ভাল। ভালই করেছে সে গৌতমকে কোন কথা না বলে।

আরও খানিকক্ষণ মাঠে বসে থেকে সুশান্ত বাড়ি ফিরে চলল।

বাড়িতে এসেও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। সেই একই কথা বারবার তার মনের সমস্ত চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে রাখল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে ঘরে এসে শুলো সুশান্ত, চেষ্টা করল মনটাকে অন্য কিছুতে আটকে রাখবার; কিন্তু পারলে না। হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে, গ্রামোফোনের রেকর্ড শেষ হয়ে কখন থেমে গেল—কোন হুশ থাকল না তার। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে পাগলের মত সারা ঘরময় শুধু পায়চারি করতে থাকল।

হঠাৎ কি করে না জানি, তার অদ্ভুত একটা কথা মনে হল—অর্চনা কি সত্যি সত্যিই মারা গেছে? হয়তো—হয়তো অর্চনা মরে নি।

কথাটা মনে আসতেই একটা সাপ যেন চলে গেল সুশান্তর সমস্ত গা বয়ে, এমনভাবে চমকে উঠল ও। বাস্তবিক, অর্চনা যদি না মারা গিয়ে থকে? সুশান্ত তো নিজের চোখে সনাক্ত করে নি অর্চনার মৃতদেহ।

সে তখন অসুস্থ, পীড়িত। গৌতম আর কে কে যেন সনাক্ত করেছিল। অবশ্য, সে সনাক্ত ভুল হবার নয়! তবে? সুশান্ত চমকে উঠল, এ একটা চাল নয় তো? কোন ফন্দী? কোন দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র?

অনেক—অনেকক্ষণ সুশান্ত ভাবল—কি হতে পারে? একটা কথা অবশেষে মনে হল তার—সম্ভবত চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গেলেও হয়তো অর্চনা বাঁধের জলে পড়ে নি—মরেও নি তাই। বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে, কিংবা—

অকস্মাৎ সুশান্তর মনে হল, একবার গিয়ে দেখে এলে কেমন হয়—ঠিক কোথা থেকে কেমনভাবে সে পড়েছিল!

কথাটা আরও নানাভাবে ফেনিয়ে উঠল তার মনে। আর অবশেষে সুশান্ত ঘরের বাতি নিভিয়ে সোজা নেমে এল নিচে। চাকরটাকে নিচে দেখতে পেয়ে বললে, আমি একটু পরে ফিরে আসব; তুই যেন ঘুমিয়ে পড়িস না।

গ্যারেজ থেকে তার টু-সিটার 'হিলম্যান' গাড়িখানা বের করে সুশান্ত বেরিয়ে পড়ল।

বাঁধের ব্রীজে ওঠবার মুখে গাড়ি থামিয়ে নামল সুশান্ত। গাড়ির হেড লাইট নিভিয়ে অন্ধকারে সতর্ক পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ঠিক ব্রীজের মুখে—ভাঙা রেলিঙের কাছে। এইখানে—হ্যাঁ, ঠিক এইখান থেকেই অর্চনা গড়িয়ে পড়েছিল। নিচে তাকাল সুশান্ত—অন্ধকারে জলের গভীরতা বোঝা যায় না, স্রোতের সামান্য একটু শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। এখান থেকে যদি সে গড়িয়ে পড়ে, জলে পড়বারই কথা; কিন্তু যদি একটু সরে যায় কোনরকমে, তা হলে ঢালু জমি দিয়ে পাথর আর জংলা গাছের ঘসড়ানি খেতে খেতে সে নিচে মাঠের বুকে গিয়ে পড়বে। বাঁধের ব্রীজের ঠিক মুখেই কাণ্ডটা ঘটেছে। সুশান্ত কোনক্রমেই বুঝতে পারল না, জমি না জল—অর্চনা কোথায় গিয়ে পড়েছে শেষ পর্যন্ত। রেলিঙের একেবার ধারে এসে সুশান্ত ঝুঁকে তাকিয়ে থাকল সেই অন্ধকারে জলের দিকে।

ইট'স এ ডায়লেমা।—অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলে সুশান্ত—কেমন একটা থমথমে গলায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন পেছন থেকে বললে, জানতুম, তুমি এখানে আসবে।

সাপের ছোবল খাওয়ার মতন চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই সুশান্ত দেখল, তার ঠিক কাঁধের কাছে গৌতম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তুমি!—সুশান্তর বুকের কাঁপুনির শব্দ বুঝি গৌতমও শুনতে পেল।

হ্যাঁ, আমি।

কি বলবে, সুশান্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারল না। তার সমস্ত মাথা তখন ঝিমঝিম করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

গৌতম তার একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে পাশে টেনে নিল, আমায় এমনভাবে দেখবে, আশা করো নি, না? বড্ড ভয় পেয়ে গেছো!

গৌতম হাসল—সামান্য শব্দ করে। সে হাসি অন্ধকারে পুরোপুরি দেখা না গেলেও সুশান্ত আভাস পেল—গৌতম আজ যেন ঠিক অহিংস হাসি হাসছে না।

সুশান্ত চেষ্টা করতে লাগল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহজ হতে। খানিকটা সময় কেটে গেল চুপচাপ—যেন বাতাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজনে। তারপর সুশান্ত নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, আমি এখানে কেন এসেছি জানো?

জানি।

না; আত্মহত্যা করতে নয়।

কথাটা শোনা মাত্র গৌতম সশব্দে হেসে উঠল। প্রতিধ্বনিত হল সেই হাসি সেই উন্মুক্ত বাতাসের স্তরে স্তরে।

হাসছ!

তোমার কথা শুনে।

কেন?

ওই যে কি বললে—আত্মহত্যা না কি করবে যেন!

গৌতম থেমে থেমে হাসতে লাগল।

এতে হাসির কি আছে? অর্চনার মৃত্যুর পর আমার মনের অবস্থা কি, তা বোধ হয় তুমি জানো। এ অবস্থায় আমার পক্ষে আত্মহত্যা করতে আসাটা খুব বেশি অস্বাভাবিক কি?

অর্চনাকে হারাবার দুঃখ সইতে পারছ না—এরকম কোন কারণে আত্মহত্যা করতে তুমি আসো নি, আমি জানি।—গৌতম বললে।

মানে?

বুঝতে তো সমস্তই পারছ—গৌতম হঠাৎ ক্লান্ত সুরে বললে, এ লুকোচুরির আর দরকার কি।

গৌতম।—সুশান্ত হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন সুরে বললে, তোমার কথার ইঙ্গিত অত্যন্ত অস্পষ্ট।

না! অত্যন্ত স্পষ্ট!—গৌতম সুশান্তর চেয়ে কঠিন সুরে জবাব দিল।

এক মুহূর্ত দুজনে স্তব্ধ থেকে পরস্পরের দিকে চাইল। সে দৃষ্টি থেকে পরস্পর কি বুঝল, কে জানে। সুশান্ত বললে, তোমার সঙ্গে বৃথা তর্ক-বিতর্ক করার সময় আমার নেই। আর, এটা তার উপযুক্ত সময়ও নয়। আমি চললুম।

যাবার জন্যে পা বাড়াল সে।

গৌতম কঠিনভাবে সুশান্তর হাত চেপে ধরল। বললে, না, অত সহজে তোমার যাওয়া হতে পারে না। তা ছাড়া, ফিরে যাবার কথা আর না ভাবাই ভাল!

সুশান্ত চমকে উঠল গৌতমের কথায়, কি বলছ তুমি!

গলার স্বরে তার ভয় কেঁপে উঠেছে।

আমি যা বলছি, তার অনেক বেশি তুমি জান। আজ তোমায় সেইসব কথা বলতে হবে।

আমি কিছু জানি না। তুমি আমায় যেতে দাও।—সুশান্ত এতক্ষণ পর সহজ কণ্ঠে বললে—অন্তত তার কণ্ঠস্বরে তাই মনে হয়।

গৌতম সুশান্তর হাত ছাড়ল না। আরও জোরে চেপে ধরে ওকে ব্রীজের পাশে টেনে এনে দাঁড় করালো।

তুমি যদি না বল,—গৌতম বললে—আমায় প্রথম থেকে শুরু করতে হয়। আমি তাই করব। কিন্তু সবচেয়ে আগে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই তোমায়। আমার এই হাতটার দিকে তাকিয়ে দেখ। পালাবার বা অন্য কিছু করবার চেষ্টা না করলেই ভাল করবে।

সুশান্ত দেখল, গৌতম যদিও বাঁ হাত দিয়ে তার হাত চেপে ধরেছে, ডান হাতে তার একটা রিভলবার। সুশান্তর কাছে এত বড় অপ্রত্যাশিত ও আতঙ্কজনক কিছু হতে পারে না। ভয়ে, বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল ও।

গৌতম তাকে একটু সময় দিয়ে বললে, আমার কথা শুরু করব?

কর!—খুব মৃদু অথচ ভাঙা সুরে বললে সুশান্ত অনেকক্ষণ পরে।

দু বছর আগের কথা। এ শহরে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে একটি ছেলে এসে হাজির হয়। নাম তার গৌতম। প্রথমে তার আসার বিশেষ কোন একটা উদ্দেশ্য থাকলেও সে কথা তখন সে গোপন রেখেছিল। আজও রেখেছে। ছেলেটা হয়তো ভাল, কিংবা বলতে পারো—কয়েকটা তার ভাল গুণ ছিল, যার জন্যে খুব শিগগির এ শহরের যুবক-মহলে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারল। প্রথমে স্কুল-মাস্টারি, তারপর একটা চায়ের স্টল খুলে গৌতম এ শহরে নিজেকে জাঁকিয়ে তুলল। তার চায়ের স্টল—রাজনীতি, ফুটবল, থিয়েটার, দাঙ্গা—সবকিছুরই আলোচনার কেন্দ্র।

ক্রমেই গৌতমের প্রতিপত্তি বাড়ে—যদিও পয়সা বাড়ে না। এমন অবস্থা যখন, তখন অর্থাৎ তার আসার মাস ছয়েক পরে এ শহরে একটি মেয়ে এল। নাম তার অর্চনা। অর্চনা গার্লস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস হয়ে এলেও তার আসবার আসল উদ্দেশ্য কেউ জানল না। আজও কেউ জানে না। আমি জানি। বরং বলা ভাল—আমাদের উভয়ের আসল উদ্দেশ্য আমরাই জানতাম দুজনে, আর কেউ নয়। অবাক হচ্ছো? হ্যাঁ, অবাক হবারই মতন কথা।

অর্চনা এ শহরে আসার পর তুমি জানো, ধীরে ধীরে কেমন করে একটা ঘূর্ণি জেগে উঠল সারা শহরময়! অর্চনা শুদু অন্দর-মহলের প্রীতি লুঠে নেয় নি—পুরুষ-মহলেও ঝড় জাগিয়ে দিয়েছিল। তার যৌবনের উত্তাপ, তার হাসি, তার দুর্দমনীয় জীবনের আবেগে যারা চমকে উঠেছিল, তুমি—সুশান্ত—তাদের মধ্যে একজন। এ শহরে তুমি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তোমার সুন্দর বাড়ি অছে, টাকা আছে। আভিজাত্যের নিষ্কলুষ টীকা আছে। তা ছাড়া, সত্যি বলতে গেলে কি, সত্যিই তুমি একজন আর্টিস্ট! তুমি কালচার্ড, ভদ্র। এ বিষয়ে কোন সন্দেহও কেউ কখনও করত না—আজও করে না! ভেবো না যেন, আজ আমি তোমায় আক্রমণ করছি বর্বর বলে! আমি জানি, তুমি বর্বর কেন, তার চেয়েও অধম হয়েছ মনের শুধু একটা দরিদ্রতার জন্যে, ধৈর্যের অভাবে। সামান্য একটা ভুলের জন্যে যা করেছ, তার চেয়ে বড় অপরাধ মানুষের সমাজে আর কিছু হতে পারে না।

অপরাধ?—সুশান্ত অবাক সুরে বলল।

হাঁ, তাই।—গৌতম বলে চলল, অর্চনার সঙ্গে আলাপ হবার পর তুমি তার ওপর ক্রমশই আকৃষ্ট হতে লাগলে। নানাভাবে সে তোমার মনে স্থান করে নিল। আর একদিন স্পষ্টই তুমি বুঝতে পারলে, অর্চনাকে শুধু তুমি ভালবাসো নি—বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছ। তার ওপর তোমার দাবী তাই সবার চেয়ে বেশি। একটা কথা কি জানো সুশান্ত—যদি তুমি তোমার মনের এ অবস্থার কথা কোনরকমে একবার মুখ ফুটে অর্চনাকে বলতে পারতে, তা হলে হয়তো ভাল হত। তা তুমি বল নি। বলবার সাহস খুঁজে পাও নি। তাই অর্চনার সামনাসামনি তোমার ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র হলেও আড়ালে তুমি তার গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে। সে কোথায় যায়, কি করে, কার সঙ্গে বেশি মেশে—এমন কি, যদি বলি তুমি তার অতীত জীবনের কথাও জানবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলে, তা হলেও তোমার বলবার কথা থাকে না। অর্চনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা এ শহরের আর কারুর চোখে পড়বার কথা নয়, পড়েও নি—একমাত্র ব্যতিক্রম তুমি। তুমি আমার আর অর্চনার ঘনিষ্ঠতা আড়াল থেকে লক্ষ্য করলে এবং সেই থেকে জঘন্যরকম হিংসে পোষণ করতে লাগলে আমার বিরুদ্ধে।

গৌতম এখানে কিছুক্ষণ থামল—যেন কি স্মরণ করে নিল।

সুশান্ত আগের মতনই নির্জীব, নিস্তব্ধ।

আমায় তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী—আই মিন প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নেবার অবশ্য প্রচুর কারণ ছিল। তবু আমি বলব, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না। অর্চনার মন রাখবার জন্যে তুমি আমারও সামনাসামনি কোনদিন কিছু বলতে পারো নি। ফলে, আমি সে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমার ওপর আব্দার করেছি অনেক। আমি জানতুম সুশান্ত, তুমি সে-সমস্ত আব্দারকে অত্যাচার হিসেবেই গ্রহণ করতে। তবু আমি তা কোনদিন গ্রাহ্য করি নি। করি নি—কারণ, তোমার কাছে যে টাকা নিতুম, সে টাকার ওপর আমারও অধিকার ছিল।

গৌতম এক মুহূর্ত থেমে যেন ভীষণ জরুরী একটা কথা মনে করে নিল। বললে, অর্চনাকে আমি আটকাতে পারতুম না, সুশান্ত! শেষ পর্যন্ত তুমিই তাকে জয় করে

নিতে। কেন যে তোমার মতিভ্রম হল, আমি ভেবে পাই না, সুশান্ত! কোন মেয়েকে কি জোর করে নিজের করে নেওয়া যায় না, কেউ তা নিতে পেরেছে? তুমি এত বুদ্ধিমান হয়েও সে কথা বুঝতে পারলে না। তুমি চিত্রশিল্পী—তোমার রুচি আছে, অনুভূতি আছে, সহানুভূতিও আছে—তবু তুমি শেষ পর্যন্ত পশু হয়ে গেলে। আমার ওপর হিংসে তোমার দিন দিন বেড়ে অবশেষে এমন একটা অবস্থায় দাঁড়াল, যখন আমায় এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে না দিতে পারলে তোমার আর চলছিল না! সে চেষ্টা তো তুমি করেছ!

সুশান্ত বাধা দিতে গেল।

গৌতম সে বাধা গ্রাহ্য না করে বলে চলল, অর্চনা যদি বাধা না দিত, এক বসন্তের সকালে আমারই ঘরের বিছানায় আমার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেত। সে মৃত্যু হত অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজভাবে। কেউ সামান্য মাত্র সন্দেহ করত না—তুমি সুশান্ত, শহরের একজন সেরা ভদ্রসন্তান, আসলে একজন খুনী। বাস্তবিক সুশান্ত, আমার সৌভাগ্য আর তোমার দুর্ভাগ্য—আমার রোগশয্যার পাশে তুমি যখন বন্ধুকে সেবা করবার অজুহাতে বসেছিলে, আর সুযোগ খুঁজেছিলে কোন্ ফাঁকে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবার, তখন অর্চনা ঘরে ঢুকে তোমায় তাড়াতাড়ি একবার বাইরে আসতে বলে। তোমার হাতে তখন যে বিষ-মেশানো পাউডারটা ছিল, তা মাটিতে পড়ে যায়। অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়ায় এমনটা হয়েছিল। আরও মজা, হাত থেকে যা পড়ে গেল, তা কুড়িয়ে নেবার সাহসও তোমার হল না তখন। তুমি বাইরে বেরিয়ে গেলে। মুখ-চোখ ভয়ে-ভাবনায় তখন তোমার বিবর্ণ—বিশ্রী হয়ে গেছে। আমি তা লক্ষ্য করেছিলুম। আরও লক্ষ্য করেছিলুম তোমার হাত থেকে পড়ে-যাওয়া সেই পাউডারের পুরিয়াটা। তুমি চলে যাবার পর আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। মাটি থেকে পুরিয়াটা কুড়িয়ে নিলাম। রাখলাম আমার বালিশের তলায় লুকিয়ে। মিট-সেফে আমার আসল ওষুধের পুরিয়াগুলো ছিল। দেখলুম, সেগুলো প্রত্যেকটা হলদে রঙের কাগজে মোড়া—তোমারটা ছিল সাদা। যাক, আমি তাড়াতাড়ি একটা সাদা কাগজে আমার ওষুধ ঢেলে আবার তা মাটিতে ফেলে রাখলাম। খানিক পরে তোমরা যখন ঘরে এলে, আমি নিজে থেকেই বললুম, কি সুশান্ত, ওষুধ খাওয়াতে খাওয়াতে যে উধাও হলে! দাও পাউডারটা, পেটে আবার পেনটা বেড়েছে...তুমি আগের মত নার্ভাস অবস্থাতেই একবার কি যেন ভেবে অর্চনাকে ওষুধ দিতে বললে। তারপর তোমার মনে আছে, তুমি কি করলে?

সুশান্ত চুপ করে থাকল—কোন উত্তর দিল না।

তুমি প্রথমে যেন অজান্তেই জুতো দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে থাকা পুরিয়াটা মাড়ালে। তারপর অত্যন্ত সচকিত হয়ে সেটা তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। জুতো সমেত মাড়িয়ে ফেলেছ, তাই ওটা আর খাওয়া উচিত নয়—এইরকম একটা কথা বলে সেই পুরিয়াটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে। বাস্তবিক সুশান্ত, তোমার তখনকার উপস্থিত-বুদ্ধি প্রশংসনীয়!

গৌতম আবার থামল খানিকক্ষণের জন্যে।

রাত গভীর হয়ে উঠেছে। আকাশের বুকে মেঘ জমছে একটু একটু করে। হারিয়ে যাচ্ছে তারার আলো। ঘন হয়ে উঠছে অন্ধকার—কালো মিশমিশে অন্ধকার। একটানা

হওয়ার শব্দ, আর নিচে থেকে স্রোত বয়ে যাওয়ার ক্ষীণ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। সুশান্ত যেন পাথর হয়ে গেছে। তার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোয় না—সামান্য একটা শব্দও। শুধু কখনও কখনও দীর্ঘনিশ্বাসের একটা সাপ-চলার মত শব্দ গৌতমের কানে বাজে।

সেদিন থেকেই—গৌতম বললে, সেদিন থেকেই আমি তোমায় সন্দেহ করতে শুরু করি, সুশান্ত। সে পাউডারের পুরিয়াটা আমি পরে পরীক্ষা করাই। তার মধ্যে কাচের গুঁড়োর সঙ্গে মেশানো ছিল নিকোটিন।...যাক, অর্চনাকে সে বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ জানাই নি। জানালে যে কী ভীষণ আঘাত পেত সে, তা শুধু আমি জানি। এ ঘটনার পর আমি স্পষ্টই বুঝলাম—আমি যদি অর্চনার কাছ থেকে না চলে যাই, তোমার জীবনের বাঁকা পথ আর কোনদিন সোজা হবে না। বিশ্বাস কর, সুশান্ত—আমি এ ঘটনার পর আবার শহর ছেড়ে উধাও হয়ে যেতেই চেয়েছিলাম। আরও চেয়েছিলাম, অর্চনা যেন আমায় অন্তত ভুল বুঝেও তোমার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাকে আশ্রয় দেবার জন্যেই একদিন এ শহরে এসেছিলুম। কিন্তু যখন বুঝলাম, আমার দেওয়া আশ্রয় না হলেও তার কপালে আরও ভাল আশ্রয় জুটবে, তখন নিজেকে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য পথ কি খোলা থাকতে পারে?

গৌতম আবার থামল, বলল, একটা সিগারেট খাওয়াবে?

সুশান্ত সিগারেট দিল। সিগারেট জ্বালাবার সময় যেটুকু আলো জ্বলল, সেইটুকু আলোতেই গৌতম দেখল, সুশান্ত একচাপ বরফের মত সাদা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শোন!-গৌতম বলে চলল।—তার হাতের সিগারেটের আগুন জ্বলতে লাগল জোনাকির মতন—কুন্তলাকে চেনো? এ শহরের সেরা ফ্লার্ট। তাকে গিয়ে পাকড়াও করলাম। কুন্তলা আমার কাছে নানা ভাবে উপকৃত। কুন্তলাকে বললাম, আমার সঙ্গে তাকে কিছুদিন ফ্লার্ট করতে হবে। কেন, তা বলিনি। শুধু বলেছিলাম, না করলে তাকে বিপদে ফেলব। কুন্তলা রাজী হল। অর্চনার চোখের সামনে কুন্তলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালাম একটু একটু করে—যেন অর্চনা অহেতুক অন্য কোন সন্দেহ না করে বসে। কুন্তলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন গভীর হল, অর্চনা আমায় বললে আমি কেন জেনে-শুনে অমন ধরনের একটা মেয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়াচ্ছি! আমি বললুম, কুন্তলা বাইরে যা, ভেতরে তা নয়। অর্চনা আমার ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল। আমি তার সেই বিস্ময়বোধের সুযোগ নিয়ে বললুম, দেখ অর্চনা, সুশান্তকে ছেড়ে আমার ঘরে তুমি আসবে, এ বিশ্বাস আমি আর করি না। কুন্তলাই আমার ভাল—তাকে সঙ্গে করে আজ রাত্রেই আমি এখান থেকে চলে যাব।...আমার কথায় অর্চনা আঘাত পেল—গভীর আঘাত। কান্নাকাটি করলে। বললে, আমি যেন তাকে ভুল বুঝে না চলে যাই। সে এ শহরে আমার জন্যেই এসেছিল, আমার সাহায্যেই তার অতীত-জীবন গড়ে উঠেছে। প্রয়োজন হলে সে সব কিছুর বিনিময়ে আমার জন্যেই তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আমার হাতে তুলে দেবে। অর্চনা তা দিত, আমি জানতাম। কিন্তু সুশান্ত, যাকে আমি ভালবাসি, তাকে অমন ভাবে গ্রহণ করতে আমার সত্যিই খুব আপত্তি ছিল। আশ্চর্য মানুষের মন! অর্চনা আমায় শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। এ শহরে সে আসে আমারই জন্যে—একসময় আমার ঘরেই আশ্রয় নেবে বলে। কিন্তু কি করে আমি তোমায় বোঝাই, আমার ওপর তার শ্রদ্ধা থাকলেও সে ভালবাসা আর ছিল না—যাতে আমরা বিয়ে করে সংসার পাততে পারি। অর্চনা নিজেও তা বুঝেছিল। আর পাছে আমিও তা বুঝতে পারি, তাই আমার সঙ্গে তার ব্যবহারে, কথাবার্তায় সব সময়ে নিজের নতুন-মনকে চাপা দিতে চাইত। যেন আগের মতই সে আমায় ভালবাসে—বরং আরও বেশি। তুমি যেন তার কাছে তেমন কিছু নও।...

অর্চনার কান্নাকাটি দেখে আমি আমার কর্তব্য ভুলি নি। তাই তাকে বললুম, সে যদি সত্যিই আজও আমায় আগের মত ভালবাসে, তাহলে যেন আজই রাত্রে বাঁধের ব্রীজ শেষ হয়ে যেখানে তেঁতুলগাছটা নুয়ে রয়েছে, সেখানে একটা পাথরের ওপর বসে অপেক্ষা করে রাত দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত।

আমি জানতুম অর্চনা যাবেই। আর গিয়ে দেখবে, যদিও আমি একলা সেই পাথরের ওপর বসে রয়েছি, তবু একটু আড়ালে রয়েছে বিশ্রস্তবাসা কুন্তলা। অর্চনা যখন আমার সঙ্গে কথা বলবে, আমি তখন নেশায় বিহ্বল এবং তার হাত ধরে আবার সেই পুরোন দিনের মতন প্রেম নিবেদন করব। ইতোমধ্যে আড়ালে ফুঁপিয়ে উঠবে কুন্তলা। অর্চনা প্রথমে ভয় পাবে; তারপর অবাক হবে। সবশেষে কৌতূহল বশে যখন দেখতে যাবে, তখন বুঝবে, কুন্তলার সান্নিধ্যে আমি এতক্ষণ মেতে ছিলাম—অর্চনার সাড়া পেয়ে তাকে সরিয়ে দিয়েছি। বুঝতেই পারছ, অর্চনার মনের ভাব তখন কি রকম হবে? হয়তো নয়, সেই হবে তার আমার মধ্যে শেষ সাক্ষাৎ—ইহজীবনের মত শেষ চাওয়া-চাওয়ি।...

অর্চনা রাত্রে যেতে রাজী হল।...হ্যাঁ, ইতোমধ্যে কেমন করে না জানি, তুমি জানতে পেরেছিলে, অর্চনা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে রাত্রে।...না, ঠিক হল না কথাটা। তুমি অনুমান করেছিলে, অর্চনা সেইদিন রাত্রেই আমার সঙ্গে এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তোমার এ অনুমান এতদিনকার রুদ্ধ আক্রোশকে ভয়ঙ্কর করে তুলল। অর্চনা যখন একান্তই তোমার হল না, সে আর কারুর হবে না—হতে পারবে না। কি অদ্ভুত তোমার এই ভালবাসা, সুশান্ত! তোমার ভালবাসা অস্থির, উত্তপ্ত, বর্বর! সে শুধু চাইতে জানে—সে যা নিজের বলে মনে করে, তার ওপর হয় তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, না-হয় নিশ্চিহ্ন করে দেবে সব। বর্বর ছাড়া এ ভালবাসাকে আমি কিই-বা বলতে পারি!

যাক, শোন। অর্চনাকে তো আমি আসতে বললুম। কিন্তু যে পরিকল্পনা আগে করেছিলুম, তা যেন অত্যন্ত নীচ বলে মনে হল শেষে। এরকম প্রতারণা—জঘন্য অভিনয় করে অর্চনার কাছে বিদায় নিতে বাধল। আমার স্মৃতি বলতে সারা জীবন তার শুধু অশ্রদ্ধাই থাকবে, এ কল্পনা আমায় পাগল করে তুলল। না, যা তাকে বলেছি, তা হয় না—হতে পারে না। চলে আমি নিশ্চয়ই যাব; কিন্তু খোলাখুলি অর্চনাকে বুঝিয়ে দিয়ে তার পর। তাই সেই রাত্রে অর্চনা যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে সোজা পথ ধরল, আমি তার পিছু নিলাম। বাঁধের ব্রীজের মুখে ডাকলুম তাকে—তার নাম ধরে। তারপর ঠিক এইখানে—এইখানে, যেখানে আজ তুমি আর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, ঠিক এইখানে আমি আর অর্চনা দাঁড়ালুম। সেদিন কিন্তু আজকের মত আকাশ ভরে

অন্ধকারের কালি ঢালা ছিল না। সেদিন ছিল চাঁদের আলোর বান। ধবধবে আলোর সমস্ত বাঁধ, মাঠ, ব্রীজ, দুরের ওই মল্লারবাগের শিবমন্দির ঝক্ঝকে করছিল। কি সুন্দর সেই রাত, তা তুমি অনুভব করতে পারবে না!

আমরা এখানে দাঁড়ালুম। নির্জন, শান্ত, স্তব্ধ এই ব্রীজের ওপর অর্চনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে পড়ল, তার জন্যে আনা বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকার কথা। আশ্চর্য, অতীতে একদিন ওই বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকাকে কেন্দ্র করেই তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। আজ যাবার দিন ওর জন্যে তাই এনেছিলুম, ওর অতি প্রিয় আমাদের প্রথম পরিচয়ের সেই ফুলটিকে। বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকা দিলাম তার হাতে। সে নীরবে হেসে ফুলের বুকে মৃদু চুম্বন ছোঁয়াল।...

তারপর—তারপর আমি অর্চনার একটি হাত ধরে বলে গেলাম সব। এ শহরে আমি যার জন্যে এসেছিলাম, আজ সে উদ্দেশ্য আর নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা—কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম, সে কথাটা আজ তোমার জেনে রাখা উচিত। আমার মার মৃত্যুশয্যায় আমি শপথ গ্রহণ করেছিলামঃ যে লম্পট ভদ্রলোকটি তাঁকে সংসার থেকে পথে এনে একটি সন্তান উপহার দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন আজীবনের মতন—আমি তার প্রতিশোধ নেব। আমার মা এ শহরেরই মেয়ে। সতেরো বছর বয়সে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। তিনি ছিলেন শিক্ষিতা এবং সংস্কারবর্জিতা। তাই এই শহরেরই আর একজন গণ্যমান্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অর্থশালী ভদ্রলোক যখন মাকে আমার লোভ দেখালেন, তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিধবা-বিয়ে করবেন—মা পরিপূর্ণ বিশ্বাসে তাঁর সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। এখানে একটু অসুবিধে ছিল—ভদ্রলোকের বাবা-মা বর্তমান এবং তাঁরা বিধবা-বিয়েতে রাজী হবেন না, এ কথাই ভদ্রলোক মাকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু একবার বাইরে গিয়ে যদি বিয়েটা হয়ে যায়, পরে একমাত্র সন্তানের হঠকারিতাকে তাঁরা গ্রহণ করবেন—এ ভরসা ভদ্রলোক দিয়েছিলেন। মা বেশির ভাগ মেয়ের মত সরল বিশ্বাসে ঘর ছাড়লেন গোপনে। কিন্তু পরে বুঝলেন, তিনি ভুল—এমন ভুল করেছেন, যার আর সংশোধনের উপায় নেই। কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে অভিশাপ সম্বল করে আমার জন্ম হল।

বেড়ে উঠলাম ধীরে ধীরে।...

মা কোনরকমে একটু ভদ্রসমাজে আশ্রয় নিলেন নাম বদলে সমস্ত গোপন করে। আমি বিদ্যাশিক্ষা পেলাম, পেলাম মার অকৃপণ স্নেহ। তারপর এল অর্চনা। মা যখন মারা গেলেন, তখন আমায় বলে গেলেন সব কথা। আর আমিও শপথ করলাম, এ বর্বরতার প্রতিশোধ আমি নেবই।

এলাম এ শহরে! দেখলাম, সে ভদ্রলোক অনেকদিন হল মারা গেছেন। তাঁদের বাড়িতে একটি মাত্র বংশধর জীবিত—ভদ্রলোকের একটি মাত্র সমাজ-স্বীকৃত সন্তান। তা হোক, আর কিছু না পারি, সেই সমাজ-স্বীকৃত সন্তানটিকে যেমন করে হোক জীবনের সর্বদিক দিয়ে বঞ্চিত করে যেতে হবে—এই হল আমার উদ্দেশ্য। ডেকে পাঠালাম অর্চনাকে। অর্চনার সঙ্গে আমার কথা ছিল—যতদিন না মার মৃত্যুশয্যায় গ্রহণ করা শপথ আমি পালন করি, ততদিন আমরা পরস্পরকে বিয়ে করব না। অর্চনাকে

আনলাম এ শহরে, কেননা, অর্চনাকে চোখের সামনে না রাখলে আমি হয়তো পশুর চেয়েও হীনতম কিছু করতে পারি প্রতিশোধ নেবার জন্যে। তা ছাড়া, প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে অর্চনারও সাহায্য আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।...

দিন কেটে যায়। ক্রমশই আমি আমার শপথ ভুলতে বসি। ভাবি, অপরাধ করল একজন—তার জন্যে অপরজনকে শাস্তি দিই কোন অধিকারে। অর্চনাও শেষে সেই কথা বলতে লাগল। তা ছাড়া, অর্চনা যে তাকে—

গৌতম মুখের পিছলে-যাওয়া কথাটা আটকে নিল। একটু থেমে বলল, হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সেই চাঁদের আলো-ভরা রাত্রে এই ঠিক এমনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অর্চনাকে আবার সব বললাম, বুঝোলাম। অর্চনাও বুঝল, আমাকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তার অন্য কোন পথ নেই। অর্চনা বুদ্ধিমতী—সে আমায় বিদায় দিল। আমি চোখের জল মুছিয়ে সেই বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকার যেখানে অর্চনা তার চুম্বনের স্পর্শ রেখেছে, সেখানে নিজের প্রথম ও শেষ চুম্বনের স্পর্শ দিয়ে বিদায় নিলাম। অর্চনা বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকা সম্বল করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর—

গৌতম অকস্মাৎ থেমে গেল।

কি তারপর? সুশান্ত এতক্ষণ বাদে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রশ্ন করল।

তারপর যা, তা তুমি জানো, আমি জানি না।—গৌতম বললে।

আমি? না, না—আমি কিছু জানি না।—সুশান্তর স্বরে আর্ততা।

আর কেন, সুশান্ত! আমি জানি—ভাল করেই জানি, তারপর কি করে তুমি অর্চনাকে হত্যা করলে, তা তুমি বলবে।

আমি অর্চনাকে হত্যা করেছি?

সুশান্ত!—গৌতমের স্বরের কঠিনতা সুশান্তকে বিচলিত করলে।

সুশান্ত বললে, অনেক পরেঃ আমি অর্চনাকে খুন করেছি, তার প্রমাণ কই?

তুমি আরও প্রমাণ চাও? ভেবে দেখ, কে গত সপ্তাহে অর্চনাকে পথে দেখে মেতে ওঠে, আর আজকেও তো তাকে দেখে পিছু ধাওয়া করেছিলে!

সুশান্ত চমকে উঠল। ভীত গলায় বললে, তুমি কি করে জানলে?

আমি জানব না তো কে জানবে?—গৌতম হাসল, আমি শুধু সন্দেহই তোমায় করি নি, সুশান্ত—সন্দেহকে সত্য প্রমাণিত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

সুশান্ত এবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, অর্চনা বেঁচে আছে?

—না।

তাহলে তোমার প্রমাণ কই? আজ আমায় হাতের মুঠোয় পেয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো, গৌতম। কিন্তু তোমার মন-গড়া সন্দেহের বশে আমায় খুনী বলে ঠাওরানো কি ঠিক হবে?—সুশান্ত খুব সংযত গলায় বললে।

আমাকে যখন বিষ দিয়ে মারবার চেষ্টা কর, গৌতম বললে, তার সব প্রমাণই আছে। আর অর্চনাকে যে তুমি হত্যা করেছ, তার সবার বড় প্রমাণ পুলিশের লোকের কাছে তুমি যে বিবৃতি দিয়েছ, তাতে বলেছ, অর্চনাকে তুমি শেষ দেখ তোমার বাড়িতে—রাত প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ। কিন্তু তুমি হয়তো জানো না, সুশান্ত—আমি

সেদিন সন্ধে থেকে সর্বক্ষণ অর্চনার পিছু ধাওয়া করেছি। সে যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে যায়, তুমি তার সঙ্গে দেখা কর নি। বারান্দায় উঠেই অর্চনা তোমার চাকরের সঙ্গে কথা বলে নেমে আসে। তোমার চাকর তাকে জানায়, তুমি ভীষণ অসুস্থ—কারুর সঙ্গে দেখা করবে না; নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছো।

বেশ, তাই হল, তাতে কি? আমি জানলা দিয়ে দেখেছি অর্চনাকে।

সে কথা তো তুমি বল নি, পুলিসের কাছে! তুমি বলেছ, তুমি তাকে তোমার বাড়িতে দেখেছ। সে সময়ে তার গায়ে ছিল একটা কমলালেবু রঙের শাড়ি, আর হাতে ছিল একটা বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকা। বল নি সে কথা!

হ্যাঁ, বলেছি।

কিন্তু তুমি জানো, সুশান্ত—অর্চনাকে তুমি দেখ নি; অথচ তাকে দেখেছ, এ কথা না বললেও তোমার চলে না। কারণ, তুমি সব সময় এটুকু প্রমাণ রাখতে চাও যে, তোমার দেখার পরও অর্চনাকে জীবিত অবস্থায় আর কেউ দেখেছে। আমি তাকে তোমার পরে দেখেছি এবং ফুল সমেত দেখেছি—এ কথা পুলিশের কাছে আমিও বলেছি। এর থেকে অন্তত এটুকু প্রমাণিত হবে, তোমার দেখার পর তবে আমি অর্চনাকে দেখেছি এবং অর্চনা জীবিত ছিল। নয় কি?

নিশ্চয়ই!—সুশান্ত জোর দিয়ে কথা বললে।

আমিও তাই বলি। তবে কি জানো, তোমার এই একটি মাত্র কথা থেকেই আমি বুঝতে পারি, অর্চনাকে আমি দেখে আসার পর তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই তার দেখা হয়েছে। না হলে যে বাসন্তী রঙের চন্দ্রমল্লিকা আমি দিয়ে এলাম অর্চনাকে বিদায় জানাবার সময়, তুমি সে ফুল কি করে আগে থাকতেই দেখলে তার হাতে?

সুশান্ত যেন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা বৈদ্যুতিক শক্ খেলে। তার বিহ্বল আর্তস্বর শোনা গেল।

খানিক অপেক্ষা করে গৌতম বললে, আর দেরি করো না। যা তোমার বলবার আছে, বল। মরার আগে কনফেসন করার গৌরব বাদ দিয়ে আর লাভ কি।

সুশান্তকে অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা না গেলেও গৌতম বুঝল, সুশান্ত নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে।

অনেক—অনেক পরে সুশান্ত বললে, স্বীকার করলাম। বেশি কিছু আমার বলবার নেই। যতটুকু বলবার আছে, তা এখানে নয়—গাড়িতে বসেই বলব।

মানে?

আমি ওই গাড়িতেই অর্চনাকে খুন করি। ওর মধ্যে গিয়ে না বসলে সে কথা তোমায় বোঝাতে পারব না।

সুশান্তর কথায় গৌতম কি যেন ভাবল খানিকটা, তারপর বলল, বেশ, চল।

একটু হেঁটে ব্রীজের গোড়ায় গাড়িতে এসে বসল সুশান্ত আর গৌতম। সুশান্ত স্টিয়ারিংএ হাত রাখল। পাশে বসে থাকল গৌতম।

বল।—গৌতম তাগাদা দিল।

বলছি।—সুশান্ত এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, একটা কথা বলব—বিশ্বাস করবে?

কি?

আমার ভীষণ ভয় করছে। গাড়িটায় স্টার্ট দিয়ে রাখব। তবু খানিকটা শব্দ হবে। না—না, বিশ্বাস করো, যদি ব্রীজের ওপারে গাড়ি এগিয়ে যায়, তুমি আমায় গুলি কোরো। তাতে তো তোমায় কেউ বাধা দেবে না।—সুশান্ত মিনতি জানাল।

বেশ—রাজী হল গৌতম।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে তা মৃদু করে সুশান্ত বললে, তুমি যা বলেছ, সবই ঠিক। অর্চনাকে আমি ভালবাসতাম। সে ভালবাসা তীব্র—তোমার ভাষায়, বর্বর। তাই তাকে যখন পেলাম না, ভাবলাম, নাই যখন পেলাম, তখন তুমিও যাতে তাকে না পাও, সে ব্যবস্থা আমি করব। সেদিন রাত্রে তোমরা পালিয়ে যাবে সন্দেহ হওয়ায় অর্চনাকে রাস্তার মধ্যে আটক করে মারবার ফন্দি করি। উল্টো রাস্তা দিয়ে মোটর নিয়ে এসে আমি অপেক্ষা করছিলাম। তোমার সঙ্গে অর্চনার দেখা হবার পর তুমি ফিরে গেছ, তা আমি জানতুম না। আমি ভেবেছিলাম, অর্চনা বুঝি ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অর্চনা একলা দাঁড়িয়েছিল। আমি গিয়ে তাকে ডাকতেই সে শিউরে উঠল। দেখলাম তার হাতে সেই চন্দ্রমল্লিকা—ঠোঁটের কাছে ধরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাকে টেনে আনলাম এই গাড়িতে। তারপর বালিশ চেপে ধরলাম তার মুখে—যতক্ষণ না দমবন্ধ হয়ে অর্চনা নেতিয়ে পড়ল, নিস্পন্দ হয়ে গেল। তারপর আর কি! তার দেহটা টেনে এনে ছুঁড়ে দিলাম জলে।

সুশান্ত সহজভাবে তার কথা শেষ করল।

এর পর দুজনেই নিস্তব্ধ—দুজনে দুজনের মনকে ভাবছে।

অনেকক্ষণ পরে গৌতম বললে, অর্চনাকে হত্যা করার জন্যে তুমি অনুতপ্ত নও?

খুব বেশি। মাঝে মাঝে ভাবি, এ কাজ না করে আমি যদি নিজে আত্মহত্যা করতুম—ভাল হত।

হয়তো সত্যিই তাই ভাল হত।—গৌতম বললে।

সুশান্ত সে কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ বললে, তোমার সেই অমানুষ বাবার নামটা কি, বললে না তো?

জেনে লাভ?—গৌতম ক্লান্ত সুরে বলল।

লোকসানই বা কি! সব লাভ-লোকসানের পালাই তো আজ আমরা চুকিয়ে দেব। বল—তোমার সেই অমানুষ বাবার নামটা বল।—সুশান্ত বললে।

স্টার্টের শব্দ একটু দ্রুত আর জোর হল।

একান্তই জানতে চাও?

হ্যাঁ।

অতুলপ্রসাদ মিত্র।

সুশান্ত নাম শুনে একটুও চমকাল না—যেন এটাই সে আশা করছিল। বললে, ব্যাপারটা অস্পষ্ট আভাসে আমি শুনেছি আগে; কিন্তু তুমি যে আমার সেই লম্পট বাবার

ছেলে, তা জানতাম না—জানলুম। তোমার মাকে আমি দেখি নি—তাঁর কাছে আজ বাবার হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি, তোমার কাছেও।

সুশান্ত গাড়ির স্টার্ট আরও একটু বাড়িয়ে দিল। বললে, জীবনে আমাদের আর কিছু চাইবার আছে, গৌতম?

না।—ভাঙা সুরে গৌতম বললে।

চল, তাহলে একটু ঘুরে আসি।

কোথায়?

এই তো, এখানে—

সুশান্ত তার কথা শেষ করল না। ধীরে ধীরে কখন ক্লাচ টিপে গিয়ার খুলে দিয়েছে। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা বিদ্যুৎ-গতিতে এগিয়ে গেল।

সুশান্তর মুখ দেখতে না পেলেও গৌতম একটা হাত রাখল সুশান্তর গলায়।

সুশান্ত স্টিয়ারিং বেঁকিয়ে দিল। চোখের পলকে ব্রীজের কাঠের রেলিং ভেঙে টু-সিটার গাড়িখানা নিচে বাঁধের জলে ছিটকে পড়ল।



নৃমুণ্ডশিকারী

অদ্রীশ বর্ধন

ভাবছি কোনখান থেকে শুরু করব এই কাহিনী।

আমার বন্ধু ইন্দ্রনাথ রুদ্রের বহু কাহিনীই আমি লিখেছি, লিখেছি নিছক মনের তাগিদে, বন্ধুবরের অত্যাশ্চর্য কীর্তিকলাপ জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করার অদম্য বাসনায়।

কিন্তু কোনদিন এমন দ্বিধায়, এমন দোটানায় পড়ি নি।

অথচ কোন মামলাটাই কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। শূন্য কলসী, মোমের হাত বা সবুজ কাঁকড়া নিয়ে ইন্দ্রনাথ রুদ্র যতখানি মস্তিষ্কশক্তি ব্যয় করেছে, তার শতাংশের একাংশও আমাকে ব্যয় করতে হয় নি চাঞ্চল্যকর সেই কেসগুলি গল্পাকারে লিখে ফেলার সময়ে।

কিন্তু এবার আমাকে ভাবতে হচ্ছে।

ভাববার কারণও আছে।

কেননা, ঐ কাহিনীর আদি অন্তে মধ্যে সমান বিভীষিকা, সমান বিস্ময়, সমান বৈচিত্র্য। এ কাহিনী শুধু ইন্দ্রনাথ রুদ্রের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাকীর্তিই নয়, মানুষের বিকৃতাচারের এক বীভৎস নিদর্শন, ভয়াবহ নমুনা।

তাই ভাবতে হচ্ছে এ কাহিনীর ছত্রে ছত্রে যে লোকহর্ষক তথ্যাদির উদ্‌ঘাটন, তাই দিয়েই গল্প শুরু করব, না কুন্তলার অবৈধ প্রেমের কেচ্ছা এঁকে প্রচ্ছদ সৃষ্টি করব।

থাক। তার চাইতে বরং শুরু করা যাক ঠিক যেমনটি ঘটেছিল সেইভাবেই।

চোখ বুজলেই সিনেমার দৃশ্যের মত স্পষ্ট ছবিটা ভেসে ওঠে মনের পটে।

তুমুল বৃষ্টি নেমেছিল সে-রাতে।

রাঁচি শহরের বৃষ্টি। শহরের চারিদিকে ধু-ধু প্রান্তরের ওপর দিয়ে হুহুঙ্কার রবে ধেয়ে আসছিল দামাল বাতাস। আর মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের চাবুক হেঁকে কালো আকাশ ফালা ফালা করে দিয়ে গুরগুর করে প্রলয় উল্লাসে অট্টহাসি হাসছিল দুরন্ত প্রকৃতি।

সারারাত চলেছিল এই দাপাদাপি।

ভোরবেলা মিলিয়ে গিয়েছিল ক্ষ্যাপা মেঘ, জল আর বাতাস। আমরাও প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলাম।

আমরা মানে ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আমি আর আমার গৃহিণী কবিতা।

নিশ্চিন্ত বিশ্রামসুখ উপভোগ করার জন্যেই রাঁচিতে এসেছিলাম আমরা তিনজনে। বেরিয়েছিলাম পুজোর হট্টগোল শুরু হওয়ার আগেই মহাপঞ্চমীর রাত্রে।

ষষ্ঠীর দিন আর বেরোতে পারি নি। সারাদিনটা ট্রেন জার্নির ধকল কাটাতে স্রেফ বিছানায় গড়িয়েছি আর আলসেমি করেছি।

রাত্রে নেমেছে তুমুল বৃষ্টি।

পরের দিন ভোরবেলা বেরিয়েছি বেড়াতে।

সেদিন ছিল মহাসপ্তমী।

আর সেইদিনই দেখলাম সেই বীভৎস দৃশ্য, জানলাম সেই ভয়াবহ কাহিনী, শুনলাম সেই ভয়ঙ্কর রহস্য—যা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শিহরিত করেছে রাঁচিবাসীদের। আশপাশের গ্রাম গ্রামান্তরের অধিবাসীদের আতঙ্কিত করেছে, নিশার নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে। সন্ধ্যা না নামতেই নিঝুম নিস্তব্ধ জনবিরল হয়ে এসেছে পথ-ঘাট মাঠ-প্রান্তর গ্রাম-শহর।

তবুও বিভীষিকার শেষ হয় নি। রহস্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা সারারাত দরজার হুড়কো এঁটে প্রদীপ নিভিয়ে ভগবানকে ডেকেছে, পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরেছে, কাগজে কাগজে লেখালেখি হয়েছে।

কিন্তু তথাপি মেটে নি শিশুমুণ্ড সঞ্চয়ের লালসা। বন্ধ হয় নি শিশুহত্যা। রাতের পর রাত, মাসের পর মাস চলেছে এই একই বীভৎস ব্যাপার।

অথচ এত কাণ্ডের আমরা কিছুই জানতাম না। ফুরফুরে হাওয়ায় হাল্কা মনে বেড়াতে বেরিয়েছি ভোর হতেই।

কবিতা পরেছে লাইলাক রঙের একটা ছাপা শাড়ি। কানে পাতলা রিং। গজদন্তের মত শুভ্র নিটোল মুখে চন্দন পাউডারের মোলায়েম প্রলেপ। রূপকথার কেশবতী রাজকন্যার মত সুন্দর কুঞ্চিত চুলের গোছা যা হোক করে পেছনে টেনে খোঁপা বাঁধা।

রুপসজ্জায় ইদানীং আর নিষ্ঠা নেই কবিতার। নেই ইন্দ্রনাথের বাক্যবাণের জ্বালায়। কিন্তু নিজের গিন্নী বলে বলছি না, সুন্দরী মেয়েদের প্রসাধনের প্রয়োজন হয় না। পরিচ্ছন্নতাই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রসাধন—যেমন হয়েছে কবিতার ক্ষেত্রে।

ভোরের তাজা হাওয়ায় স্থলপদ্মের মত সুন্দর স্বচ্ছ সেই মুখখানি দেখে প্রাগ-বিবাহ উন্মাদনা যেন আবার জোয়ারের মত ঠেলে উঠল বুকের মধ্যে; তাই গদগদ কণ্ঠে বলেছিলাম, বুঝলে কবি, বৌ মাত্রই ম্যাজিশিয়ান। তারা যে কোন বরকে মানুষ করে তুলতে পারে।

সিঁদুরের টিপ-আঁকা কপালটা সামান্য কুঁচকে অপাঙ্গে তাকিয়ে কবিতা বললে, ব্যাপারটা কি? আমি তো জানতাম বয়ঃসন্ধিকালেই ছেলেদের গলার স্বর পাল্টায়। তা এই বয়েসে স্বরটা হঠাৎ ওরকম দইয়ের মত থকথকে হয়ে যাওয়ার মানে?

গলা খাঁকারি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রনাথ বললে, অহো, অহো, ভোর না হইতেই শুরু হইয়াছে দাম্পত্যকলহ!

মুখ রাঙা করে কবিতা বললে, ইয়ার্কি হচ্ছে? আইবুড়োই তো রয়ে গেলে। নইলে দেখা যেত—

হে বৌদি, করজোড়ে তৎক্ষণাৎ জবাবটা ছুঁড়ে দিল ইন্দ্রনাথ, বিবাহ সত্যিই করি নাই এখনো, এবং করি নাই বলিয়াই এখনো আমি জীবিত।

ধারে-কাছে কাটা মুণ্ডটির কোন চিহ্ন পেলাম না। দেখবার মেজাজও ছিল না।

কেননা, কল্পনাতীত ভয়াবহ এই দৃশ্য দেখে কিরকম যেন হয়ে গিয়েছিল কবিতা। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল সমস্ত মুখ, আতঙ্ক নিবিড় হয়ে উঠেছিল দুই চোখে।

মনে হল যেন এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে কবিতা। জানি খুনজখমের কাহিনী তার প্রিয় বস্তু, কিন্তু খুনজখমকে চোখে দেখার ধাত তার নেই। অনেকেরই থাকে না।

ইন্দ্রনাথও বুঝেছিল কবিতার অবস্থা। তাই বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ কবিতাকে ধরে পেছন ফিরিয়ে দিল ও। বলল, চলো।

রামদাস আগারওয়ালা স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি। পরিপুষ্ট গোঁফ এবং মাথাজোড়া টাক। পরনে সদাই খাকি হাফপ্যান্ট ও হাফশার্ট। অভ্যেসের মধ্যে কথায় কথায় গোঁফে তা দেওয়া।

তার কামরায় বসেই শুনলাম সমস্ত ঘটনাটা।

শুনতে শুনতেই কতবার যে রোমাঞ্চিত হলাম আমি, তার ইয়ত্তা নেই।

রামদাসের সঙ্গে আগে আমাদের আলাপ ছিল না। কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্রর পরিচয় পেতেই চক্ষের নিমেষে তিনি আমাদের আপন জন করে নিলেন। এবং বললেন সেই লোমহর্ষক কাহিনী।

মাসখানেক ধরে চলেছে এই কাণ্ড। চলছে বিরামবিহীন ভাবে। প্রায় প্রতি রাত্রেই খবর আসছে—কখনো এ-গ্রাম, কখনো সে গ্রাম, কখনো-বা রাঁচি শহর থেকেই।

প্রতি রাত্রেই নিভে যাচ্ছে এক-একজন হতভাগ্যের জীবন-প্রদীপ। সেই সঙ্গে উধাও হয়ে যাচ্ছে তার মুণ্ড।

যাদের মুন্ড এইভাবে দেহচ্যুত হচ্ছে, লক্ষণীয় হচ্ছে যে, তারা সকলেই শিশু অথবা বালক।

বয়স্ক কেউ নেই। নারীও নেই।

সভয়ে বললাম, বাপরে, এ যে জ্যাক দি রিপারের টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী এডিশন।

রামদাস বললেন, জ্যাক দি রিপারের আক্রোশ ছিল পতিতাদের ওপর। কিন্তু এই হত্যাকারীর আক্রোশ শিশু আর বালকদের ওপর। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড মশাই জীবনে দেখি নি।

ইন্দ্রনাথ বলল, শুধু তাই নয়। জ্যাক দি রিপার হত্যা করে তাদের দেহযন্ত্র এবং পুরো দেহটা ফালা ফালা করে কেটে ছিঁড়ে ঘটনাস্থলেই রেখে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেত না। কিন্তু আপনার এই নৃমুণ্ডশিকারী প্রতিবারই বাচ্চাদের মাথাগুলো সঙ্গে নিয়ে গেছে। আশ্চর্য হল এইটাই।

আমি বললাম, পাগল নয় তো?

বাতিকগ্রস্তও হতে পারে, মানুষের মাথা জমানোর বাতিক। রামদাস বললেন।

তাহলে তো তাকে বিপজ্জনক টাইপের উন্মাদ বলতে হয়!

অবশ্যই তাই। উন্মাদ না হলে রাতের পর রাত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এরকম নরহত্যা কেউ করতে পারে? নিরীহ ছেলেগুলো—এদের ওপর কারোরই আক্রোশ

তার মানে?

শিব্রাম চক্কোত্তি বলিয়াছেন, বিচক্ষণদের বিবেচনায় তাবৎ মেয়েপুরুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—জীবিত আর বিবাহিত।

হেসে ফেলল কবিতা। গোলাপের পাপড়ির আড়ালে দুই সারি মুক্ত শুভ্র দাঁতে জলতরঙ্গ হাসি হেসে বললে, তুমি একটা প্রচণ্ড ডেঁপো।

কথা বলতে বলতে আমরা এসে পড়েছিলাম রেলিংঘেরা একটা বৃহৎ জলাশয়ের সামনে।

পরে শুনেছিলাম, সেই হল রাঁচি টাউনের লেক।

ঢাকুরিয়া লেকের মতই আভিজাত্য আছে লেকটার। অপরাহ্নের আমেজ ঘনিয়ে এলেই গোধূলির রাঙা আলো গায়ে মেখে কপোতকপোতীর মত দম্পতি, প্রেমিক-প্রেমিকারা আসে সেখানে নিভৃতে কলগুঞ্জন করতে। কেউ ঘাসের কার্পেটের ওপর বসে, কেউ ঘুরে বেড়ায়, কেউ লেকের জলে পা ডুবিয়ে ঝিলমিল ঝিলমিল জল দেখে আর কবিতা রচনা করে।

কিন্তু ইদানীং নাকি রাঁচির এই লেকে সন্ধে হলেই আর কেউ আসে না।

আসে না মহা আতঙ্কে।

এক সময়ে যেখানে রতি আর মদনের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য, আজ সেখানে বিরাজ করছে বিভীষিকার রাজ্য।

অথচ, সেদিন ভোরবেলা আমরা যখন এলাম সরোবরের তীরে, এসবের বিন্দুবিসর্গ জানতাম না।

এসেছিলাম নিরীহ স্ফূর্তিউজ্জ্বল মনে। দু'চোখে যা দেখেছি, তাই ভাল লাগছে। নিশ্বাসের সাথে ফুসফুসে যা গ্রহণ করছি, তাই তেজালো জীবনদায়িনী মনে হচ্ছে। আর, কর্ণকুহরে যুবতী বধূর যে কচকচানি প্রবেশ করছে, তাই অমৃত মনে হচ্ছে।

রসভঙ্গ ঘটল ঠিক এই সময়ে।

শুধু রসভঙ্গ ঘটল বললে অল্প বলা হয়। ছন্দপতন ঘটল, অঘটন ঘটল, মিষ্টি সুর বাজতে বাজতে যেন অকস্মাৎ বেহালার তার ছিঁড়ে গেল।

চমকিত হৃদয়ে সশব্দে নিশ্বাস টেনে আমরা তিনজনেই আচমকা দাঁড়িয়ে গেলাম। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইলাম ঘাটের ওপর রক্তগঙ্গার দিকে।

উঃ সে কী বীভৎস দৃশ্য!

রক্ত, রক্ত আর রক্ত! থই থই করছে, জলের ধারার মত বয়ে যাচ্ছে রক্ত! বৃষ্টির জলে ভিজে আরো ছড়িয়ে পড়েছে সেই রক্ত।

আর এই রক্তজমানো রক্তাক্ত দৃশ্যের ঠিক কেন্দ্রে পড়ে একটা ভয়াবহ বস্তু।

একটা মুণ্ডহীন শিশুর দেহ!

কবন্ধ দেহ!

লাশটি যে শিশুর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রায় উলঙ্গ দেহ। কোমরে রক্তমাখা একটা ইজের। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত।

আর, গলাটি সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ডিত।

থাকতে পারে না। এক-আধজনের ওপর কোন কারণে থাকলেও মাথা কেটে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সেক্ষেত্রে এতগুলি খোকা—

সবসুদ্ধ কতজন? শুধোল ইন্দ্রনাথ।

এই নিয়ে তেইশ জন হল।

কী সর্বনাশ! তেইশ জন শিশু খতম হয়ে গেল, অথচ হত্যাকারী এখনো ধরা পড়ল না? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ।

কাঁচুমাচু মুখে গোঁফে তা দিয়ে রামদাস বললেন, কি করি বলুন? চেষ্টার তো ক্রুটি নেই। কিন্তু হালে পানি পাচ্ছি না। আর সত্যি কথা বলতে কি, কলকাতা পুলিশের মত জবরদস্ত বাহিনী আমাদের কোথায় বলুন। খুনজখম দাঙ্গাহাঙ্গামা সেখানেও হয়। কিন্তু সেখানে সূত্র থাকে, সাক্ষী থাকে। কিন্তু এখানে তো কিছুই নেই!

কিচ্ছু নেই?

না।

যাদের বাচ্চা গেছে, তাদের বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছেন পারিবারিক আক্রোশ থাকতে পারে কিনা?

সেসবের কোন ক্রুটি রাখি নি ইন্দ্রনাথবাবু, কিন্তু ওই যে বললাম, হালে পানি পাচ্ছি না। আপনাকে ভগবান এ সময়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি আমাদের বাঁচান। আমার মুখরক্ষা করুন। খবর পেয়েছি, আমাকে এখান থেকে বদলির চেষ্টা চলছে। তা যদি হয়, তাহলে আমার সার্ভিস রেকর্ডের বারোটা বেজে গেল। অকৃত্রিম আকুতি ফুটে ওঠে রামদাসের কণ্ঠে।

দরজাটা খুলে গেল ঠিক সময়ে। শুধু খুলে গেল না, আছড়ে পড়ল।

দড়াম শব্দে পাল্লা দুটো আছড়ে পড়ল দুপাশের দেওয়ালে, ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করল এক নারীমূর্তি। আর সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি।

কারণ, এ নারীমূর্তিকে আমি চিনি।

দমকা বাতাসের মত ঘরে প্রবেশ করেই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমাকে দেখেই। অশ্রুসিক্ত চোখে অপলকে তাকিয়েছিল আমার পানে।

সে চোখে দেখলাম নিঃসীম বেদনা আর অপার শোক। স্ফীত নাসারান্ধ্র আর কম্পিত অধরোষ্ঠে দেখলাম না-বলা-ব্যথার থরথর প্রকাশ।

বিস্রস্ত বসন আর আলুলায়িত কুন্তলে আকুল হৃদয়ের অভিব্যক্তি।

কে বলবে এই মেয়েটিই এককালে ছিল কলকাতার আধুনিকাদের শিরোমণি! কে বলবে একদা এর চরণ স্পর্শ করতে পারলে ধন্য হয়ে যেত কত বিলাত-ফেরত ধনীপুত্র, কৃতার্থ হয়ে যেত হেসে দুটো কথা বললে।

কুন্তলার সেই গ্ল্যামার আর নেই। ধাঁধা লাগানো সে রূপ আর নেই। চোখের তারায় সে বিদ্যুৎ আর নেই। তড়িৎ নেই দেহবল্লরীতে, ইশারা নেই রেখায় রেখায়।

দু'বছর আগে জনৈক পাঞ্জাবী ড্রাইভারের সঙ্গে অকস্মাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল কুন্তলা। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল মায়ের সব গহনা, বাবার হাজার বিশেক টাকা।

কর্পূরের মত উবে গিয়েছিল কলকাতা থেকে। পুলিশ হন্যে হয়ে ফিরেছে। কিন্তু সন্ধান পায় নি সেই পাঞ্জাবী ড্রাইভারের, সন্ধান পায় নি সুরূপা কুন্তলার।

সেই কুন্তলা দাঁড়িয়ে আমার সামনে। হতশ্রী, রোরুদ্যমানা, শোকবিহ্বলা।

ক্ষণকাল নিষ্পলক চোখে আমার পানে তাকিয়ে রইল কুন্তলা। আর তারপরেই আচমকা ছুটে এলো সামনে। এবং কিছু বোঝবার আগেই আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠল হাউ হাউ করে, মৃগাঙ্কদা, এ আমার কি হল। এ সর্বনাশ আমার কেন হল।

বায়োস্কোপের ঘটনার মত নাটকীয় সেই কাহিনী কুন্তলার মুখে শুনলাম ধীরে ধীরে।

মানুষের মতিচ্ছন্ন যখন হয়, এমনি করেই হয়। বিশেষ করে মেয়েদের।

তা না হলে কুন্তলার এ হাল হবে কেন?

সমাজের স্বঘরের হীরের টুকরো পাত্ররা যাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল, সে পালাবে কেন একজন উড়নচণ্ডে ড্রাইভারের সঙ্গে?

শুধু কি তাই? প্রেমাস্পদের ফুসলানিতে শুধু সে ঘর ত্যাগই করে নি, পথের সম্বল হিসেবে ঘরে যা কিছু ছিল, সব পথে নামিয়েছে।

নিজেও পথে বসেছে।

কেননা, কুন্তলার বিত্ত ফুরোতেই ড্রাইভারের চিত্ত ঘুরেছে। কুন্তলার রূপযৌবন? লম্পটদের কাছে তার কোন দাম আছে কি? নিত্যনতুন না হলে তো তাদের মুখে রোচে না।

অতএব, যা ছিল অবশ্যম্ভাবী, তাই হয়েছে। অর্থাৎ রাত ভোর হতেই একদিন কুন্তলা দেখেছে শয্যা শূন্য। যার জন্যে সে ঘর ছেড়েছে, ভাল বর ছেড়েছে, সেই তাকে ছেড়ে গেছে।

কুন্তলা তখনো কাঁদে নি।

কারণ, তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। আর, কপর্দকহীন।

সেই অবস্থায় কেটেছে মাসের পর মাস। যথাসময়ে অবৈধ প্রণয়ের ফুলকে বুকে তুলে নিয়েছে কুন্তলা। কারোর কাছে মাথা হেঁট না করেই ছেলেকে মানুষ করেছে। রাঁচিতেই জুটিয়েছিল ছোট্ট একটি চাকরি। কোনমতে সন্ন্যাসিনীর মত জীবন যাপন করেছে, আর তিলে তিলে অনুশোচনা আর আত্মগ্লানির আগুনে দগ্ধে প্রায়শ্চিত্ত করেছে অপরিণাম-দর্শিতার।

সে আজ চার বছর আগেকার কথা।

মুকুলকে মানুষ করার জন্যে কারোর কাছে হাত পাতে নি কুন্তলা। বাবা-মা'র কাছেও ফিরে যায় নি। সম্পত্তির ভাগীদার হতেও না।

নাড়ীছেঁড়া ধন সেই মুকুল আচম্বিতে উধাও হয়ে গেল গতকাল রাতে।

সন্ধে হল। দুর্গা-পর্বতের শীর্ষে বাজল শাঁখঘন্টা। সাঙ্গ হল আরতি। ঘরে ঘরে জ্বলল প্রদীপ, রাস্তায় আলো।

কিন্তু মুকুল আর ঘরে ফিরল না।

কোনদিন তো এমন ঘটে নি। স্কুল থেকে প্রতিদিনই দুপদাপ করে ঘরে ফিরেছে মুকুল। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে 'খেতে দাও খিদে পেয়েছে' বলে আবদার করেছে। দেরি হলে কেঁদে ভাসিয়েছে।

সেই মুকুল আর ফিরল না।

ক্রমে রাত গভীর হল। অমানিশায় উষার আলো ফুটল। কিন্তু মুকুল আর ফিরল না।

আর, তারপরেই জানা গেল সেই ভয়ঙ্কর সংবাদ। একটি চার বছরের খোকার গলাকাটা কবন্ধ পাওয়া গেছে লেকের পাড়ে।

পাগলিনীর মত ছুটেছে কুন্তলা। মুণ্ড ছিল না। তাতে কি হয়েছে? না কি ছেলেকে না চিনে থাকতে পারে? সেই হাত, সেই বুক, সেই পা। আর, বামবাহুর কনুইয়ের কাছে একটা ইঞ্চিখানেক লম্বা কালো জড়ুল।

মুকুল! মুকুল! আমার মুকুল।

বুকফাটা কান্নায় পায়ের ওপর আছাড়ি-পাছাড়ি খেতে লাগল আধুনিকাদের একদা মুকুটমণি কুন্তলা—পাপের ফলকেও ধরায় ধরে রাখতে পারল না যে, সেই পাপিষ্ঠা কুন্তলা।

পাষাণ-মূর্তির মত শক্ত দেহে বসে সমস্ত দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। কিছু বলল না। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না। কোন প্রশ্নও করল না।

কিন্তু শিলাময় মুখে দেখলাম কঠিন সংকল্পের রেখা।

মুকুলের শব আবিষ্কার করেছিলাম আমরা। কিন্তু সেই মুহূর্তে কবিতা অসুস্থ হয়ে পড়ায় একটা সূত্র আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল।

একটি নতুন সাদা চাদর পড়ে ছিল অদূরস্থ ঝোপের আড়ালে। নিঃসন্দেহে হত্যাকারীর। কেননা, তাতে রক্ত মাখামাখি ছিল। চাদরটা রামদাস আগরওয়ালা এনেছিলো সঙ্গে। কুন্তলাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর বার করলেন আমাদের সামনে। বললেন, এতগুলি খুন হয়েছে। কিন্তু কোথাও কখনো চাদর পড়ে থাকে নি। সুতরাং সেদিক দিয়ে এবার আমরা ভাগ্যবান।

ইন্দ্রনাথ বললে, ভাগ্যবানই-বা বলি কিসে? এ চাদর দেখে কি-ই-বা আর জানা যাবে বলুন। না আছে ধোবির চিহ্ন, না আছে মিলের লেবেল। আনকোরা নতুন চাদর।

আমি বললাম, পুরুষ কি মেয়ের, তাও বুঝবার উপায় নেই।

সেটা জেনে তোমার লাভ কি? বলল ইন্দ্রনাথ।

মেয়ের হলে একটা অনুমান করা যেত।

কি অনুমান?

জানো তো, কুসংস্কার জিনিসটা ভারতীয় নারীদের অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে। সেকালে পাড়াগাঁয়ে বন্ধ্যা-মেয়েরা শিশুবলি দিত নিজে সন্তানধারণ করার জন্যে। কে জানে, এখানেও সে-রকম কোন মতলব চলছে কিনা।

ওসব তোমার গল্প উপন্যাসেই সম্ভব। বলল ইন্দ্রনাথ। বলে, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল টেবিলের ওপর মেলে-দেওয়া রক্ত-মাখা ভিজে চাদরটার দিকে।

রামদাস বললেন, আমি তো মশাই হাল ছেড়ে দিয়েছি। যদিও-বা একটা সূত্র রেখে গেল হত্যাকারী, মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। এ-রকম চাদর হাজার হাজার রয়েছে রাঁচি শহরে, রয়েছে ঘরে ঘরে। এখন, কাকে ছেড়ে কাকে ধরি বলুন তো?

ইন্দ্রনাথ তখনও পলকহীন চোখে তাকিয়ে চাদরটার দিকে।

রামদাস বলে চললেন, এ যে কি ফ্যাসাদে পড়লাম! রাস্তাঘাটে চৌকিদারের সংখ্যা বাড়িয়েছি, রাতে পাহারার অনেক কড়াকড়ি হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেই খুন হয়ে চলেছে একটার পর একটা। আরও তাজ্জব ব্যাপার, খুন হচ্ছে কেবল খোকারা, খুকুরা নয়। এ কি রহস্য বলুন তো? খোকা-বিদ্বেষী কোন পাগলের কাণ্ড বলেই তো মনে হচ্ছে। রাঁচি পাগলা-গারদ থেকে কোন খুনে পাগল রাত্রে বেরিয়ে এসে এ কাজ করে যেতে পারে।

আমি বললাম, তাই যদি হয় তো মুণ্ডুগলো সে রাখছে কোথায়? তাছাড়া রোজ-রোজ পাগলা-গারদ থেকে বেরুনো কি এতই সহজ? না মশাই না, পাগলা-গারদে নয়, পাগল লুকিয়ে আছে আপনার আমার আর পাঁচজনের মধ্যেই।

ইন্দ্রনাথ তখনও স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে চাদরটার দিকে, দুই চোখে নিবিড় তন্ময়তা। ললাটে ভ্রূকুটি।

ইন্দ্রনাথ কি কিছুর হদিশ পেয়েছে? আমাদের চোখে না ধরা-পড়া কোন সূত্রের? তা না হলে এমন ভাবান্তর তো দেখা যায় না বন্ধুবরের আননে!

পরিবর্তনটা এতক্ষণে রামদাসের চোখেও পড়েছিল। তাই বিস্মিত কণ্ঠে শুধোলেন, ইন্দ্রনাথবাবু, আপনি কি দেখছেন অমন করে? ও চাদর আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচেও দেখেছি। কিন্তু রক্তের মধ্যে আঙুলের ছাপ পাই নি।

বিড়বিড় করে ইন্দ্রনাথ বললে, না না, আঙুলের ছাপ নয়।

তবে কি?

রামদাসবাবু।

বলুন স্যার।

রাঁচিতে তৈরি চাদর না এটা?

তা তো বটেই। রাঁচির স্পেশালিটি।

ক'জন তাঁতি এ চাদর তৈরি করে খোঁজ নেবেন?

সে আর এমন কি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাতে লাভ কি? বিশেষ এই চাদরটাই কোন্ তাঁতি বুনেছে, তা আপনি জানছেন কি করে?

সে জানার উপায় আছে।

আছে?

আছে বইকি। আপনার চোখের সামনেই রয়েছে।

আমি তো মশাই দেখছি না।

দেখছেন না?

না।

মুচকি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, বেশ, বেশ, ওটা তাহলে আপাতত আমার মন্ত্রগুপ্তি হয়ে থাকে, যথাসময়ে জানাবো।

যথাসময়ে খবর এল রামদাসের কাছ থেকে।

এসব ব্যাপারে ভদ্রলোক খুবই পোক্ত, মোটেই দেরি করলেন না। গোঁফে ঘনঘন তা দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে হাঁকডাক দিয়ে চেলাচামুণ্ডা পাঠিয়ে রাঁচিশহরে এবং ধারেকাছে যেসব তাঁতিরা চাদর বোনে, তাদের একটা তালিকা তৈরি করে ফেললেন।

এবং সে তালিকা পৌঁছল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের কাছে।

আর তারপরেই হাওয়া হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। একেবারে নিপাত্তা। ভোর থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত বেমালুম অদৃশ্য হয়ে রইল বন্ধুবর।

ইন্দ্রনাথের মতিগতি সম্বন্ধে আমার হাড় তো ভাজা ভাজা। কাজেই খুব অবাক হলাম না। কবিতাও না। যদিও গজগজ করতে লাগল সারাটা দিন না বলে কয়ে গা ঢাকা দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু দুজনেই বুঝলাম ডালকুত্তার নাকে গন্ধ পৌঁচেছে। তাই দিগ্বিদিগ জ্ঞান হারিয়েছে। ছুটেছে শিকারের পেছনে।

রামদাস আগরওয়ালা ভদ্রলোক কিন্তু বিষম ফ্যাসাদে পড়লেন। নতুন খুনের খবর ওপরওয়ালার কানে পৌঁছেছে। হুমকিও এসে গেছে। তিন দিনের মধ্যে যদি রহস্যের সুরাহা না হয়, খুনেকে পুলিপোলাও খাওয়ানোর ব্যবস্থা না হয়, তাহলে অন্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে।

ভয়ানক এই দুঃসংবাদ নিয়েই ইন্দ্রনাথের কাছে বেল্ট কষতে কষতে দৌড়ে আসছিলেন রামদাস।

এসে শুনলেন, কাক-ডাকার সঙ্গে সঙ্গে স্রেফ হাওয়ার সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেছে ইন্দ্রনাথ।

শুনে ধপ করে মেঝের ওপরেই বসে পড়লেন। মাথা-জোড়া ঘর্মাক্ত টাকের ওপর ঘনঘন রুমাল চালনা করতে করতে যেন ককিয়ে উঠলেনঃ তাহলে আমার কি হবে?

অতীব করুণ সেই মূর্তি দেখে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কফি আনতে দৌড়লো কবিতা।

আর আমি একটা ম্যাকরোপোলো সিগারেট এগিয়ে দিয়ে সান্ত্বনার ছলে বললাম— কি আবার হবে। ইন্দ্রনাথ এখুনি এসে যাবে।

রুমালটা পকেটস্থ করে সযত্নে গোঁফজোড়ায় তা দিয়ে সিগারেটটা ঠোঁটস্থ করলেন আগরওয়ালা।

তারপর কুতকুতে চোখ দুটো যথাসম্ভব বড় করে বললেন, কিন্তু কখন আসবেন?

কখন আসবেন, কখন আসবেন করতে করতেই সারাদিন কেটে গেল। এল রাত। মুহুর্মুহু হাতাহাতির ফলে রামদাসের গোঁফজোড়ার অবস্থা তখন খুবই কাহিল। রুমাল ঘষতে ঘষতে টাকেরও ছাল চামড়া উঠে যাবার উপক্রম।

ঠিক এমনি সময়ে একগাল গা-জ্বালানো হাসি নিয়ে প্রবেশ করল ইন্দ্রনাথ।

দেখেই তো পিত্তিসুদ্ধ জ্বলে গেল আমার।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল কবিতা।

আর, প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম রামদাসের। অনেকটা হাউ হাউ করেই বলে উঠলেন, দাদা, আমি তো আবার ডুবলুম।

ডুববেন না। বলল ইন্দ্রনাথ। মাকরোপোলোর প্যাকেটে চোখ পড়তেই হাত বাড়ালো সেদিকে।

প্যাকেটটা চট করে সরিয়ে নিয়ে বললাম, যা তোমার নেশা তাই গেলো, অর্থাৎ কাঁচি ধরাও। তার আগে বলো, গেছিলে কোন্ চুলোয়।

আততায়ীর সন্ধানে।

ব্যোমকেশের মত কথা বলো না। ওসব উপন্যাসেই মানায়। সারা দিন ছিলে কোথায়? নৃমুণ্ডশিকারী তো তোমার মুণ্ডুটাই কচ করে কেটে নিয়ে যেতে পারত।

পারত। কিন্তু এক্ষেত্রে পারে নি। পারবেও না। কেননা, কামাখ্যার মাদুলি পকেটেই আছে। বলে পকেট থেকে কামাখ্যার মাদুলি অথ্যাৎ নিকষ কালো রিভলভারটা বার করে দেখালো ইন্দ্রনাথ।

কবিতা বললে, ডেঁপোমো করো না। আততায়ীর টিকি অথবা ল্যাজ কোনোটা দেখতে পেয়েছ?

মুখটা দেখতে পেয়েছি।

কি? তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন রামদাস। উত্তেজনার আধিক্যে মনে হল ঝুলে-পড়া গোঁফ দুটোও কাপছে। তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন, কী—কী বললেন? মুখ দেখেছেন?

হ্যাঁ।

অসম্ভব।

অসম্ভব কেন?

আমি এতদিনে যার ছায়াটুকুও দেখতে পেলাম না, আপনি একদিনেই তার মুখ দেখে ফেললেন?

তা দেখছি।

অসম্ভব।

এই জন্যেই মৃগাঙ্ক আমাকে অদ্ভুতকর্মা, অনন্য প্রতিভাধর, জাদুকর ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছে ওর ওই ট্র্যাস গল্পগুলোয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি অদ্ভুতকর্মা নই, ভেল্কিবাজ নই, মায়াবী নই, কুহকী নই। আমি আপনার মতই সাধারণ মানুষ। আপনার মতই আমি চোখ দিয়ে দেখি। যেমন এক্ষেত্রে দেখেছি।

কি দেখেছেন?

রক্তমাখা চাদরে হত্যাকারীর ঠিকানা।

ঠাট্টা করছেন?

রাম রাম! আপনার সঙ্গে?

চাদরটা আমিও দেখেছি। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখেছি।

আর, আমি শুধু চোখে দেখেছি।

তাহলে আপনার তৃতীয় নয়ন আছে বলুন?

মোটেই নেই। আমার এই দুটি নয়ন দিয়েই দেখেছি।

অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা ছিল বুঝি?

নিশ্চয়না।

তাহলে?

চাদরের বুনুনির মধ্যে লেখা ছিল।

চাদরের বুনুনির মধ্যে লেখা ছিল? মনে হল, এবার বুঝি কোটর ছেড়ে রামদাসের কুৎকুতে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

হ্যাঁ। চাদরের বুনুনির মধ্যেই লেখা ছিল। সে লেখা আপনিও দেখেছেন।

আমি দেখেছি, অথচ আমি জানি না?

কি করে জানবেন? আপনি তো গোণেন নি।

গুণি নি? আবার একটা ধাক্কা খেলেন রামদাস। এর মধ্যে আবার গোণার প্রশ্ন আসছে কি করে?

এসে গেলে আর আমি কি করি বলুন। চাদরের টানা আর পড়েন গুণলেই হত্যাকারীর ঠিকানা পেয়ে যেতেন।

টানা আর পড়েন গুণে হত্যাকারীর ঠিকানা পেয়ে যেতাম? বলছেন কি মশায়? মাথা-টাথা খারাপ হল নাকি?

আজ্ঞে না, হয় নি। টানা আর পড়েন কাকে বলে তা জানেন?

জানবো না? তাঁতির মাকু চলে আড়াআড়িভাবে। সুতোগুলোও পড়ে সমকোণে। একদিকেরটাকে বলে টানা, অপর দিকেরটা পড়েন।

এই তো ফুলমার্ক পেয়ে গেলেন। অথচ এখনও ধরতে পারলেন না আমি কি বলতে চাইছি।

পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে মুখটা হাঁ করে আর বন্ধ করতে পারলেন না রামদাস। মুখব্যাদান করা অবস্থাতেই ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ, আলোকিত হল মুখ। আমতা-আমতা করে বললেন অবশেষে, আপনি—আপনি বলতে চাইছেন, ক'টা টানা আর ক'টা পড়েন আছে গুণলেই জানা যেত কোন্ তাঁতি ঠিক কতগুলো টানা আর পড়েন ব্যবহার করেছে?

বাঃ, ঠিক ধরেছেন।

কিন্তু তারপর?

তারপর কি?

রক্তমাখা চাদরটার মালিক কে, তা আপনি তাতির কাছ থেকে জানছেন কি করে?

এতক্ষণে একটা সমস্যার কথা বললেন বটে। আর এই ধাঁধার জট ছাড়াতেই সারাটা দিন হাল্লাক হয়ে ঘুরেছি।

ঘোরা সার্থক হয়েছে বলুন?

তা হয়েছে বৈকি।

ক্ষণকাল পলকহীন চোখে ইন্দ্রনাথের পানে তাকিয়ে রইলেন রামদাস। তারপর বললেন অভিভূত কণ্ঠে, ইন্দ্রনাথবাবু, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। ভাবতাম আপনি গল্পের নায়ক, বাস্তবে আপনার অস্তিত্ব নেই। এখন দেখছি আছে। মারাত্মক সেই অস্তিত্ব। দয়া করে হেঁয়ালিটুকু ভেঙে আমায় সুস্থ করবেন কি?

রামদাসের কণ্ঠে এমন একটা আকুতি, এমন একটা ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল যে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত লঘুতা পরিহার করে গম্ভীর হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। একটা কাচি ধরিয়ে নিয়ে শোনাল সেই দুঃসাহসিক অভিযান বৃত্তান্ত।

সংক্ষেপে বলি।

ইন্দ্রনাথ সন্ধান পেয়েছিল সেই তাঁতির। টানা আর পড়েন—এর সংখ্যা প্রথমে মিলে গিয়েছিল দুজন তাঁতির মাকুর সংখ্যার সাথে। কিন্তু তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে উপস্থিতবুদ্ধি খাটিয়েছে ইন্দ্রনাথ। সুতো আর তুলো মিলিয়ে দেখেছে। তাতেই সুরাহা হয়েছে সমস্যার, পাওয়া গেছে প্রকৃত তাঁতিকে—যে বুনেছে এই চাদর। রক্তমাখা চাদরটা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। তাঁতিকে দেখাতেই সে চিনেছে। বলেছে, এ চাদর তৈরি হয়েছে তার হাতে। বেশিদিন আগে নয়। চাদরের গাঁটরিটা তার ছেলে নিয়ে গেছে মার্কেট রোডে—খুচরো বিক্রির দোকানে।

সেখানে ধাওয়া করেছে ইন্দ্রনাথ। জেরা করেছে দোকানদারকে, মানে তাঁতির ছেলেকে। বেশি বেগ পেতে হয় নি। চাদরটা দেখেই দোকানদার বলেছে, এ চাদর গাঁটরি থেকে একটাই বিক্রি হয়েছে দিন সাতেক আগে। কে কিনেছে? কে আবার কিনবে, রামবাবু—রামবাবু, রাঁচির রামবাবু।

অচিরেই পাওয়া গেছে রাঁচির রামবাবুর পরিচয়। রামসিংহাসন রাম তাঁর পুরো নাম। বাপ-পিতামহের বিশাল জমিদারী ছিল। এখনও যা আছে, তা গড়িয়ে খেলে তিনপুরুষ স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। রাঁচির উপকণ্ঠেই নেতারহাট যাওয়ার পথে তাঁর বিশাল বাগান আর প্রাসাদ চেনে না হেন লোক রাঁচি শহরে নেই।

রামবাবুকে চেনে রাঁচির আবালবৃদ্ধবনিতা। অমায়িক শিশুকে মানুষ। ধমনীতে নীলরক্ত বইলেও আচারে-ব্যবহারে তিনি সাধারণ মানুষ। পান-দোক্তা-তামাকের নেশা তাঁর নেই। কিন্তু আছে একটি নেশা।

বড় প্রচণ্ড সে নেশা—ভগবৎনেশা।

রামসিংহাসন রাম অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ। ঠাকুরদা কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাগানের চৌহদ্দির মধ্যেই। রামবাবু দিনরাত এই কালীমন্দিরেই ধ্যানে বিভোর হয়ে থাকেন।

সেই সময়ে মন্দিরের ত্রিসীমায় ঘেঁষতে পারে না কেউ—ভেতরে যাওয়া তো দূরের কথা।

বছরখানেক হল এক ঘোর কাপালিক আস্তানা নিয়েছে তাঁর বাগানের আটচালায়। কাপালিকের চেহারা অতি ভীষণ। গলায় রুদ্রাক্ষের মোটা মালা। পরনে রক্ত বসন।

মাথায় জটাজুট। হাতে ত্রিশূল। আর কথায় কথায় 'হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে গাল বাজানো তো লেগেই আছে।

কাপালিক বাগানের বাইরে কদাপি আসেন না। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত রামবাবুর সঙ্গে তাঁকে বাগানে ঘুরতে দেখা গেছে।

এসবই শোনা কথা।

প্রতিবেশীরা শুনেছে বাড়ির চাকর-বাকরদের কাছে। আর ইন্দ্রনাথ শুনেছে প্রতিবেশীদের কাছে।

তাঁতির ছেলের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে রামবাবুর বাড়ির দিকেই গিয়েছিল সে। বাড়ির উঁচু পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢোকার সাহস হয় নি। কারণ, পাড়ার লোকের কাছেই শুনেছে দু-দুটো বাঘের মত গ্রেহাউন্ড নাকি চব্বিশ ঘন্টা পালা করে পাহারা দেয় গোটা বাগান আর প্রাসাদ।

শাপশাপান্তের ভয়ে বাড়ির লোকেরাও ঘেঁষে না কাপালিকের কাছে। তাঁর আটচালার ত্রিসীমানায় তাই কুকুর আর রামবাবু ছাড়া আর কারো যাতায়াত নেই।

এই পর্যন্ত শুনেই লাফিয়ে উঠলেন রামদাস আগরওয়াল। দুই চোখ ছানাবড়ার মত বিস্ফারিত করে শুধু বললেন, বলেন কি! রামবাবু যে দেবতুল্য লোক মশায়! ওরকম ঋষির মত মানুষ রাঁচি শহরে আর দুজন নেই।

ইন্দ্রনাথ বললে, তা ঠিক। চেহারায় তিনি ঋষিপ্রতিমই বটে। শুধু তার দর্শনলাভের জন্যই এতটা সময় গেল আমার। ঘন্টাখানেক আগে তিনি টমটম চালিয়ে বাড়ি ফিরলেন। একমুখ সাদা দাড়ি, মাথার চুলও ধবধবে সাদা। বয়স কম-সে-কম ষাট, কিন্তু চোখে-মুখে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা—জরার চিহ্নমাত্র নেই। কেমন, তাই কিনা?

ঠিক, ঠিক! বলে উত্তেজিতভাবে হাত কচলাতে লাগলেন রামদাস।

তবে কি জানেন, ইন্দ্রনাথ বললে, পৃথিবীর অধিকাংশ ক্রিমিনালের চেহারাই ক্রিমিনালের মত হয় না। যেমন, আমাদের মৃগাঙ্ক।

ইয়ার্কি মেরো পরে। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বললাম আমি। তোমার সন্দেহ তাহলে এই রামদাসবাবুই শিশু-হত্যাকারী এবং নৃমুণ্ডশিকারী?

সন্দেহ কি হে, বিশ্বাস—বিশ্বাস, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি তাই।

কেন করো?

কেন করবো না?

তার মানে?

মানে অতি সোজা। রামবাবু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনপুরুষ ধরে তাই গৃহে কালীপুজো চলে। তাঁর এ বাড়িতে একবছর ধরে এক কাপালিক ডেরা নিয়েছেন বাবু নিজে কালীমন্দিরে উপাসনা করেন এবং কাপালিকের সঙ্গে ঘোরাফেরা করেন। —আর—

আর কী?

আর হপ্তা চারেক পরেই কালীপুজো।

তাতে কি?

তাতেই তো সব। মৃগাঙ্ক, তুমি কি জানো না এককালে মা কালীকে একশো আটটা নরমুণ্ড উপহার দেওয়া হত সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যে?

ইন্দ্রনাথ—ইন্দ্রনাথ, তুমি কি বলছ ভাই?

ভায়া মৃগাঙ্ক, ভুলে যেও না, বিশাল এই ভারতে ধর্মোন্মাদ বিকৃতাচারীর সংখ্যা এখনও নগণ্য নয়। ভুলে যেও না, আসামে এখনও সর্পদেবতার কাছে মানুষ বলি দেওয়ার জন্যে সেখানকার এক রাণীকে নিয়ে এই সেদিন কাগজে কাগজে লেখালেখি হয়েছে। ভুলে যেও না, হিমালয় আর নীলগিরির আদিম অধিবাসীরা আজও মানুষের মুণ্ড শিকার করে। অষ্টসিদ্ধিলাভের জন্যে ধর্মোন্মাদ কালীসাধক অনেক রকম মানত করে শপথ করে, প্রক্রিয়া করে।

কে জানে, এক্ষেত্রে রামবাবু তাঁর সাধকভাই কাপালিকের প্ররোচনায় একশ আটটি অথবা একাধিক শিশুমুণ্ডের মালা মায়ের গলায় পরিয়ে অষ্টসিদ্ধাইয়ের স্বপ্নে মশগুল কিনা।

কথাগুলো অত্যন্ত শান্তভাবে বললেও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল ইন্দ্রনাথের দুই চক্ষু, শক্ত হয়ে উঠেছিল চোয়ালের রেখা।

রামদাস গোঁফে মোচড় দিয়ে বললেন, তাহলে আপনি কি বলেন?

সার্চ করবেন। আজ রাতেই হানা দেবেন রামবাবুর বাগানের আটচালায়। নইলে আর একটি শিশুর জীবন-দীপ নিভে যেতে পারে আজ রাতে।

শেষবারের মত গোঁফে একটা মোক্ষম মোচড় দিয়ে পা বাড়ালেন রামদাস।

বুঝলাম, আজ রাতেই যবনিকা পড়বে শিশুমুণ্ড শিকারীর মারাত্মক অভিযানে।

পড়লও তাই। রামদাসের দীর্ঘ রিপোর্ট দিয়ে অযথা এ-কাহিনীকে দীর্ঘায়িত করে আর লাভ নেই। তাই ছোট্ট করেই বলা যেতে পারে সে-রাতে সফল হয়েছিল তাঁর অভিযান। ধরা পড়েছিলেন রামবাবু আর কাপালিক।

আর, কাপালিকের আটচালায় একটা বন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়েছিল কর্তিত শিশুমুণ্ডের একটা মস্ত স্তূপ!

রামবাবুর গৃহে কালীপূজা সেই রাত থেকেই বন্ধ হয়ে গেছিল। সেইসাথে বন্ধ হয়েছিল রাঁচিশহরে শিশুহত্যা।



অতল অন্ধকারে

মিহির সেন

নিজেকে নিয়ে কিছুদিন একা থাকতে চেয়েছিল মানস। নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া সেরে নেবার তাগিদে। তাই পিসিমারা মাসখানেকের জন্য কলকাতায় নেমে আসছেন শুনে নিজেই চিঠি লিখেছিল দিনকয়েকের জন্য দার্জিলিংয়ে যেতে চায় ও। পিসিমারা ওর চিঠি পেয়ে খুব খুশি। বাড়ি তালা দিয়ে যাওয়ার চেয়ে একজন রক্ষক থাকা তো ভালই।

কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পারে মানস, এর চেয়ে কলকাতাতেই ভাল ছিল। সেখানে ভিড়ের মাঝে নিজেকে সঁপে দিলে বেশ কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে ভুলে থাকা যায়। নিজের মনের মুখোমুখি হতে হয় না। কিন্তু এখানে অহোরাত্র এই খালি বাড়িতে নিজেকে ভীষণ পীড়িত মনে হয়। মনের আয়নায় সবসময় আর এক মানস যেন স্থির শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

ভাল না লাগলেই তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। দার্জিলিংয়ের এই এক সুবিধে, বেড়ানোর জন্য কোন সময়ই বেসময় নয়। কিন্তু বেরিয়েও যেন স্বস্তি পায় না। একাকিত্বের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এখানে এসেছিল, কিন্তু নির্জন পথে একা হয়ে গেলেই কেমন অস্বস্তি বোধ করে। ভয়-ভয় করে। আবার জনাকীর্ণ ম্যালে গিয়েও আর এক যন্ত্রণা। মনে হয়, গোটা বিশ্বে ও ছাড়া আর সবাই যেন আনন্দে উদ্বেল। এই আনন্দটুকুই তো মানুষের বাঁচার সম্বল। কিন্তু ওর জীবন থেকে যেন সব আনন্দ কেউ শুষে নিয়েছে। আনন্দহীন জীবনের কিই-বা সার্থকতা? নিছক একটা দেহের কাঠামো নিয়ে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। অথচ এই অর্থহীন কাঠামোকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিতে মানুষের যে কী প্রচণ্ড আতঙ্ক, দ্বিধা, তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে মানস।

ঠিক এ-সময় হালকা এক ঝলক বাতাসের মত রীতার আবির্ভাব। ম্যাল পেরিয়ে নিরিবিলি একটা রাস্তার খোঁজে যাচ্ছিল মানস, একেবারে মুখোমুখি মেয়েটির সঙ্গে।

আরে, আপনি এখানে? বিস্ময়ের চেয়ে খুশির ছোঁয়া বেশি প্রশ্নটায়।

মানস চিনতে পারে না। মেয়েটির মিষ্টি হাসির ওপর চোখ রেখে স্মৃতি হাতড়ায়।

চিনতে পারছেন না, তাই তো? অবশ্য চেনার কথাও নয়। মাত্র একদিনের পরিচয়। অনেকের মাঝে। তাও বছর সাত-আট আগে। আমি রীতা। রীতা রায়। মানসীর বন্ধু।

অস্ফুটে বলে মানস, কোন্ মানসী?

খিলখিল করে ওঠে রীতা। এই সেরেছে। নিজের মামাতো বোনকেও চিনতে পারছেন না?

মানস স্বস্তি বোধ করে। ও, আমাদের মানসী? তাই বলুন।

ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলে রীতা, কোন্ মানসী ঠিক খেয়াল করতে পারছিলেন না তো? যাকগে, বেড়াতে, না কাজে?

বেড়াতেই বলতে পারেন। তারপর একটু ইতঃস্তত করে বলে, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে ঠিক কোথায় আলাপ হয়েছিল—

কফি-হাউসে। ইউনিভার্সিটি ফাঁকি দিয়ে বন্ধুরা কফি-হাউসে আড্ডা মারছিলাম। আপনি ঢুকতেই মানসী ডাকল আপনাকে। আমাদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আপনি কবি, সেই পরিচয়সহ।

অবাক হয় মানস। একটু হেসে বলে, আপনার তো অদ্ভুত স্মরণশক্তি! মাত্র একদিনের পরিচয়, তাও সাত-আট বছর আগে, মনে রাখলেন কি করে বলুন তো?

ঠোঁট টিপে হেসে বলে রীতা, সবাইকে কি মনে থাকে? দু-একজনকে থেকে যায়। হেতু কি, সেটা মনোবিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন।

কি জবাব দেবে ভেবে পায় না মানস। সামান্য বিব্রত বোধ করে। সু-আলাপী ও কোনদিনই নয়।

এই সুযোগে নিজেকে সামলে নেয় রীতা। বলে, সরি, অজান্তে একটু চপলতা প্রকাশ করে ফেলেছি বোধহয়। জানেন, এটাই আমার স্বভাব। কারো সঙ্গে একবার আলাপ হলেই তাকে ভীষণ কাছের লোক মনে হয়। রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারি না। এই উচ্ছলতার জন্য বাড়িতে কম বকা খাই! বন্ধুরাও সাবধান করে, তোর এই স্বভাবের জন্য একদিন এমন ধাক্কা খাবি না, তখন বুঝবি।

একটু হেসে বলে মানস, আমি কিন্তু কিছু মনে করিনি। বরং বেশ উপভোগ করছিলাম আপনার এই ছেলেমানুষি। অবশ্য একই সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার ত্রুটির কথাটাও নতুন করে অনুভব করছিলাম।

একটু হেসে বলে রীতা, সেটা প্রথমদিনই বুঝতে পেরেছিলাম। লজ্জায় আপনি লাল হয়ে উঠেছিলেন। কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আমরা মেয়েরা কিন্তু খুব উপভোগ করছিলাম আপনার অসহায় অবস্থাটা।

আলাপের এ টুকু শুরু, কিন্তু শেষ নয়। রীতাও নাকি বেড়াতেই এসেছে এখানে। এক দূর সম্পর্কের দাদার বাড়িতে উঠেছে। কিন্তু এ-কদিনেই হাঁপিয়ে উঠেছে সঙ্গী-সাথী না থাকায়। হৈ-চৈ ছাড়া ও একদম থাকতে পারে না। দম বন্ধ হয়ে আসে। এই সমস্যার মুখে মানসকে ওর মনে হয় এক মুস্কিল-আসান।

মানসও একাকিত্বের আশা নিয়েই এসেছিল এখানে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই একাকিত্বই ওর কাছে এক যন্ত্রণা হয়ে উঠেছিল। ওরও তাই খারাপ লাগে না রীতার উপস্থিতি। প্রাণবন্ত, অকপট সঙ্গী হিসেবে মেয়েটি সত্যিই আনন্দদায়ক।

রোজ বিকেলে রীতা নিজেই এসে টেনে বের করে নিয়ে যেত মানসকে। মনে কোন জটিলতা নেই বলেই বোধহয় এটাকে কোন অশোভন আচরণ বলে মনেই হত না মেয়েটির। মানসও কোন চটুলতা খুঁজে পেত না ওর আচরণে।

কিন্তু ক'দিন পরেই রীতা একটা জিনিস লক্ষ্য করল, বিশেষ একটা রাস্তায় যেন কিছুতেই যেতে চায় না মানস। কেবল বলে, অন্য দিকে চলুন। অথচ কেন যে ঐ রাস্তাটা এড়িয়ে চলতে চায়, তাও বলত না। আরো একটা জিনিসও নজর এড়ালো না রীতার। রীতা কোন সময় সুন্দর বুনো ফুল দেখে খুশি হয়ে সেগুলো তোলার জন্য কোন খাদের পাশে গেলে কেমন যেন আতঙ্কিত হত মানস। আতঙ্কটা চোখে-মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠত।

একদিন বেরুনোর আগে মানসের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল দু'জনে। জানলা দিয়ে সামনের বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছিল। একটা বাড়ির ঝুলবারান্দায় তিন-চারটে বালিশ রোদে দেওয়া ছিল।

চা খেতে খেতে একবার বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ মানস আতঙ্কে চাপা চিৎকার করে ওঠে। মুহূর্তে বাইরের দিকে তাকিয়ে রীতা দেখতে পেল, সেই ঝুলবারান্দা থেকে একটা কোলবালিশ খাড়া অবস্থায় নিচে পড়ে যাচ্ছে। ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'তিনটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঝুঁকে দেখছে বালিশটাকে। কিছুটা যেন ভীত ওরা। নিশ্চয়ই ওখানে দাঁড়িয়ে হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে ওদের ধাক্কা লেগেই বালিশটা রাস্তায় পড়ে গেছে।

মুহূর্তে মানসের দিকে ফিরে তাকায় রীতা। মানস রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছিল। চোখে-মুখে এখনও চাপা আতঙ্কের ছাপ।

আস্তে জিজ্ঞেস করে রীতা, কি ব্যাপার বলুন তো?

মানস স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলে, কই, কিছু না তো? হল আপনার চা খাওয়া?

অমন উচ্ছ্বল রীতাও এবার সামান্য গম্ভীর হয়। বলে, মেয়েদের চোখকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না মানসবাবু। আপনি কি দেখে ভয় পেয়েছিলেন?

চোখ নামিয়ে একটু আমতা-আমতা করে মানস বলে, আমার...হঠাৎ যেন মনে হল, কেউ... একটা বাচ্চাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল।

শুনে যেন আশ্বস্ত হয় রীতা। একটু হেসে বলে, তাই বলুন। আপনি পুরুষমানুষ; এত নার্ভাস! তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন, বেরুনো যাক।

দিন কয়েক পর দারুণ উচ্ছ্বসিত গল্পে ভুলিয়ে রীতা মানসকে ওর সেই অনিচ্ছার রাস্তার মুখে নিয়ে আসে। হঠাৎই খেয়াল হতে দাঁড়িয়ে পড়ে মানস। বলে, এদিকে কিছু দেখার নেই, অন্য দিকে চলুন।

রীতা আবদারের সুরে বলে, চলুন না। এতদিন হল এসেছি, এ পথটায় কোনদিন যাইনি। দেখার মত কিছু থাকতেও তো পারে।

মাথা নেড়ে আপত্তি জানায় মানস। আমি বলছি, কিচ্ছু নেই। অন্য দিকে চলুন।

এবার কপট জেদে বলে রীতা, সব সময় আপনার জেদটাই বজায় থাকবে বুঝি? আমার একটা অনুরোধ—

বাধা দিয়ে বলে মানস, আসলে...ও রাস্তাটা ভাল নয়। মাঝেমাঝে নাকি ছিনতাই-টিনতাই হয়। মাঝে শুনলাম একটা রেপ কেসও হয়ে গেছে। তাই.... আপনাকে নিয়ে একা আমি ও পথে যেতে পারব না।

রীতা ওর আপত্তি মেনে নেয় কিন্তু বেশ বোঝে মানসের অজুহাতটা সত্যি নয়। এর কোন গোপন আতঙ্ক জড়িয়ে আছে পথটার সঙ্গে। কিন্তু কি হতে পারে সেটা?

এতদিন মানসের গাম্ভীর্য, অন্যমনস্কতা দেখে ভেবেছিল রীতা, লোকটা স্বভাবে অন্তর্মুখী। এমন ইন্ট্রোভার্ট ছেলে-মেয়ে ও আগে দেখেছে। কিন্তু এবার সন্দেহ শুরু হয় রীতার, এটা মানসিক ভারসাম্য হারানোর লক্ষণ নয় তো?

ক'দিন পর আর একটি ঘটনায় এ-সন্দেহ আরো বাড়ে। বিকেলে যখন মানসকে ডাকতে আসে, ওর হাতে ছিল ছোট্ট একটা টেপরেকর্ডার। সেটা দেখেই কেমন যেন ভাবান্তর ঘটে মানসের। ভুরু কুঁচকে বলে, ওটা কি?

হেসে বলে রীতা, টেপরেকর্ডার।

—ওটা এনেছেন কেন?

—এখানকার কিছু পাখি আর ঝর্নার শব্দ ক্যাসেটে তুলে নিয়ে যাব বলে।

আপত্তি জানায় মানস, না, না, ও-সব নিয়ে বেরুনোর কোন দরকার নেই।

সামান্য গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে রীতা, কেন?

মানস আস্তে বলে, ও-জিনিসটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না।...ভীষণ ডিস্টার্বিং বলে মনে হয়।...একটা চটুল রুচিহীন প্রমোদ উপকরণ।

হেসে ফেলে রীতা। বলে, আশ্চর্য! আপনার সত্যযুগে জন্মানো উচিত ছিল মানসবাবু। কোন মুনির তপোবনে। যেখানে শহর-সভ্যতার কোন চিহ্ন নেই।

হাসিটা ছিল রীতার সাজানো। নিজেকে আড়ালে রাখার জন্য এক কৌতূহলী মনে এ-ঘটনাটা নতুন একটা সন্দেহের সংযোজন। মানসের কথা মেনে নিয়ে টেপরেকর্ডারটা মানসের বাড়িতেই রেখে যায় রীতা।

কিন্তু বেড়াতে-বেড়াতে, হাসি গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কেবলই মনে হতে থাকে, মানসের এই বিকারগুলো অহেতুক নয়। বাতিক নয়। এর পেছনে কোন গোপন সূত্র লুকিয়ে আছে নিশ্চয়ই। রীতা এবার কৌতূহলী হয়ে ওঠে সেই সূত্র আবিষ্কারে।

দিন কয়েক পর নিজেদের বাড়িতে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ করে রীতা মানসকে। ওর দাদা বৌদি সেদিন শিলিগুড়ি গিয়েছিলেন কি কাজে যেন।

সন্ধ্যায় মানস এলে একে নিয়ে সুন্দর সাজানো বসবার ঘরটায় এনে বসায় রীতা। সোফার পেছনেই জানলায় টবের গাছ। দেওয়ালে যামিনী রায়ের দুটো ছবি। রুচির ছাপ সর্বত্র।

রীতা যেন আজ অন্য দিনের চেয়েও উজ্জ্বল। খুশি মানসও। কিন্তু প্রকাশহীন।

কথায় কথায় একসময় ছেলেবেলার কথা তোলে রীতা। ছেলেবেলার সারল্য, আবেগ, বোকামির নানা গল্প। হঠাৎ একসময় থেমে আচমকা প্রশ্ন করে রীতা, আচ্ছা বলুন তো, আই লাভ য়ু'র বাংলা কি?

একটু হকচকিয়ে যায় মানস। সামলে নিয়ে বলে, কেন, আমি তোমাকে ভালবাসি।

কপট রাগে বলে রীতা, এ মা! আপনি আমাকে এ কথা বললেন?

বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, এগুলো ছিল আমাদের ছেলেবেলার দুষ্টুমি। ভালবাসা শব্দটার ভাল করে মানেই বুঝতাম না তখন।

একটু হেসে বলে মানস, এখন বোঝেন তো? আমার কিন্তু মনে হয়, আপনার বয়সটা তারপর আর বাড়েনি।

চোখে সূক্ষ্ম ভর্ৎসনা এনে বলে রীতা, প্রমাণ চান? এক্ষুণি?

হাত জোড় করে মানস, মাপ করুন বাবা!

আরো দু-চারটা কথার পর উঠে দাঁড়ায় রীতা। একটু বসুন, দেখি চা কদ্দুর।

একটু বাদে নিজেই চায়ের ট্রে হাতে ঘরে প্রবেশ করে রীতা। দরজার মুখে একটু থামে। মুখে চাপা কৌতুকের হাসি।

হঠাৎ টেপরেকর্ডার থেকে ভেসে আসে মানসের স্বর, কেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। তারপর এ-প্রসঙ্গে এদের সব ক'টি কথা।

শুনে চমকে ওঠে মানস। চোখে-মুখে গভীর আতঙ্ক। এই মুহূর্তে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে ওকে। রীতাও সামান্য ভয় পায়।

চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায় মানস। স্টপ ইট। আই সে স্টপ ইট। কে আপনাকে এ স্বাধীনতা দিয়েছে? এক্ষুণি বন্ধ করুন বলছি।

রীতার দিকে ছুটে আসে মানস। ওর কাঁধদুটো খামচে ধরে। ঝাঁকি দেয়, বন্ধ করুন।

রীতার হাত থেকে ট্রেটা পড়ে যায়। ঝন্‌ঝন্ শব্দে কাপ ডিস ভেঙে যায়। আতঙ্কিত রীতা ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। গিয়ে টেপরেকর্ডার বন্ধ করে দেয়। জানলার টবের গাছের আড়ালে মাউথপিস লুকিয়ে রেখে মানসের কণ্ঠস্বর তুলে নেবার এ পরিণতির কথা কল্পনাও করতে পারেনি ও।

ঘরে এসে দেখে, ঘর খালি। চলে গেছে মানস।

এতদিনে নিশ্চিন্ত হয় রীতা, এই মানসিক বিপর্যয়ের সঙ্গে অবশ্যই কোন গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। এখন থেকে ওর প্রধান কাজই হবে সেই রহস্য খুঁজে বের করা।

পরদিন সকালেই মানসের বাড়িতে যায় রীতা। মানস চুপ করে শুয়ে ছিল।

আস্তে ঘরে ঢুকে বলে রীতা, ক্ষমা চাইতে এলাম।

দ্রুত বিছানায় উঠে বসে মানস। না, না, আপনি কেন ক্ষমা চাইবেন? কালকের ঘটনার জন্য আমিই বরং ভীষণ লজ্জিত, অনুতপ্ত। আমাকে ক্ষমা করবেন। তারপর একটু থেমে বলে, কালই আমি চলে যাচ্ছি।

ওর চোখে চোখ রেখে আস্তে বলে রীতা, তাতেই কি বাঁচবেন?

একটু চমকায় মানস। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, মানে?

কিছুটা দূরত্ব রেখে ওর খাটেই গিয়ে বসে রীতা। তারপর সহানুভূতির সুরে বলে, আমার চোখকে আপনি ফাঁকি দিতে পারবেন না মানসবাবু। আমি বেশ বুঝতে পারছি, প্রচণ্ড একটা মানসিক অশান্তি, অস্থিরতা আর আতঙ্ক আপনাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ক্যানসারের জার্মের মত ভেতর থেকে কুরে-কুরে খাচ্ছে আপনাকে।

কেমন অসহায় স্বরে বলে মানস, আপনার সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়।

এ ব্যাপারে আমি কোন সাহায্য করতে পারি আপনাকে?

আপনি! আপনি কি করবেন? এ আমার একান্তই নিজস্ব সমস্যা।

পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা নেই, চেষ্টা করলে যা সমাধান করা যায় না। অন্তত সাময়িকভাবে কিছুটা হালাকাও তো করতে পারেন মনকে। বিপদের দিনে কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতে হয় মানসবাবু। তার ওপর নির্ভর করতে হয়। আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, বন্ধু ভেবে বলতে পারেন, আপনার কি হয়েছে। বলবেন?

আলতোভাবে ওর হাতের ওপর হাত রাখে রীতা। বন্ধুত্বের ছোঁয়া।

একটা চাপা অস্থিরতা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় মানস। ঘরে সামান্য পায়চারি করে। তারপর ওর দিকে ফিরে বলে, আপনার অনুমান মিথ্যে নয়। কিন্তু আমাকে আর একটু ভাবার সময় দিন।

সেদিন বিকেলেই মানস অকপটে সব কথা খুলে বলে রীতাকে। নির্জন একটা জায়গায় একটা টিলার আড়ালে বসে। না বলে উপায় ছিল না। ওর মানসিক যন্ত্রণা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। বেশ বুঝতে পারছিল, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আস্তে আস্তে উন্মত্ততার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও। বেঁচে থাকাটাই এক অভিশাপ হয়ে উঠেছে।

অথচ কাউকে বলে নিজের মন হালকা করতে পারছিল না। তেমন সহানুভূতিশীল, বিশ্বস্ত কেউ ছিল না ওর জীবনে। সেই অভাব পূরণ করার জন্যই যেন রীতার এই দৈব-আবির্ভাব।

কেমন আচ্ছন্নের মত নিজের কথা বলে যাচ্ছিল মানস। কিছুটা এলোমেলোভাবে। আর সমস্ত চেতনা সজাগ রেখে ওর কথা শুনে যাচ্ছিল রীতা।

স্বামী স্ত্রীর ছোট্ট সংসার ছিল মানসের। সুখী সংসার। স্ত্রী দীপা ছিল কবি স্বামীর গুণমুগ্ধ। ওদের পারস্পরিক নির্ভরতা আর বিশ্বাস অনেক বন্ধুরই ঈর্ষার হেতু ছিল।

ওদের নিজেদের এই ছোট্ট জীবন-বৃত্তে আর একজনের অবস্থিতি ছিল অপরিহার্য। অবিচ্ছেদ্য। মানসের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু সন্দীপের। ছেলেবেলা থেকে ওদের এই অবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি ওদের বিয়ের পরেও। মনের দিক দিয়ে কিছুটা দুর্বল, সংসারে অনভিজ্ঞ আর উদাসীন মানসের একমাত্র নির্ভরস্থল ছিল সন্দীপ। সন্দীপ ছাড়া নিজেকে ভাবতে গেলে কেমন অসহায় বোধ করত মানস। সন্দীপও সে রকমই। বন্ধুকে মুখে সব সময় বাপ-বাপান্ত করে গালাগাল করলেও মানসের সব কাজ নিজে আগ বাড়িয়ে করে দিত। ইলেকট্রিক বিল, গ্যাস, মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স থেকে শুরু করে সংসারের ঝুট-ঝামেলা সামাল দিতো সন্দীপ। বিয়ের পর এজন্য ভীষণ সঙ্কোচ বোধ করত দীপা। আড়ালে মানসকে বকত। এর এই আলসেমির জন্য। বন্ধুকে এভাবে বেগার খাটানোর জন্য।

কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝতে পারে, মুখে যতই গালাগাল করুক বন্ধুকে, এ কাজগুলো সন্দীপ করে স্বেচ্ছায়। কর্তব্যবোধে। সব ঝড়-ঝাপটা থেকে মানসকে আড়াল করেই যেন ওর আনন্দ। মাঝেমাঝে ওদের দুই বন্ধুর সম্পর্কটাকে মনে হত দীপার অসহায় সন্তান আর স্নেহময়ী জননীর।

কিছুদিনের ভেতরই সন্দীপের এই নির্ভরতার অভ্যেসটা দীপার ভেতরও অজান্তেই সংক্রামিত হল যেন। সন্দীপদা ছাড়া এক পা-ও যেন চলতে পারত না দীপাও।

এ-নিয়ে অনেকেই কটাক্ষ করত। কুৎসা রটাত। দীপার বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত, কিরে কলির দ্রৌপদী, দুই পাণ্ডব নিয়ে কেমন ঘর করছিস? অভিজ্ঞরা বলত, এ ব্যাপারটা মানব চরিত্র বিরোধী। দুটি পুরুষ ও এক নারীর এই ত্রিভুজ চিরকাল ইতিহাসে বহু অঘটন আর বিপর্যয় ঘটিয়েছে। ওরা কি সৃষ্টিছাড়া?

কিন্তু বাইরের কারো কথায় কান দিত না ওরা। পাত্তা দিত না। নিজেদের তৈরি এক দ্বীপে পরম নিশ্চিন্তে বাস করত তিনজন। লোকের চোখে আঙুল দিয়ে যেন প্রমাণ করতে চাইত, পারস্পরিক বিশ্বাস নির্ভেজাল হলে দুই পুরুষ আর এক নারীর আদর্শ ত্রিভুজও গড়ে তোলা যায়।

কিন্তু অদিশ্বর বোধহয় আড়ালে বসে হাসছিলেন তখন। না হলে মাস ছয়েক আগে এই দার্জিলিংয়েই তিনজন মিলে বেড়াতে এসে সবকিছু এ-ভাবে তছনছ হয়ে যাবে কেন?

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বলে থামে মানস। হয়তো ক্লান্ত হয়ে, অথবা পরের ঘটনাটুকু মনে মনে সাজিয়ে নিতে। রীতা অপেক্ষায় বসে থাকে। আড়চোখে একবার টিলাটার দিকে তাকায়—না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

আবার শুরু করে মানস, দার্জিলিংয়ে এসে দারুণ হৈ চৈ করে দিন কাটাচ্ছিলাম আমরা তিনজন। আমি একটু শীত- কাতুরে বলে বেশির ভাগ সময়েই সন্দীপের সঙ্গে বেরুত দীপা। আমি তাতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম।

বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, সন্দীপ নাটক লিখত। কিন্তু লেখার ব্যাপারে দারুণ খুঁতখুঁতে আর আলসে ছিল। মুড না এলে লিখত না। পেশাদার নাট্যকার ছিল না বলেই অবশ্য এই মেজাজটা ধরে রাখতে পারত। আমি, আর বিশেষ করে দীপা, এজন্য প্রায়ই বকতাম ওকে। লেখার জন্য চাপ দিতাম। কিন্তু আমাদের কোন পাত্তাই দিত না ও।

দার্জিলিংয়ে এসে একটা নতুন নাটক লেখার ইচ্ছেটা ওর ভেতর দানা বাঁধছে মনে হল। আমি আর দীপা এতে মনে মনে খুব খুশি হলাম।

একদিন গল্প করতে করতে নাক ডাকার প্রসঙ্গ এল। সংবাদপত্রের একটি সংবাদের সূত্রেই। লণ্ডনে এক মহিলা নাকি বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন জানিয়েছিলেন আদালতে ঘুমের ভেতর স্বামী ভীষণ নাক ডাকেন বলে। স্বামীর নাসিকাগর্জনে মহিলা রাত্রে ঘুমাতে পারতেন না।

সন্দীপ হেসে দীপাকে বলল, মানস কেমন সহনশীল স্বামী দেখ, সারারাত তুমি পাশে শুয়ে নাকের দামামা বাজানো সত্ত্বেও উচ্চবাচ্যটি করে না।

দীপা ঝেড়ে অস্বীকার করে, না মশাই, ঘুমের ভেতর আমার মোটেই নাক ডাকে না তোমরা আমাকে ক্ষেপানোর জন্য বললেই হল?

নাক কিন্তু সত্যি ডাকত দীপার। প্রথম প্রথম তাতে আমার ঘুমের সামান্য ব্যাঘাত যে না ঘটত, তা নয়। কিন্তু পরে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দীপাকে নাক ডাকার কথা বললে ও দারুন চটে যেত।

সঙ্গে একটা টেপরেকর্ডার নিয়ে এসেছিলাম আমরা।

শুনে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয় রীতা। একটু হেসে বলে, নিশ্চয়ই আপনার বন্ধুর মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি চেপেছিল, আপনার স্ত্রীর নাক ডাকা রেকর্ড করে আপনাদের কথাটা প্রমাণ করার?

প্রশংসার দৃষ্টিতে রীতার দিকে তাকিয়ে মানস বলে, একজাক্টলি তাই। প্রায়ই দুপুরে ঘুমোত দীপা। একদিন ও সে সময় টেপরেকর্ডারটা ওর মাথার পাশে রেখে ওর নাক ডাকার শব্দটা তুলে নিল। বলল, এখন কিছু বলিস না। রাত্রে খাবার টেবিলে এটা চালিয়ে দিয়ে অবাক করে দেব ওকে।

সন্দীপ ওর নিজের ঘরে গিয়ে একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি পোস্ট-অফিসে গেলাম অফিসে একটা জরুরি টেলিগ্রাম করার জন্য। ছুটি এক্সটেনশনের ব্যাপারে।

পোস্ট-অফিসে হঠাৎই এক চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে দেখলাম আমার দেরি দেখে বেরিয়ে গেছে সন্দীপ আর দীপা। কোন্‌দিকে যাচ্ছে সেটা লিখে রেখে গেছে। আমার খুঁজে পেতে সুবিধে হবে বলে।

একটু পরে বেরুব ভেবে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। একটু গড়িয়ে নেবার জন্য। হঠাৎ টেপরেকর্ডারের দিকে নজর পড়ল। ভাবলাম, একবার চালিয়ে দেখিতো, দীপার নাসিকাগর্জনটা কেমন এল।

টেপটা চালিয়ে চালিয়ে জায়গাটা খুঁজে নিতে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় দীপা আর সন্দীপের নিচু গলার সংলাপ শুনে একটু ব্যাক করে আবার চালিয়ে দিলাম টেপটা। আর অবাক হয়ে শুনলাম, স্পষ্ট ওদের প্রেমালাপ। স্বামীকে লুকিয়ে সন্দীপের সঙ্গে এই গোপন সম্পর্ক বজিয়ে রাখতে নাকি হাঁপিয়ে উঠেছে ও। স্বামী যতই ভালমানুষ আর হাবেট হোক, কোন্ সময় যে ওদের গোপন ব্যাপারটা আঁচ করে বসে, সে ভাবনায় আতঙ্কিত দীপা।

নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। ঘুরিয়ে আবার শুনলাম সংলাপগুলো। আবারও। কান ভুল নেই, ওদেরই কণ্ঠস্বর। দাউ-দাউ করে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল আমার। আমার বিশ্বাস আর সারল্যের সুযোগ নিয়ে এতদূর এগিয়ে গেছে ওরা?

আমাকে এত মূর্খ ভাবছে? তাহলে দেখছি অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞদের সেই কথাটাই ঠিক, দুটি পুরুষ ও এক নারীর ত্রিভুজ বাস্তবে কিছুতেই সম্ভব নয়।

পুরুষের সেন্স অপ পজেসন যে কী ভীষণ তীব্র হতে পারে, সে মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম আমি। বিশ্বাস আর ভালবাসা যত তীব্র হয় বিশ্বাসভঙ্গজনিত ঘৃণা আর প্রতিহিংসাও তত তীব্র হয়। সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্তে এলাম আমি, এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি ওদের পেতেই হবে। তার পরিণতি যাই হোক না কেন।

আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছিল, একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। চারপাশের সব কিছু আবছা। যেন স্বপ্নের ভেতর হাঁটছি।

নির্জন একটা রাস্তায় গিয়ে ওদের দেখা পেলাম একটা খাদের পাশে ঝুঁকে বুনো ফুল তুলছে দীপা। ওর হাতটা শক্ত করে ধরে আছে সন্দীপ। এই দীপা, কী হচ্ছে? সরে এস। পড়ে যাবে। আমাকেও মারবে দেখছি।

খিলখিল করে হেসে বলল দীপা, তোমার সঙ্গে সহমরণ। সে তো সৌভাগ্য আমার।

সন্দীপ বলল, এ কথা শুনলে তোমার পতিদেবতাটি হার্টফেল করবে কিন্তু।

ততক্ষণে পায়ে পায়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি আমি। ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ কি যে হল আমার! আচমকা এক ধাক্কায়—

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে রীতা অস্ফুটে বলে, ওদের খাদে ফেলে দিলেন?

হ্যাঁ। নিষ্প্রাণ, নিথর স্বর মানসের।

একটু থেমে থেকে বলল, কিন্তু আরো আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন? এর জন্য এক বিন্দু অনুতাপ হল না আমার। অপরাধবোধ জাগল না মনে। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে গুলি করে মারার পর সৈনিকদেরও বোধহয় এরকমই প্রতিক্রিয়া হয়। কে জানে।

আস্তে বলে রীতা, তারপর?

কেউ দেখতে পায়নি ঘটনাটা। আমি স্বাভাবিকভাবেই বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর রাত দশটা নাগাদ থানায় গিয়ে রিপোর্ট করলাম, আমার স্ত্রী আর বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছিল, তাঁদের কোন খোঁজ পাচ্ছি না।

পুলিশ পরদিন সকালে গভীর এক খাদ থেকে ওদের মৃতদেহ উদ্ধার করল। হোটেলের কর্মচারীদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারল, ওরা দু'জন আমার অনুপস্থিতিতেই বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে ওদের না দেখে একাই বেরিয়ে গিয়েছিলাম আমি। আর খুঁজে না পেয়ে একাই আবার ফিরে এসেছিলাম। তাদের কাছ থেকেই পুলিশ আরো একটি তথ্য জানতে পারল, আমাদের তিনজনের ভেতর কী গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

শেষ পর্যন্ত এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট বলেই ধরে নিল পুলিশ।

রীতা চাপা বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল, আর আপনিও নিশ্চিন্ত মনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মানস, তা আর পারলাম কই? তাহলে তো বেঁচে যেতাম আমি।

ঠিক বুঝতে না পেরে রীতা বলল, মানে?

মানস বলল, পুলিশের ঝামেলা মিটিয়ে দার্জিলিং থেকে নেমে আসার জন্য জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলাম। হঠাৎ সন্দীপের টেবিলের ঢাকনার নিচে কয়েক শিট কাগজ দেখে সেগুলো টেনে বের করলাম। একটা নাটকের পাণ্ডুলিপির কয়েকটা পৃষ্ঠা। বুঝলাম, একটা নতুন নাটক লিখতে শুরু করেছিল সন্দীপ। দু'একটা পৃষ্ঠা নাড়াচাড়ার পরই হঠাৎ একটা পৃষ্ঠার এক জায়গায় দৃষ্টি থেমে গেল। আশ্চর্য! টেপে দীপা আর সন্দীপের যে সংলাপ শুনেছিলাম, হুবহু সেই সংলাপ। একবার মনে হল, আমি ভুল দেখছি না তো? আবারও পড়লাম। না, দীপা আর সন্দীপের সেই গভীর প্রেমালাপের সংলাপগুলোই। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল আমার। তাহলে.....তাহলে কি সন্দীপের জেদাজেদিতে ওরা দু'জন টেপরেকর্ডার চালিয়ে নাটকের এই অংশটা অভিনয় করে দেখছিল, কেমন আসে?

আমার চোখের সামনে গোটা পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে দুলে উঠেছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, আমি আমার বিছানায় শুয়ে।

আস্তে মাথা নিচু করে মানস। চোখের সামনে মানুষটা যেন কেমন ভেঙেচুরে যাচ্ছে! এখন আর বিদ্বেষ নয়, ঘৃণা নয়, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে মানসের দিকে তাকায় রীতা। নিঃশব্দে ওর হাতের ওপর হাতটা রাখে। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে।

হঠাৎ চোখ তুলে তাকায় মানস রীতার দিকে। আবেগে ওর হাতটা চেপে ধরে। কাঁপা গলায় বলে, আমাকে তুমি বাঁচাও রীতা। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। তুমিও কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না রীতা।

আস্তে ওর মুঠি থেকে হাতটা সরিয়ে নেয় রীতা। অস্ফুটে বলে, আমাকে একটু ভাবতে দিন।

কিন্তু জানত রীতা, যতই সহানুভূতি বোধ করুক, নতুন করে কিছু ভাবার অবকাশ নেই ওর। কিছু বলারও নেই। সত্যি কথাটা বলতে হলে তো সবই স্বীকার করতে হয়। বলতে হয় ও রীতা নয়, লোপামুদ্রা। মানসীর বন্ধু নয় ও। এমনকি মৌখিক পরিচয়ও নেই মানসীর সঙ্গে। লোপামুদ্রা কলকাতার এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ অফিসের মহিলা ডিটেকটিভ। সন্দীপের মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয় সন্দেহ করেই সন্দীপের পরিবার থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল ওকে সন্দীপের মৃত্যু-রহস্য উদঘাটন করার জন্য। আরো বলতে হয়, পেশার খাতিরেই ওদের আজকের পুরো আলোচনাটাই টিলার আড়ালে বসে টেপ করে নিয়েছিল ওর বৌদি। সেই টেপটা নিয়ে কালই কলকাতায় রওনা হতে হবে রীতার, ওরফে লোপামুদ্রার।

না, এ কথাগুলো সহ্য করতে পারবে না মানস। ও কলকাতা পৌঁছানোর আগেই হয়তো আত্মহত্যা করে বসবে। তার চেয়ে ওর জীবন থেকে নিঃশব্দে সরে পড়াই ভাল। ডিটেকটিভ হলেও সেও তো একজন মেয়ে। ভালবাসার স্পর্শ চিনতে তো ভুল হয় না ওর। ভুল হয়নি।



নিরুদ্দেশ—প্রাপ্তি হারানো

সমরেশ মজুমদার

চারদিন অতিক্রান্ত হবার পর সেন বাড়ির আবহাওয়ায় টান লাগল। মাধুরী নিচু গলায় শাশুড়িকে জানাল, 'মা বাবাকে ওঁর খবর নিতে বলবেন?'

'কেন, কদিন হল?' ফুল তুলতে তুলতে শোভনা প্রশ্ন করলেন।

'চারদিন।'

'সেকি! ও তো দুদিনেই ফিরে আসে। তোমাকে কিছু বলে যায়নি?'

নীরবে মাথা নাড়ল মাধুরী। শোভনা আড়চোখে পুত্রবধূর দিকে তাকালেন। অনেক খুঁজে খতিয়ে এই মেয়েকে এনেছিলেন তিনি বেআক্কেলে ছেলেটাকে বাঁধবার জন্যে। এরকম সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না, ব্যবহারটিও ভারী মিষ্টি। কিন্তু কিছুই হয়নি। সেই মাঝরাতে টলতে টলতে বাড়ি ফেরা, চিৎকার চেঁচামেচি, অবিরত শহরের মানুষের নালিশ এবং পুলিশের শাসানি একটুও বন্ধ হয়নি। না, ঠিক হল না। মাস ছয়েক হল, বিয়ের দুমাস পর থেকেই, চিৎকার চেঁচামেচিটা শোনা যাচ্ছে না। কখন বাড়িতে আসছে কখন বের হচ্ছে টের পাওয়া যাচ্ছে না।

শোভনা বললেন, 'ঠিক আছে যাও, আমি দেখছি। মাধুরী ফিরে গেল। মেয়েটার শরীরে ঈশ্বর সব দিয়েছেন। শোভনার নিজের যৌবনের দিনেও এত পাননি। অথচ ছেলেটা এসব চোখ মেলে দেখল না। ভাগ্যিস ওর বাপ নেই, মায়ের অবস্থা ভাল নয়। নইলে এই মেয়েকে একমাসও ধরে রাখা যেত না।

ঠাকুরঘরে বসেও শোভনার অস্বস্তি হচ্ছিল। চারদিন উধাও হয়নি কখনও ছেলেটা। যখন পেটে কিছু থাকে না তখন খুব ভাল ব্যবহার, অমন ছেলে হয় না। স্বর্ণকমল অত্যন্ত সুদর্শন। দীর্ঘদেহ, গলা খুলে হাসতে জানে। কিন্তু কতক্ষণ? ঘুমের সময় বাদ দিলে বড় জোর ঘন্টা চারেক। তবে ইদানিং একটা কালচে ছায়া পড়ছে শরীরে। তিরিশ বছরেই অত্যাচারের চিহ্নগুলো শরীরে ফুটছে। কোন কিছুতেই পাল্টানো গেল না তাকে।

যে নিজে সুন্দর তার কেন সুন্দর পছন্দ হয় না বুঝতে পারেন না শোভনা। যা কিছু কুৎসিত, কুরুচির ছাপ যাতে তার দিকেই ঢলে ছেলেটা। ডাক্তার অনিল সেনের ছেলে দল বেঁধে মারপিট করছে, বাড়ির যুবতী কুশ্রী ঝি-এর সঙ্গে রসিকতা করছে কি করে তার কোন কারণ খুঁজে পান না শোভনা। সেই ছেলে চারদিন উধাও হয়ে আছে।

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নামলেন শোভনা। এখন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে যাওয়ার সময়। সকালে এই সময় যা কিছু কথা সারতে হয়। শহরের সবচেয়ে দামী এবং ব্যস্ত ডাক্তার অনিল সেন। নিচে নেমে দেখলেন ডাক্তারবাবুর জমা-কাপড় পরা

হয়ে গেছে। চিরকালই সাহেব মানুষ, নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসেন। স্ত্রীকে দেখে বললেন, 'দাগটা কেমন আছে?'

শোভনা মাথা নাড়লেন, 'তোমার ওষুধে কমবে না।'

'দেখি।' হাত বাড়ালেন ডাক্তার। মাসখানেক হল শোভনার ডান বাজুতে একটা সাদাকালো মেশা দাগ জন্মেছে। প্রথমে ভেবেছিলেন শ্বেতী কিন্তু একটু একটু করে বোঝা গেল তা নয়। ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছেন, অথচ কাজ হচ্ছে না তেমন।

শোভনা হাত নাড়লেন, 'ও এমন কিছু না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ডাক্তার বললেন, 'আবার কি হল?'

শোভনার গলায় উদ্বেগ, 'তুমি খোকার খবর নাও।'

'খোকা, কি হয়েছে তার?' ডাক্তারের গলায় বিস্ময়।

'চারদিন বাড়ি ফেরেনি।'

'কিছু বলে যায়নি?'

'না। বলে গেলে তোমায় বিরক্ত করতাম না।

'বউমা কি বলছে?'

'এ অবস্থায় একটা মেয়ে কি বলতে পারে?'

'আমি বুঝি না, সত্যি বুঝতে পারি না। স্বামী মাতলামি করছে, ছোটলোকদের সঙ্গে মিশছে, দিনরাত বেশ্যাবাড়িতে পড়ে থাকছে আর স্ত্রী হয়ে বউমা এসব সহ্য করছে কি করে? ওর তো ইতিমধ্যেই ডিভোর্স নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।'

'আমরা কি করে সহ্য করছি?' শোভনা স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন।

'তোমার জন্যে। নইলে আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করতাম।

'করনি যখন, তখন এটুকু কর।'

'কি করব?'

'ওর একটু খোঁজ নাও।

'চমৎকার! আমি যত গুণ্ডা বদমাশ মাতালদের কাছে গিয়ে বলব ও মশাই আমার পুত্ররত্নটিকে দেখেছেন? অসম্ভব! তোমার ছোট ছেলেকে পাঠাও।'

অনিল সেনের এই কথাগুলো শোভনাকে হজম করতে হল। তিনি স্বামীর চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। বেরিয়ে যাওয়ার আগে নিজেই যেন নিজেকে শোনালেন অনিল ডাক্তার, 'চিন্তা করে কোন লাভ নেই। ও ছেলের কোন ক্ষতি হবে না। আরে বাবা যারা খুনখারাপি করে তারাই তো ওর বন্ধু। যাবে কোথায়, পেটে টান পড়লেই ফিরবে।'

শোভনা দোতলার কোণার ঘরে চলে এলেন। ছোট ছেলে অরুণদীপ্তি বিছানায় উপুড় হয়ে তার কলেজের পড়া করছিল। ফরসা, দাদার মতনই লম্বা অত্যন্ত রোগা শরীর। ছাত্র হিসেবে এই জেলার প্রথম সারির। শোভনার একমাত্র গর্বের কারণ। শোভনাকে দেখে অরুণদীপ্তি উঠে বসল, 'কিছু বলবে মা?'

তোকে একটা কাজ করতে হবে বাবা। স্বর্ণ চারদিন বাড়ি ফেরেনি। এরকম কখনও করে না। তোর বাবাকে বললাম তিনি আমলই দিলেন না। তুই একটু খোঁজ নিবি?'

'কোথায় খোঁজ নেব? দাদা কোথায় যায় আমি জানি না।'

শোভনা এই নিরীহ ছেলেটির দিকে আদরের চোখে তাকালেন। বাড়ল কিন্তু বড় হল না। ওর দাদা এই বয়সেই পেতলে একটা দাঁত বাঁধিয়ে বাড়িতে অশান্তির ঝড় তুলেছিল। শোভনা বললেন, 'ওর বন্ধুদের কাছে খোঁজ খবর নে। বড় হয়েছিস, নিজের বিচার বিবেচনা নেই? ছোট্ট একটা শহরে সে কোথায় থাকতে পারে খুঁজে দ্যাখ।'

স্বর্ণকমলকে অরুণদীপ্তি ইদানিং এড়িয়ে চলে। তার দাদা গুণ্ডা বদমাসদের বন্ধু, দিনরাত মদ খায়, এই তথ্যগুলো তাকে ভীষণ হেয় করে। স্বর্ণকমলের ভাই এই পরিচয় তাকে পীড়িত করে। শোভনা চলে যাওয়ার পর সে খুব বিরক্ত মনে পোশাক পাল্টে বের হতেই মাধুরীকে দেখতে পেল। এই সুন্দরী সুশীলা বউদিটির প্রতি সে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ বোধ করে। প্রায়শই নিজেকে অমল এবং মাধুরীকে চারুলতা হিসেবে কল্পনা করে। কিন্তু স্বর্ণকমল ভূপতি? কস্মিনকালেও নয়।

অরুণদীপ্তি এগিয়ে গেল, 'বউদি?'

মাধুরী মুখ ফিরিয়ে হাসল, 'ওমা, পড়া হয়ে গেল?'

'হল কোথায়? মাতৃদেবীর আদেশ হয়েছে রামচন্দ্রকে খুঁজতে যেতে হবে।' অরুণদীপ্তি মাধুরীর সামনে এসে দাঁড়াল। এই শহরে এত সুন্দরী মেয়ে সে আর একটিও দেখতে পায়নি। তাকালেই মন নরম হয়ে যায়, বুকের ভেতরটা কেমন লাগে। মাধুরী মুখ নামিয়েছিল, অরুণদীপ্তি শুধাল, দাদা কোথায় যেতে পারে বলতো?' নীরবে মাথা নাড়ল মাধুরী, সে জানে না।

'ঠিক আছে, তুমি চিন্তা করো না, আমি দাদাকে ধরে এনে দিচ্ছি।' বউদির জন্যে কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়ে খুশী হল অরুণদীপ্তি। স্বর্ণকমলের ওপর তার যা কিছু বীতরাগ তা মাধুরীকে দেখলেই উবে যায়।

পাড়াতেই স্বর্ণকমলের এক বাল্যবন্ধু থাকে। স্থানীয় স্কুলের মাস্টার। অরুণদীপ্তির তার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তাকে দেখে মাস্টারমশাই বললেন, 'কি খবর অরুণ?'

আমার দাদাকে দেখেছেন?'

'কে, স্বর্ণ? নাতো! কি হয়েছে ওর?'

জানি না। চারদিন বাড়িতে ফেরেনি।'

'ও। তা আমার সঙ্গে তো ইদানিং যোগাযোগ নেই। মানে তুমি বুঝতেই পারছ ওর জীবন আর আমারটা আলাদা। তুমি থানায় খবর নাও।'

'থানা?' অরুণদীপ্তি চমকে উঠল, 'বাবাকে না জানিয়ে থানায় যাব?'

'ও, মেসোমশাই জানেন না বুঝি! তাহলে এক কাজ করো। রঞ্জিতকে চেন?'

'রঞ্জিত!'

'ওই যে চৌমাথায় যে লণ্ড্রিটা আছে তার মালিক। তোমার দাদার এখন খুব বন্ধু। ওর কাছে চলে যাও, ও জানতে পারে।'

সাইকেল চালিয়ে রঞ্জিতের লন্ড্রিতে চলে এল অরুণদীপ্তি। দোকানটা সবে খুলেছে। বড় গোঁফ মোটাসোটা লোকটাই রঞ্জিত। আসা যাওয়ার পথে দেখেছে অরুণদীপ্তি। সে দোকানে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই?'

'আমি স্বর্ণকমল সেনের ভাই।'

সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিতের কপালে ভাঁজ পড়ল। মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল, 'ও।'

'আমার দাদাকে আপনি দেখেছেন?'

'আমি? না তো! কেন?'

অরুণদীপ্তি হতাশ হল, 'দাদা ক'দিন বাড়ি ফেরেনি তাই।'

'না ভাই, আমার সঙ্গেও দেখা হয়নি।'

'আচ্ছা, দাদা কোথায় যেতে পারে বলতে পারেন?'

রঞ্জিত দু'মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর হেসে বলল, 'তোমরা কিছু জানো না?'

'না।'

'তাহলে আমার মুখে নাই বা শুনলে। ঠিক আছে, দেখা পেলে পাঠিয়ে দেব।'

অরুণদীপ্তি বুঝল এখানে দাদার খবর পাওয়া যাবে না। লোকটা যেন তাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে। সে মাথা নিচু করে রাস্তায় নেমে সাইকেলটা ধরে হাঁটতে লাগল। এবার কার কাছে যাওয়া যায়? কোন সূত্র যোগাড় না করে বাড়িতে ফিরলে খুব অসম্মানের ব্যাপার হবে। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ও মানুষ দেখছিল। এখন অফিসের সময় রিক্সা এবং সাইকেলের মিছিল শুরু হয়ে গেছে। কি করা যায় বুঝতে পারছিল না অরুণদীপ্তি। এই সময় একটা রিক্সা এসে সামনে দাঁড়াল। এক ভদ্রলোক ভাড়া মিটিয়ে চলে গেলে রিক্সাওয়ালা ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কি খোকাবাবু, এখানে?'

বিরক্ত হল অরুণদীপ্তি, এমনি।'

রিক্সাওয়ালাটা অনিল সেনের কাছে ওষুধ নিতে আসে প্রায়ই। সেইসূত্রে বোধহয় ওকে চেনে।

হঠাৎ ওর মনে হল প্রায় রাতেই দাদা নেশা করে রিক্সায় চেপে বাড়ি ফেরে। সে রিক্সাওয়ালাকে ডাকল, 'শোন।'

রিক্সাওয়ালা রিক্সাটা নিয়েই সামনে এগিয়ে এল। অরুণদীপ্তি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, কাল পরশু তুমি আমার দাদাকে দেখেছ?'

'স্বর্ণবাবু। না, ক'দিন তো দাদাকে দেখিনি।'

'আচ্ছা, তুমি কি রাত্রে দাদাকে কখনো এনেছ?'

রিক্সাওয়ালা হাসল, 'হ্যাঁ বাবু, অনেকবার।'

'দাদা কোত্থেকে রিক্সায় উঠল?'

রিক্সাওয়ালার মুখ কুঁকড়ে গেল। বোধহয় কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না সে।

অরুণদীপ্তি সেটা লক্ষ্য করে আশ্বাস দিল, 'তুমি নির্ভয়ে বলো। দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় নেশা করত জানলে খোঁজ করতে পারি।'

এবার রিক্সাওয়ালা বলল, 'সে বড় খারাপ জায়গা বাবু।'

'আমাকে নিয়ে যেতে পারো?'

'আপনি যাবেন! পাড়াটা ভাল না।'

অরুণদীপ্তির রোখ চেপে গেল। সে দুগ্ধপোষ্য নাকি! কড়া গলায় বলল, 'দিন-দুপুরে গেলে আমার কি হবে! তোমাকে বলছি দাদাকে দরকার। চলো, আমি যাব।'

রিক্সাওয়ালা তখনও কিন্তু কিন্তু করছিল, 'ডাক্তারবাবু জানলে—! অবশ্য শহরের অনেকেই জানে স্বর্ণবাবুকে ওখানেই পাওয়া যায়। বেশ, চলুন তবে।'

খালি রিক্সার পেছনে পেছনে অরুণদীপ্তি সাইকেল চালিয়ে শহরের এক প্রান্তে চলে এল। এদিকে একটা বড় বাজার আছে। ভীষণ ঘিঞ্জি এলাকা। বাজার পেরিয়ে একটা গলির মুখে এসে রিক্সাওয়ালা তার গাড়ি থামাল, 'স্বর্ণবাবু এই গলি থেকে বের হয়।'

অত্যন্ত নোংরা রাস্তা। পাশেই নর্দমা। সেখানে শুয়োরের পাল চরছে। দু'তিনজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক এই বেলায় ব্যাগ হাতে বাজারে যাচ্ছে। অরুণদীপ্তি বন্ধুদের মুখে এই গলির কথা শুনেছে। শহরের গণিকাদের বাস এখানে। তারা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং এই অঞ্চলে কোন ভদ্রসন্তান পথ ভুলেও পা দেয় না।

'ওখানে মদের দোকান আছে?' অরুণদীপ্তির অস্বস্তি হচ্ছিল।

'হ্যাঁ খোকাবাবু, হরি শা'র দোকান আছে।' তারপর কি ভেবে বলল, 'এক কাজ করুন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি খোঁজ নিচ্ছি, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আপনার একা যাওয়া ঠিক নয়। গলিটা খারাপ।'

রিক্সাওয়ালার পেছন পেছন অরুণদীপ্তি গলিতে ঢুকল। দুধারে চাপা চাপা ঘর। তার বারান্দায় বসে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা গল্প করছে। অরুণাদীপ্তির মনে হল এত কুৎসিত চেহারার মেয়েকে সে একসঙ্গে কখনও দেখেনি। হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে নাগর, মুখ তুলে চাও।' আর একটি কণ্ঠ খিলখিলিয়ে উঠল, 'কচি ছাগল।'

রিক্সাওয়ালা চাপা গলায় বলল, 'এসব কথায় কান দেবেন না ছোটবাবু, দিলেই পেয়ে বসবে।'

অরুণদীপ্তির মুখে রক্ত জমেছে, খুব রাগ এবং ঘেন্না লাগছিল তার। দাদা এই জায়গায় মদ খেতে আসে? আশ্চর্য! ওরা নিশ্চয়ই দাদার সঙ্গেও এইসব কথা বলে।

হরি শা-এর দোকান ঠিক মাঝখানে। তখন সবে দোকান খুলেছে। রিক্সাওয়ালা তাকে দাঁড়াতে বলে ভিতরে চলে গেল। অরুণদীপ্তি দেখল চারপাশে খুব জোরে রেডিও বাজছে, চিৎকার চেঁচামেচি চলছে এবং তারই মধ্যে একটি বালিকা অশ্লীল পোশাক পরে নেচে নিল কয়েক পাক।

রিক্সাওয়ালা বলল, 'ছোটবাবু, স্বর্ণবাবু চারদিন মাল কেনেনি এখান থেকে।'

অরুণদীপ্তি হতাশ হয়ে পড়ল, 'তাহলে।'

রিক্সাওয়ালা বলল, 'এরা সব স্বর্ণবাবুকে খুব ভয় পায়। মিথ্যে কথা বলবে না। আপনি একজনকে জিজ্ঞাসা করলে সব জানতে পারবেন, হরি শা'র ছেলে তাই বলল।'

'কাকে?'

'এখানে পদ্মা বলে একটা মেয়েছেলে থাকে দুটো ঘর নিয়ে। একটা ঘরে নাকি স্বর্ণবাবু থাকত।' লোকটা বলে, 'তুমি বুঝতেই পারছ ছোটবাবু, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আমার একটা মেয়েকে স্কুলে পৌঁছাতে হবে। তোমাকে ঘরটা চিনিয়ে দিচ্ছি চল। রিক্সাটা সেখানে সরিয়ে রেখে লোকটা তাকে নিয়ে একটা গলিতে ঢুকল। সরু ময়লা গলি। কোথাও খুব ঝগড়া বেধেছে। টিনের চাল আর কাঠের দেওয়াল দেওয়া

দুটো ঘর দেখিয়ে রিক্সাওয়ালা বলল, 'এখানে পদ্মা থাকে। তুমি কথা সেরে চলে যেও। এসব জায়গায় বেশীক্ষণ থেকো না।'

রিক্সাওয়ালা চলে যেতে অরুণদীপ্তি নাকে রুমাল দিল। বিশ্রী পচা গন্ধ বের হচ্ছে। একটা বুড়োমতন রোগা লোক দাওয়ায় বসে ছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

অরুণদীপ্তি রুমাল সরাল না, 'এখানে পদ্মা বলে কেউ থাকে?'

'থাকে। কিন্তু এখন ঘরে বসাবে না।' বুড়ো মুখ ফেরালো।

'মানে?'

'সাতসকালে বাচ্চা ছেলে ঘরে নেওয়ার মেয়ে পদ্মা নয়। তা ছাড়া ওর মেজাজ খুব খারাপ আছে, অন্য ঘর দ্যাখো।'

এবার বুঝতে পারল অরুণদীপ্তি এবং বোঝামাত্র সে সঙ্কুচিত হল। এবং সেটা এড়াতে বেশ রাগত গলায় বলল, 'আমার ওঁর সঙ্গে দরকার আছে। ডাকুন ওঁকে।'

বুড়ো একটু অবাক চোখে তাকে দেখল। তারপর বসে বসে চিৎকার করল, 'ও পদ্মা, পদ্মা, তোকে ডাকে দ্যাখ।'

একটু পরেই একটি থ্যাবড়ামুখো স্ত্রীলোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। ত্রিশের নিচে নয় বয়স, মোটাসোটা কিন্তু বুক এবং পাছা অত্যন্ত ভারী, গায়ের রঙ বেশ কালো। প্রথম দেখায় খুবই বিরক্তিকর মনে হয় এবং একটু বোকা বোকা দেখায়।

'কি চাই? ওমা, এ-যে দেখছি দুধের দাঁত পড়েনি! এই বুড়ো, তোকে বলিনি এখন আমাকে বিরক্ত করবি না!' কোমরে হাত রেখে খেঁচিয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি।

'আপনি কি পদ্মা?' সাহস করে বলল অরুণদীপ্তি।

'হ্যাঁ। নামও জানা আছে দেখছি!'

'আপনি স্বর্ণকমল সেনকে চেনেন?'

এবার দুটো চোখ যেন মাংসের আড়ালে চলে গেল, 'চিনি।'

'উনি আছেন?'

'কে আপনি?'

'আমি ওঁর ভাই।'

সঙ্গে সঙ্গে আঁচলটা পিঠে জড়ালো পদ্মা, 'ও। কিছু মনে করবেন না ভাই, আমি মানে, আসুন আসুন।'

'না, দাদা আছে কিনা তাই বলুন।

'পাঁচ মিনিটের জন্যে আসুন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে খারাপ ভাববে। আপনি স্বর্ণবাবুর ঘরেই বসবেন। দয়া করে আসুন।' পদ্মা এতবার অনুনয় করতে লাগল যে এড়াতে পারল না অরুণদীপ্তি, পাশের ঘরের দরজা খুলে একটা তক্তপোষ পরিষ্কার করে পদ্মা বলল, 'এখানে তো কোন ছিরিছাঁদ নেই ভাই, কষ্ট করে বসতে হবে। আমার কি সৌভাগ্য!'

অরুণদীপ্তি দেখল ওই তক্তপোষ এবং একটা বালিশ ছাড়া ঘরে কিছু নেই। নেই বললে ভুল হবে, অনেকগুলো খালি মদের বোতল পড়ে আছে। এইটে তার দাদার ঘর? দাদা এখানে ভাড়া নিয়েছিল? এই স্ত্রীলোকটি? অরুণদীপ্তির শরীর গুলিয়ে উঠল। বউদির শরীরের ছায়া এর থেকে ঢের সুন্দর। দাদা এই প্রায় কুৎসিত স্ত্রীলোকটির সঙ্গে থাকত? ঘিনঘিন ভাবটা বেড়ে গেল তার। আর ওই স্ত্রীলোকটি এমন ভাবে খাতির করছে যেন সে তার পরমাত্মীয়। অরুণদীপ্তি জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা আছেন?'

মাথা নাড়ল পদ্মা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে ফেরেনি, না?'

ফিরলে আমি এখানে আসব কেন? কোথায় গিয়েছেন জানেন?'

হঠাৎ আঁচলের কোণা মুখে গুঁজে পদ্মা যেন কান্না চাপল, 'আমার কথা শুনল না!'

'কি কথা?'

'ওরা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বর্ডার থেকে কিসব জিনিস আসবে, অনেক টাকার ব্যাপার। আমার খুব ভয় করছে।' পদ্মা গলার স্বরে কান্নার টোকা।

'কারা ডাকতে এসেছিল?' অরুণনদীপ্তি অবাক হয়ে গেল।

'চারজন। ওর পরিচিত। নাম বলতে পারব না। ওরা আমাকে কেটে ফেলবে। তবে স্বর্ণবাবুর যদি কিছু হয় তাহলে আমি ছেড়ে দেব না।

'দাদা এই ঘরে থাকত?'

'হ্যাঁ। সারাদিন এখানে শুয়ে মদ খেত। আমার কাজে বাধা দিত না।'

অরুণদীপ্তি ভেবে পাচ্ছিল না বাড়ি ফিরে দাদার এইসব ঘটনা বউদিকে বলতে পারবে কিনা। সে উঠল, 'দাদা যদি ফেরেন তাহলে বাড়িতে যেতে বলবেন।'

পদ্মা বলল, 'সে তো নিশ্চয়ই। আমিই তো জোর করে রোজ ওকে বাড়ি পাঠাতাম।'

অরুণদীপ্তি বেরিয়ে আসছিল, পদ্মা বলল, 'আপনি প্রথম এলেন, একটু মিষ্টি খেয়ে যাবেন?'

অরুণদীপ্তি জবাব দিল না। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে তত ভাল।

ফাঁকা রাস্তায় প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে অরুণদীপ্তি ব্যাপারটা আর একবার খতিয়ে দেখল। মাধুরীর মত অমন সুন্দরী বউকে ছেড়ে দাদা ওই পাড়ায় ঘর নিয়ে মদ গিলত? আর পদ্মার বেঢপ স্বাস্থ্য ছাড়া আর সব যে কোন ঝি-এর চেয়েও অস্বস্তিকর। দাদা তাই নিয়ে পড়ে থাকত। মেয়েছেলেটা অবশ্য তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। যেন স্বর্ণবাবুর আত্মীয় ওরও নিকটজন! এসব কথা বাড়িতে বলা চলবে না। কিন্তু দাদা কোথায় গিয়েছে? পদ্মা বলল চারজন লোক দাদুকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে। দাদা কি স্মাগলিংও করত? হয়তো। কারণ দাদার কোন রোজগার ছিল না এবং বাড়ি থেকেও পয়সা নিত না। বিয়ের সময় দাদা ব্যবসা করছিল কিন্তু বিয়ের পরেই সেটা তুলে দেয়। অন্যপথে টাকা না এলে দাদা খরচ চালাত কি করে? ওই পাড়ায় বাড়ি ভাড়া মদ খাওয়ার তো খরচ আছে।

এলোমেলো। কিছুক্ষণ সাইকেল চালিয়ে অরুণদীপ্তি হাসপাতালের সামনে এসে পড়ল। আচ্ছা, দাদার যদি কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে? উঁহু, তাহলে ওরা খবর পেত। স্বর্ণ সেনকে এই শহরের প্রত্যেকটা মানুষ চেনে। তা ছাড়া বাবার তো বিরাট পরিচয়। অতবড় ডাক্তার এই শহরে দ্বিতীয়টি নেই। অরুণদীপ্তির মনে পড়ে ছেলেবেলায়

সে দাদাকে অন্যরকম দেখেছে। খুব ভাল ফুটবল খেলত, হই হই করত সর্বক্ষণ। সেই দাদা বড় হয়ে যা কিছু সুন্দর তা থেকে এমন দূরে সরে গেল কি করে?

বাড়ি ফিরে আসার সময় ওর মনে পড়ল পদ্মা সেই চারটে লোকের নাম বলেনি। বললে লোকগুলো নাকি পদ্মাকে মেরে ফেলবে! লোকগুলো কে? কথাটা বাবাকে বলা দরকার। কিন্তু বাবাকে সে সবসময় এড়িয়ে যায়। অত রাশভারী এবং রাগী মানুষ বলে ছেলেবেলা থেকেই একটা দূরত্ব থেকে গেছে। কি করা যায়?

শোভনা ছোট ছেলের মুখে শুনলেন কোন খবর পাওয়া যায়নি। মুখ ভার হয়ে গেল তাঁর। অরুণদীপ্তি আর বউদির সামনে গেল না। খেয়ে দেয়ে কলেজে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময় অনিল সেন বাড়ি ফিরলেন, 'দারোগাকে বলে এলাম খোঁজ খবর নিতে। আর বলতে গিয়ে যা শুনে এলাম তাতে আর এই শহরে থাকা যাবে না।'

শোভনা চকিতে চারপাশে তাকিয়ে নিলেন, 'আস্তে বল, কি শুনলে?'

'তোমার ছেলে বেশ্যাবাড়িতে বসে মদ খেত। এর আগেও এক আধবার ওই ধরনের কথা কানে এসেছিল, বিশ্বাস করিনি। আজ খোদ দারোগার মুখে শুনলাম।' চোখ বন্ধ করে চেয়ারে বসে রইলেন ডাক্তার অনিল সেন।

'যা শুনেছ শুনেছ, এই নিয়ে চেঁচামেচি করো না। বউমার কানে না যায়।'

'কার ওপর চেঁচামেচি করব? ঘরের সুন্দরী বৌদের চিরকালই বেশ্যারা হারিয়ে দেয়, না? ঠিক আছে, তোমরা সরে যাও, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।' অনিল সেন হাত নাড়লেন। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো শুনে অরুণদীপ্তির বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। যাক, কোন কথা তাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না।

বিকেলে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে অরুণদীপ্তি থানায় গেল। সারাটা দুপুর ওই চারটে লোকের কথা মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে। পুলিশ যদি পদ্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে নিশ্চয়ই একটা সূত্র পাওয়া যাবে। সে ঠিক করেছিল চুপিচুপি দারোগাবাবুকে খবরটা দিয়ে আসবে। এর আগে কখনও সে থানায় ঢোকেনি। চারধারে পুলিশ এবং বিচিত্র চেহারার লোকজন।

স্লিপ পাঠিয়ে শুনল দারোগাবাবু খুব ব্যস্ত, এখনই বের হবেন। কিন্তু তার ডাক এল। ঘরে ঢুকে দেখল কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে দারোগাবাবু কথা বলছেন। তাকে দেখে কথা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ডাক্তার সেনের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'কি দরকার বলুন। আমি খুব ব্যস্ত। আপনার দাদার ব্যাপার তো? কিছু মনে করবেন না, উনি এই শহরে নেই জেনে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি। শুধু ডাক্তার সেন খুব শ্রদ্ধেয় মানুষ তাই—।' দারোগাবাবু জানালেন।

একজন অফিসার মনে করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে বললেন, 'স্যার, ওই ডেডবডিগুলোর কথা বলবেন বলছিলেন ডাক্তারবাবুকে—।'

'ও হ্যাঁ। গত তিনদিন আমরা দুটো বেওয়ারিশ ডেডবডি পেয়েছি। আমার লোক আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। আপনারা দেখতে পারেন।'

'ডেডবডি?' অরুণদীপ্তি কেঁদে উঠল।

'হ্যা। একটা নেপালির। নিশ্চয়ই আপনার দাদা নন। অন্যটি মনে হচ্ছে বুড়ো মানুষের। তবে ডিসফিগারড। মাথার চুল সাদা।'

অরুণদীপ্তি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, 'আমার দাদা বুড়ো নয়।'

'জনি। তাই গা করিনি। এটা আমাদের রুটিন চেক।' দারোগাবাবু বললেন।

'আমি একবার দেখব দারোগাবাবু।' মেয়েলি গলা শুনে চমকে উঠল অরুণদীপ্তি। সে দেখল ঘরের এক কোণায় বেঞ্চিতে বসে আছে পদ্মা। মাথায় ঘোমটা। ও যে এই ঘরে আছে তা সে লক্ষ্যই করেনি এতক্ষণ।

'আঃ তখন থেকে নাকে কাঁদছে। ল্যাংটো ব্যাটাছেলে না দেখলে নোলা শুকোচ্ছে না! স্বর্ণবাবু কোথায় গিয়েছে তুমি জান না?'

'না বাবু, আমি তো বারবার বলছি, আমায় কিছু বলে যায়নি সে।'

'ওষুধ খাবে নাকি?'

'আমি সত্যিকথা বলছি বাবু। উনি শুধু আমার ওখানে থাকতেন, আর কিছু না।'

'নেকি! লীলা করতেন নীল মাখতেন না। ঠিক আছে যাও, কিন্তু ডাকলেই যেন পাই। আর মিথ্যে কথা বলেছ, জানলে চামড়া ছাড়িয়ে নেব। দারোগাবাবু টুপিটা তুলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা ভাই, আপনার বাবাকে বলবেন আমরা চেষ্টা করছি।'

অরুণদীপ্তি বলতে গেল যে এই মেয়েছেলেটা চারটে লোকের খবর জানে, ওকে চাপ দিন। কিন্তু তার আগে পদ্মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, 'দারোগাবাবু, আমাকে একবার মড়া দেখতে দেবেন?'

দারোগা বললেন, আশ্চর্য! ও-দুটোর সঙ্গে স্বর্ণবাবুর কোন মিল নেই তবু দেখতে চাইছ কেন? আর তোমার চেয়ে ওর ভাইকে দেখালে বেশী কাজ হবে!'

'ওই যে আজ বললেন পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছে।'

'হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?

'পাহাড়ের কাছেই তো বর্ডার।'

'হ্যাঁ।'

'স্বর্ণবাবু কিছুদিন আগে বর্ডারের কথা বলছিলেন।'

'আই'সি। এতক্ষণ বলনি কেন?

'অনেক কথাই তো বলত। সব মনে রাখা যায়?'

'দারোগাবাবু বললেন, কিন্তু এই লোকটা তো বুড়ো! আপনি কি দেখবেন?' প্রশ্নটা অরুণদীপ্তিকে। অরুণদীপ্তি বলল, 'যদি বুড়োমানুষ হয় তাহলে দেখে কি করব? তা ছাড়া আমার দাদার চুল সাদা ছিল না।'

এই সময়ে বাইরে হইচই শুরু হল। দারোগাবাবু অফিসারদের নিয়ে বেরিয়ে যেতে অরুণদীপ্তি আর দাঁড়াল না। এই মুহূর্তে দারোগাকে ওসব কথা বলা যাবে না। পদ্মাকে যখন পুলিশ এখানে এনেছে তখন কাল সকালেই বললে চলবে। সে হন

হন করে বারান্দা ডিঙিয়ে সাইকেলে উঠল। পদ্মার সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি তার ছিল না।

অনিল সেনের বাড়ির পেছনে সুন্দর বাগান এবং পুকুরঘাট আছে। অপরাহ্নে ম্লান ছায়ায় সেই ঘাটে বসে জলের শরীর দেখছিল মাধুরী। দুদিন না বলে কয়ে যে উধাও হয়েছে সে চারদিন হতে পারে। তবু চারদিন তাই সে শাশুড়িকে জানিয়েছিল। স্বর্ণকমল কখন আসে কখন যায় এবাড়ির কেউ খবর রাখে না। বেশীরভাগ দিন বাড়িতে খায় না, থাকলে ঘর ছেড়ে বের হয় না। অনেক কান্নাকাটি অনেক চেঁচামেচির পর এখন সম্পর্কটা থিতিয়ে রয়েছে। স্বর্ণকমল সেদিন নেশার ঘোরে বলেছিল, 'কেন পড়ে আছ বুঝি না। চেহারা ভাল স্বাস্থ্য ভাল। ডিভোর্স চাও দিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি কি দোষ করলাম?' মাধুরী স্পষ্ট শুধিয়েছিল।

'কিছু না। সুন্দরী মেয়ে আমার সহ্য হয় না। পুতুল পুতুল লাগে।'

'তাহলে বিয়ে করলে কেন?'

'এই কেন'র উত্তর যদি জানতাম! ডাক্তার অনিল সেনকে জিজ্ঞাসা কর কেন আমি বিয়ে করেছি। তা ছাড়া, তোমাকে দেখলে আমার একটুও উত্তেজনা আসে না।

মাধুরী কিছুই দেখছিল না। একটা অবশ–অনুভূতি সর্বাঙ্গে নিয়ে বসেছিল। আট মাস তো হয়ে গেল। এবার বাপের বাড়ি চলে গিয়ে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেই হয়। লোকটা তো তাই চাইছে। আর এখন যদি সে মুক্ত হয় তাহলে—! মাধুরী দুহাতের বেড়ে চিবুক রাখল। না, পুরুষের অভাব হবে না তাকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে। এই আটমাসে লোকটার ওপর তার একটুও মায়া পড়েনি। নিজের কাছেই অবাক লাগে, সে এখনও কুমারী রয়ে গেল! মাধুরী সিদ্ধান্ত নিল। এবার লোকটা ফিরলে কথা বলে ছেদ টানতে হবে। তার বিয়ের আগে তো কৃপাপ্রার্থীর অভাব ছিল না, তাহলে নিজেকে সে বঞ্চিত করবে কেন? মাধুরী দেখল, কি একটা পুকুরে পড়ল। শব্দ হল, ঢেউ কাঁপুনি ছড়াল এবং একসময় মিলিয়ে গেল। বাঃ, চমৎকার।

'কি ভাবছ বউদি?'

মাধুরী চমকে মুখ তুলল। তারপর হেসে বলল—'আমার ভাগ্যটার কথা।'

'দূর! ওসব ভেবে কি হবে। ওঠো তো! অরুণদীপ্তি তাগাদা দিল।

'কেন?'

'এক জায়গায় বসে থাকতে হবে না। দাদা দাদার মত আছে তুমি তোমার মত থাকো না! চল, হাঁটি। অরুণদীপ্তি হাত বাড়াল।

'কী নিয়ে থাকব অরুণ!'

'কত কি আছে পৃথিবীতে।'

'ছেড়ে দাও এসব কথা। কোন খবর আসেনি না?'

'না।'

'খবর না আসা পর্যন্ত আমি যেতেও পারছি না।'

'যাবে, কোথায় যাবে?'

'তোমাদের বাড়িতে আমার সংসার করা হল না অরুণ। তোমার দাদা আমাকে ডিভোর্স দিতে চাইছেন। এভাবে তো কোন মানুষ থাকতে পারে না। ভেবেছিলাম একবছর দেখব। কিন্তু না, ও ফিরে এলেই আমি চলে যাব।'

এই সময় একটি চাকর বাগানে এসে দাঁড়াল, 'ছোটবাবু, আপনাকে ডাকছে।'

'কে?'

'একটা মেয়েছেলে। নাম জানি না।'

অরুণদীপ্তি অনুমান করতে পারছিল না। হন হন করে সে সামনের গেটে পৌঁছে হোঁচট খেল। পদ্মা দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে সেই বুড়োটা। রাগে মাথায় আগুন জ্বলল। সে চকিতে পেছন ফিরল, না, কেউ নেই। কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই? এখানে কেন?'

পদ্মা যেন সেসব গায়েই মাখল না। তার গলা কাঁপছে, 'আমি মড়া দেখে এলাম।'

'তা আমাদের কি?'

'আমার মনে হচ্ছে, 'ডুকরে উঠল পদ্মা, 'মনে হচ্ছে ওটা স্বর্ণবাবুর শরীর।'

'কি যা–তা বলছ?' চিৎকার করল অরুণদীপ্তি, 'দারোগা বলল লোকটা বুড়ো!'

ঘনঘন মাথা নাড়ল পদ্মা। তার চোখ জলে বন্ধ, ঠোঁট টিপে রেখেছে। অরুণদীপ্তি আবার আড়চোখে বাড়ির দিকে তাকাল। মা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ওখান থেকে যদিও কোন কথা শুনতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকটির পরিচয় জানতে চাইবেন। হঠাৎ পদ্মা বলল, 'আপনারা একবার দেখুন। আমি প্রায় নিশ্চিত যে উনিই স্বর্ণবাবু। তবু মানুষের তো ভুল হয়।'

'দারোগা বলেছিল লোকটার চুল সাদা। দাদার তো কালো চুল।'

'উঁহু, উনি মাথায় রং মাখতেন। একটু পাকতে আরম্ভ করলেই রঙ মাখা শুরু করেছিলেন। আপনার মা বউদিকে জিজ্ঞাসা করুন।' পদ্মা তখনও কেঁদে যাচ্ছিল। আর বুড়োটা মাঝে মাঝে বলছিল, 'কাঁদিস না পদ্মা, কাঁদিস না।'

অরুণদীপ্তি ভেতরে ভেতরে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। দাদার মাথার চুল সাদা ছিল? এক বাড়ির ছেলে হয়ে সে জানত না। হঠাৎ এই স্ত্রীলোকটিকে সে ঈর্ষা করতে আরম্ভ করল। এবং সেই কারণেই ক্রোধ প্রকাশ করতে পারল অরুণদীপ্তি, 'কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন? বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছ তুমি?'

'বাঃ আমি কাঁদব না? আমি তো কিছুই চাইনি, একটু কাঁদতে পারব না! আপনি আর দেরি করবেন না। আমি পুলিশকে বলে এসেছি। আপনি গিয়ে একবার দেখুন, আপনার বউদি যদি যায় খুব ভাল হয়। আপনারা যদি চিনতে পারেন তাহলে আমি ওই চারজনকে ছাড়ব না। একবার শুধু বলে দিন ওটা স্বর্ণবাবুর শরীর তাহলেই আমি বদলা নেব।' হিসহিস শব্দ করল পদ্মা।

এবার নাড়া খেল অরুণদীপ্তি। সেই চারজনের প্রসঙ্গ মনে পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এদের কথা তুমি পুলিশকে বলেছ?'

'মাথা খারাপ! সঙ্গে সঙ্গে ওরা পিছলে বেরিয়ে যাবে। আপনি আসুন, আমি ওখানেই যাচ্ছি।' পদ্মা ফিরে গেল বুড়োকে নিয়ে।

কিছুক্ষণ কি করবে বুঝতে পারল না অরুণাদীপ্তি। পেছনে ফিরলেই মা তাকে ইশারায় ডাকবেনই। না, নিজের চোখে দেখবে সে। নিজের দাদাকে সে ভাল চেনে। কে কি বলল আর সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে হবে! বরং ফিরে এসে মাকে গল্পটা বলা যাবে। অরুণদীপ্তি গেট খুলে বেরিয়ে এল।

নদীর পাশে মর্গ। অরুণদীপ্তি পৌঁছে দেখল পদ্মারা তার আগে এসে গিয়েছে। একজন পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। অরুণদীপ্তি তার সাহায্যে মৃতদেহের কাছে পৌঁছোল। উৎকট পচা গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল তার। তখন মর্গে মাত্র দুটো মৃতদেহ। নাকে রুমাল দিয়ে তাদের সামনে পৌঁছে অরুণদীপ্তি দেখল পদ্মাও তার সঙ্গ নিয়েছে। ডোমটা দেখাল। একটি নেপালির তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দ্বিতীয়টির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠল যেন। উঃ, কি ভয়ানক!

লোকটার চোখ দুটো নেই। দুটো ঠোঁট কেটে নেওয়া হয়েছে। বুকের কাছে বিশাল ক্ষত। হাত এবং পা, কবজি এবং গোড়ালির ওপর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। থাই-এর কাছে ক্ষত। সমস্ত শরীর বেঢপ ফুলে নীলচে কালো হয়ে রয়েছে। দুবার তাকালেই চোখ বন্ধ হয়ে আসে। এবং চুল সাদা কিন্তু একটা কালচে ভাব আছে। অরুণদীপ্তি মাথা নাড়ল, না এ তার দাদা নয়। দাদার শরীরের আকৃতির সঙ্গে মিলছে না। নাক কান তো সব মানুষের একরকম হতে পারে। সে মাথা নাড়ল।

সেটা দেখে পদ্মা বলল, 'যাতে কেউ চিনতে না পারে তাই ওইরকম কেটে দিয়েছে। স্বর্ণবাবুর বুক আর থাই-তে জড়ুল ছিল, সেখানটাই কেটেছে।'

মাথা নাড়ল আবার অরুণদীপ্তি, 'এ আমার দাদা নয়।'

'দাত দেখুন, ভেতরের দাঁত, পেতলে বাঁধানো।' চাপা গলায় বলল পদ্মা।

ডোম হাঁ-মুখ দেখার ব্যবস্থা করে দিলে অরুণদীপ্তি চমকে উঠল। হ্যাঁ, পেতলের দাঁত এবং পেতলের ওপর এস লেখা, খুব সূক্ষ্মভাবে। তার মাথাটা ঘুরে গেল। কোনরকমে সামলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। পুলিশটা জিজ্ঞাসা করল, 'কি, চিনতে পারলেন?'

মাথা নাড়ল অরুণদীপ্তি। না। তারপর প্রায় দৌড়ে বড় রাস্তায় চলে এসে রিক্সা নিল।

মায়ের ঘরে ঢুকল অরুণদীপ্তি। তার শরীর টলছিল! চেহারা দেখে আঁতকে উঠলেন শোভনা। তারপর উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি, 'কি হয়েছে?'

'দাদা।'

'কোথায়?' শোভনার মুখে উদ্বেগ। বুঝতে পারছিলেন খবরটা ভাল নয়।

'মর্গে। ওরা দাদাকে মেরে ফেলেছে।'

একটা আর্তনাদ ছিটকে এল শোভনার গলা থেকে, 'কি বললি?'

বিছানায় বসে দুহাতে মুখ ঢাকল অরুণদীপ্তি। তার শরীর কাঁপছিল।

'কি হয়েছে আমাকে খুলে বল।' শোভনা ছেলের দুই কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন।

অরুণদীপ্তির সময় লাগল। স্থির হয়ে বসতে পারছিল না। তারপর এক এক করে সে সমস্ত ঘটনা উগরে গেল। শেষ হওয়ামাত্র শোভনা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'তুই দেখেছিস পেতলের ওপর এস লেখা?'

মাথা নাড়ল অরুণদীপ্তি, 'হ্যাঁ।'

'আর শরীর? হাত পা মুখ?'

'চেনা যাচ্ছে না, কিচ্ছু চেনা যাচ্ছে না।'

'পেতলে এস লিখে কেউ তো দাঁতে বসিয়ে দিতে পারে, পারে না?'

অরুণদীপ্তি চমকে উঠল, 'কেন বসাবে?'

'যারা খুন করেছে লোকটাকে তারা লুকোতে চাইবে। আবার এও তো হতে পারে, আর একটা লোকের পেতলের দাঁতে এস লেখা ছিল। একটা পেতল দিয়ে মানুষ চেনা যায়? না, আমি বিশ্বাস করি না। যে ছেলেকে আমি পেটে ধরেছি তার শরীর একবার দেখলেই আমি চিনতে পারব। আমি না দেখা পর্যন্ত তুই কাউকে এসব কথা বলবি না।' শোভনার কণ্ঠ কঠোর।

পরদিন ভোরে দারোগাবাবু এলেন, 'আমি বুঝতে পারছি আপনাদের খুব কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন উপায় নেই। যে লোকটিকে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না তার সম্পর্কে গতকাল একটি স্ত্রীলোক দাবী করেছিল স্বর্ণবাবু বলে। আমরা আমল দিইনি।'

'স্ত্রীলোক?' অনিল সেনের চোখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। বাজারের মেয়ে। কিন্তু আজ সকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। খুনী ধরা পড়েনি। মনে হচ্ছে সে চিনতে পেরেছে বলেই খুনী তাকে বাঁচিয়ে রাখেনি।'

'একটা বাজারের মেয়ের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?'

'আপনার নয়। স্বর্ণবাবুর তো সুনাম ছিল না। বডি যদি স্বর্ণবাবুর হয় তাহলে কেস খুব জটিল হয়ে যাবে। সমস্ত শহরের লোক জেনে গিয়েছে। এখন আপনারা একবার যদি আইডেন্টিফাই করে দেন তাহলে মেয়েটির খুনী সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করতে পারি।' দারোগাবাবু জানালেন।

অনিল সেনের চোয়াল ঝুলে পড়েছিল। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো স্বর্ণকে চেনেন। আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারছেন না?'

'না। কারণ ওর হাত পা চোখ ঠোঁট সব কেটে নেওয়া হয়েছে। শরীরের রঙ পাল্টে গেছে, চুল সাদা এবং অনেক ক্ষত।'

'চুল সাদা? আমার ছেলের চুল সাদা ছিল না।'

'আমরা তাই জানি। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কাল বলেছে স্বর্ণবাবু চুল রঙ করত। আজ আমি সেটা দেখে প্রমাণ পেয়েছি। আমার মনে হয় একমাত্র আপনার স্ত্রী এবং বউমা ছাড়া আর কারো পক্ষে এই অবস্থায় ওকে চেনা মুস্কিল।' দারোগাবাবু বললেন।

অনিল সেন এবার প্রতিবাদ করলেন, 'আমার বাড়ির মেয়েরা যার তার মড়া দেখতে যাবে? অসম্ভব!'

ঠিক তখনই শোভনা এলেন, 'আমি যাব।'
'তুমি যাবে?' অনিল সেন চমকে উঠলেন।
'হ্যাঁ। ভুল বোঝাবুঝির শেষ হওয়া উচিত। বউমাকে আমি বলেছি, সে-ও যাবে।
অনিল সেন হতাশ গলায় বললেন, 'যা হয় করো, আমার আর মুখ দেখানোর উপায় রইল না। তবে ওটা যদি স্বর্ণ হয় তাহলে বউমা বেঁচে গেল, এটুকুই লাভ।'

সমস্ত শহর মর্গের সামনে ভেঙে পড়েছে বললে খুব বেশী বলা হবে না। স্বর্ণকমল সেনের ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে পাহাড়ে। এই শহরের এককালের টেরর স্বর্ণকে কেউ খুন করেছে কিন্তু চেনা যাচ্ছে না ভাল করে। শহরের এক বেশ্যা যে কিনা স্বর্ণর রক্ষিতা ছিল সে চিনতে পেরেছে বলেই খুন হয়ে গেছে। রহস্যের গন্ধ এতটা প্রবল যে সবাই ভিড় করে এসেছে খবর পেয়ে। এই অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে শোভনা বউমা আর ছোট ছেলেকে নিয়ে মর্গের সামনে নামলেন। সাদা ফুলতোলা শাড়ি আর কাজকরা জামা, মাথায় ঘোমটা মাধুরীকে দেখছিল সবাই। শোভনার পোশাকেও রুচির ছাপ রয়েছে। চারপাশে গুঞ্জন শুরু হল। দারোগাবাবু ওদের নিয়ে দরজার সামনে এলেন। আপনারা একটু শক্ত থাকবেন। বডি পচছে। খুব দুর্গন্ধ। একসঙ্গে যাবেন?'
শোভনা বললেন, 'আমি আগে যাব। আমি না চিনতে পারলে বউমা যাবে।'
দারোগা একটু ইতস্তত করে রাজী হলেন। ডোম নিয়ে গেল ঘরে। শিউরে উঠলেন শোভনা। ভগবান, মানুষ এত নির্দয় হয়? কিন্তু এ কি স্বর্ণ! শরীরের যেসব জায়গায় ক্ষত সেখানেই চিহ্নগুলো ছিল। ওর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখ ভাঙা ছিল, সেটাও এখন প্রমাণ করা যাবে না। চিনতে না পেরে এই দুর্গন্ধটাকেও সহ্য করে ফেললেন শোভনা। ডোমকে বললেন, 'ওদের ডাকো।
মাধুরী এল। মুখে আঁচল চেপে। ফ্যালফ্যাল করে দেহটাকে দেখল। এই প্রথম একটি নগ্ন পুরুষের দেহ দেখল সে। স্বর্ণকমল কখনও তার সামনে নগ্ন হয়নি। দারোগা জিজ্ঞাসা করল, 'চিনতে পারছেন? ওর চুল সাদা ছিল?'
একদিন চুলের গোড়া সাদা দেখেছিল মাধুরী, পরদিনই কালো। বাইরে রঙ করে আসতেন। কিন্তু এত সাদা? সে জিজ্ঞাসা করল, 'দাত দেখব? মনে হয় দাঁতটা বাঁধানো ছিল।'
'ও হ্যাঁ। কাল স্ত্রীলোকটি তাই বলেছিল বটে। আমার খেয়াল ছিল না।' দারোগার নির্দেশে ডোম দাঁত দেখাল। দুটো দাঁত নেই। কিন্তু কোন পেতল দেখা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন শোভনা, 'না, এ আমার ছেলে নয়।'
দারোগা ডোমের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'পেতলের দাঁত কোথায়?'
ডোম মাথা নাড়ল, 'হামি জানে না সাব।'
দারোগা বিড়বিড় করলেন, 'কি আশ্চর্য! স্ত্রীলোকটি বলল একটা পেতলের দাঁত আছে আর এখন দুটো দাঁত উধাও।' তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাত্রে কেউ এখানে ঢুকেছিল?'
ডোম সজোরে প্রতিবাদ করল, নেহি সাব।'

শোভনা পুত্রবধূকে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন। দারোগা তাঁকে আবার অনুরোধ করলেন, 'মিসেস সেন, ভাল করে দেখুন, আর কোন চিহ্ন আছে কি না''
শোভনা মাথা নাড়লেন, 'কি আশ্চর্য! আমার ছেলেকে আমি চিনব না?'
দারোগা মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি মনে হচ্ছে? ইনি আপনার স্বামী নন?'
কি বলবে মাধুরী! স্বর্ণকলমকে যতটা সে দেখেছে তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? সে নিচু গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না।
ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখনই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। মা এবং স্ত্রী বলেছে ওটা স্বর্ণকমলের শরীর নয়। নাটকটা জমল না বলে ভিড় পাতলা হল। দারোগা বললেন, 'ওই স্ত্রীলোকটির জন্যে আপনাদের বিব্রত করলাম, উপায় ছিল না। তবে ভালই হল, স্বর্ণবাবু বেচে আছেন জেনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি কেন খুন হল বুঝতে পারছি না।'
এই সময় স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ নিয়ে আসা হল মর্গে। ক্ষতবিক্ষত চেহারা। কারা যেন কুপিয়ে মেরে গেছে। শোভনা সেদিকে না তাকিয়ে পুত্রবধূকে নিয়ে রিক্সার কাছে চলে এলেন। অরুণদীপ্তি রিক্সার পাশে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, 'চিনতে পারলে না?'
শোভনা মাথা নাড়লেন, 'না, তোর দাদা নয়। ওরা বলছিল পেতলের দাঁত কিছু, কিন্তু আমরা তো দেখতে পেলাম না। অত কুৎসিত শরীর তোর দাদার নয়।' কথাটা শুনে আঁতকে উঠল অরুণদীপ্তি। সেই চারজন লোক! চকিতে পদ্মার কথা মনে পড়ল। ওর মুখ দেখে শোভনা ধমক দিলেন, 'হাঁ করে কি দেখছিস? তাড়াতাড়ি বাবাকে খবর দে। এ স্বর্ণ নয়, আমাদের কিছুই হারায়নি, তিনি মাথা উঁচু করে প্র্যাকটিশে যেতে পারেন।যা।'
বিহ্বল অরুণদীপ্তি বেরিয়ে গেলে শোভনা রিক্সায় উঠলেন। হঠাৎ শোভনা আবিষ্কার করলেন মাধুরী ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে আছে। অসহিষ্ণু গলায় তিনি ডাকলেন, কি দেখছ ওদিকে, উঠে এসো।'
মাধুরী নিঃস্ব গলায় বলল, 'ওই মেয়েটাকে ওরা এক ঘরে ঢোকাচ্ছে, মা।'
শোভনা বললেন, 'তাতে তোমার কি?'
মাধুরী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, আমার কি!'



চিত্রার অদৃশ্য মৃতদেহ

অনীশ দেব

আসুন, আমার বউ চিত্রার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। ওই যে, সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বেশ জোরাল গলায় গান গাইছে। গানে সুর নেই বটে, কিন্তু কথা তো আছে। কথা হল চিত্রার সবচেয়ে প্রিয়। দিনে কম করে আড়াই লক্ষ শব্দ উচ্চারণ করে এই রমনী। বোধহয় আগের জন্মে চড়ুই পাখি ছিল।

চিত্রার শরীরে যৌবন আছে। বড় বেশিরকম যৌবন। গায়ের রঙ মাজা। মুখের শ্রী মাঝারি। যখন, প্রায় এক যুগ আগে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তখনও ওর চেহারা একইরকম ছিল। না, ভুল ভেবেছেন, ভালোবেসে আমাদের বিয়ে হয়নি। বরং বলা যায়, ওই ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল প্রয়োজন থেকেই। আমরা দুজনে সরকারি আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখতাম। তখন চিত্রা একটু বেশি আহ্লাদী আর গায়ে-পড়া ছিল। ওকে দেখে আমার সবসময়েই মনে হত, সন্তান উৎপাদনের বকযন্ত্র। এর অদৌ কোনও মানে হয় কিনা জানি না, কিন্তু মনে যে হত সেটা সত্যি। অথচ বিয়ের পরে জেনেছিলাম চিত্রা বন্ধ্যা বসুন্ধরা।

দারুণ নম্বর পেয়ে পাশ-টাশ করার পর বিদেশে যাওয়ার একটা সুযোগ পেলাম। এরকম স্বপ্ন আমার একটু-আধটু ছিল। কিন্তু যাতায়াতের প্লেনভাড়া জোটানোর ব্যাপারটা আমার কাছে ছিল রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। কোথেকে টাকা পাই? ঠিক তখনই সহপাঠী অতনু একটা মতলব শোনাল। বলল, চিত্রার বাবা নাকি জামাই খুঁজছেন।

প্রথমটা আমার লজ্জা করেছিল। অনেক নীতি-ফিতি ছিল ছোটবেলা থেকে। কিন্তু বেশ মনে আছে, কয়েকটা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। মনের মধ্যে রোজই চলত লড়াই। উচ্চাশা আর নীতির দাঁত নখ লড়াই। আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত কে জিতবে। উচ্চাশাই জিতল। চিত্রার বাবার কাছে মাথা জমা দিয়ে বিদেশে গেলাম। না, আমি একা নয়, সঙ্গে ছিল আমার নতুন বউ চিত্রা।

কলেজ থেকে পাশ করে বেরোনোর পর থেকেই চিত্রার ছবি আঁকার শখ মিটে গিয়েছিল। তার বদলে ওর নিত্যনতুন শখ গজাতে লাগল। দেশ বেড়ানো, সেলাই, মডেলিং, হাতের কাজ, আরও সব কতরকম কিম্ভূত শখ। আমি যখন মনপ্রাণ দিয়ে ছবি আঁকতাম তখন চিত্রা কানের কাছে বকবক করে যেত ওর নতুন শখের বৃত্তান্ত। আমার তুলির টান ভ্রষ্ট হত। নিবিড় মনোযোগ নষ্ট হত। কিন্তু ক্রীতদাস আমি কি-ইবা করতে পারি। সহ্য করাটাই যে আমার একমাত্র গুণ।

বিদেশ থেকে দেশে ফিরে বছর গড়াতে লাগল, আর চিত্রার কথাও বাড়তে লাগল সমানুপাতিক হারে। এছাড়া আমার প্রতিটি ছবির প্রথম সমালোচক হল চিত্রা। সাদা ক্যানভাসে তুলির প্রথম আঁচড়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানের কাছে শুরু হয়ে যেত ওর সমালোচনার ধারাবিবরণী। এ যে কী অসহ্য যন্ত্রণা! এমনও হয়েছে, আমার অজান্তে আমার অসমাপ্ত ছবিতে নিজের খুশিমতো বেশ কিছু রদবদল করে দিয়েছে চিত্রা। তারপর ভোরবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বুক অসভ্য ভাবে উঁচু করে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলেছে, এবার ভালো দেখাচ্ছে না? আমি ছোট্ট করে 'হুঁ' বলে চুপ করে থেকেছি। কিন্তু মাথার ভেতরে তখন টগবগ করে রক্ত ফুটছে।

গত বারো বছর তিন মাস সময়ের মধ্যে চিত্রার অন্তত সতেরোটা ছবি আঁকতে বাধ্য হয়েছি আমি। কখনও ওর পরনে চটুল পোশাক, কখনও-বা পোশাকহীন নিরাবরণ। কিন্তু একটা ছবিও ওর পছন্দ হয়নি। কারণ, ওর মতে ছবিগুলোতে হয় ওর ব্যক্তিত্ব ফোটেনি, কিংবা ওর চোখের অতলান্ত গভীরতা ধরা পড়েনি, নয়তো ওর সুললিত যৌবনের কোমলতা অনুপস্থিত।

হ্যাঁ, আমি জানি, ছবিগুলো ওর মতো হয়নি। কারণ, তুলির প্রথম টান শুরু করার পর থেকেই আমার বুকের ভেতরে দাস-মনোবৃত্তি তোলপাড় করত। মনে হত, একটা শেকল বাঁধা জানোয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে। তখন ওই বিকৃত মনের অবস্থায় যে-ছবি আমি আঁকতাম তাতে চিত্রার ঠোঁটজোড়া হত বিশাল, চোখে থাকত শয়তানি, আর শরীরে ঝরে পড়ত পাশবিক কামনা।

এখন আমার ছবি বেশ ভালোই বিক্রি হয়। শিল্পী হিসেবেও আমার নাম-ডাক হয়েছে। ইচ্ছে করলে এবং চেষ্টা করলে চিত্রার বাবার দেওয়া সেই প্লেনের টিকিটের দাম এখন আমি সুদসমেত শোধ করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। চিত্রা তো থাকবে আমার কাছেই, শোবে আমার সঙ্গে, আমার প্রতিটি তুলির টানের কুৎসিত সমালোচনা করবে, নিজের বীভৎস সব শখ নিয়ে অনর্গল কথা বলে যাবে, আর আমার কানের পরদা কেঁপে যাবে অবিরাম। এইভাবে চিত্রার শব্দদূষণে ক্রমাগত ডুবে যাব আমি। শেষ পর্যন্ত হয়তো পাগল হয়ে যাব।

সুতরাং এইরকম একটা মনের অবস্থায় যদি আমি চিত্রাকে খুন করার কথা ভেবে থাকি তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবেন না। এও জানি, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, অ্যাদ্দিন কি করছিলেন, মশাই? বারো বছর ধরে এই যন্ত্রণা সহ্য করছেন! অনেক আগেই আপনার ওকে খতম করে দেওয়া উচিত ছিল।

মানছি, উচিত ছিল। বহুবার ভেবেছি ওকে খুন করার কথা, কিন্তু ক্রীতদাসের সাহসে কুলোয়নি। তাছাড়া, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ও ছিল। আর ধরা পড়লেই তো ছবি আঁকা শেষ! যে-ছবি আঁকার চর্চার জন্যে এত কাণ্ড, সেই ছবিই যদি না আঁকতে পারি, তাহলে চিত্রাকে খুন করে লাভ কি!

কিন্তু নিয়তি বোধহয় আমার নিঃশব্দ হাহাকার শুনতে পেয়েছিল। তাই একদিন ধর্মতলার মোড়ে দেখা হয়ে গেল অনুতোষের সঙ্গে। অনুতোষ আমার সঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়ত। এখন বিশাল বিজ্ঞানী। সবসময়েই লণ্ডন-আমেরিকা করে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া

অনুতোষ ছবিরও সমঝদার। ফলে আমার নাম জানত। শুধু জানত না, আমিই ওর স্কুলের সেই মুখচোরা সহপাঠী।

অনুতোষ আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে। ওর নানান আবিষ্কার দেখাল। তার মধ্যে একটা যন্ত্র আমাকে অবাক করে দিল। যন্ত্রটা নিয়ে অনুতোষ এখনও গবেষণা করছে। তবে তার গুণাগুণ শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। আর তখনই চিত্রাকে খুন করার ইচ্ছেটা বাস্তব চেহারা নিতে চাইল আমার মনে। নাঃ, চিত্রাকে দেওয়ালে ঝোলানো ফটো করে দিতে আর কোনও বাধা নেই।

গত পাঁচ-সাত বছর ধরে প্রচুর খুনজখমের গল্প আমি পড়েছি। তার মধ্যে বউকে খুন করার গল্পগুলো বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। তাতে দেখেছি, এক-একটা গল্পে খুনের পদ্ধতি এক-একরকম। আবার মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলার চেষ্টাও নানারকমের। যেমন, একজন সাহেব তার বউয়ের মৃতদেহটা ছোট ছোট টুকরো করে পুড়িয়ে ফেলেছে ফায়ার প্লেসে। কাজটা এতই ভয়াবহ যে, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ফায়ার প্লেস হাতের কাছে পাবই-বা কোথায়! বড়জোর মৃতদেহের টুকরোগুলোকে গ্যাসের উনুনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মাংস পোড়ার গন্ধ নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক উৎকট। সেই গন্ধ পেয়ে আমার প্রতিবেশীরা অবশ্যই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। এমনিতেই তারা সবসময় পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়, সুতরাং তাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তাছাড়া বউ নিরুদ্দেশ হওয়ার একটা জুতসই ব্যাখ্যাও তো খাড়া করতে হবে আমাকে।

আর একটা গল্পে নায়ক তার বউয়ের মৃতদেহ পাতাল-ঘরের দেওয়ালের ফাঁপা অংশে লুকিয়ে দেওয়ালটা নতুন করে গেঁথে দিয়েছিল। পুলিশ তন্নতন্ন করে খানাতল্লাশ চালিয়েও সেই মৃতদেহের হদিস পায়নি। কিন্তু অহঙ্কারী নায়ক পুলিশের সামনেই যখন পাতাল-ঘরের দেওয়ালের গায়ে লাঠি ঠুকে গাঁথুনির প্রশংসা করতে থাকে, তখনই কোথা থেকে যেন শোনা যায় অপার্থিব এক কান্নার সুর। গাঁথুনির ভেতর থেকেই যেন ভেসে আসছে সেই কান্না। তৎপর পুলিশের দল সন্দিহান হয়ে গাঁথুনি ভেঙে ফেলে। তখনই দেখা যায়, নায়কের বউয়ের বিকৃত মৃতদেহের মাথার ওপরে বসে আছে তারই পোষা কালো বেড়াল। ভুল করে বউয়ের মৃতদেহের সঙ্গে সে এই কালো বেড়ালটিকেও জীবন্ত কবর দিয়েছিল। ফলে, একটা বেড়াল চোখের পলকে যেন ফাঁসির দড়ি হয়ে গেল।

গল্পগুলোর মধ্যে উদ্ভট গল্পও বেশ কয়েকটা ছিল। একটা লোক তো তার বউয়ের মৃতদেহ দু'বোতল চাটনি দিয়ে স্রেফ খেয়েই ফেলেছিল। এই জঘন্য কাজ করার সময় খিদে বাড়ানোর জন্যে লোকটা তার বাগানের সবকটা গাছ কেটে ফেলেছিল কুড়ুল দিয়ে। নাঃ, পড়লে বিশ্বাস হতে চায় না। এটা শুধু গল্পেই মানায়।

তারপর চোখে পড়েছে খুব জনপ্রিয় পদ্ধতির গল্প—যেখানে বউয়ের মৃতদেহ বড় ট্রাঙ্ক কিংবা সুটকেসে ভরে পাচার করা হচ্ছে, ফেলে রেখে আসা হচ্ছে ট্রেনের কামরায়, অথবা নির্জন কোনও রাস্তার ধারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দেখেছি পুলিশ মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই বিপদের শুরু। কি করে যেন গন্ধ পেয়ে পেয়ে ওরা

ঠিক খুঁজে পায় খুনিকে। তাছাড়া নাকগলানে পাড়াপড়শিরা যদি ট্রাঙ্ক বা সুটকেস নিয়ে রওনা হতে দেখে তাহলেই চিত্তির।

আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বউ যখন খুন হয় তখন সন্দেহের তালিকায় প্রথম নামটি সবসময়েই তার স্বামীর। সুতরাং, চিত্রা খুন হলে আমার নামই থাকবে সবার আগে। তাছাড়া ওর বাবা, আমার ডার্লিং শ্বশুরমশায়, বিকট বড়লোক। আদরের মেয়ের খুন হওয়াটা বা নিরুদ্দেশ হওয়াটা উনি কিছুতেই চুপচাপ মেনে নেবেন না।

দিনের পর দিন ভেবে মাথার চুল ছিঁড়েছি আমি। চিত্রার মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা কিংবা দুর্ঘটনা হিসেবে চালানো যায় কি না তাও ভেবেছি। কিন্তু মনের মতো কোনও প্ল্যান আসেনি মাথায়। বহু ভেবে ভেবে সার কথা যা বুঝেছি তা হল, চিত্রাকে খুন করতে হবে, মৃতদেহ লোপাট করতে হবে, এবং সবশেষে ওর উধাও হয়ে যাওয়ার একটা জুতসই ব্যাখ্যা খাড়া করতে হবে।

তবে গল্পে হোক আর সত্যি হোক, একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করে দেখেছি : মৃতদেহ যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে কিছুতেই পুলিশ জুতসই কোনও কেস দাঁড় করাতে পারে না। সুতরাং কি করে চিত্রাকে খুন করব, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কি করে ওর মৃতদেহ লোপাট করব।

এই প্রশ্নের উত্তরই আমি খুঁজে চলেছি গত পাঁচ-সাত বছর ধরে। না, মনের মতো কোনও উত্তর পাইনি। মনে মনে যে কত লক্ষ গল্প আমি লিখে ফেলেছি। কিন্তু সব কটা গল্পেই শেষ পর্যন্ত স্বামী বেচারা ধরা পড়ে গেছে। আর তারপরই ইলেকট্রিক চেয়ার কিংবা ফাঁসির দড়ি।

সুতরাং অনুতোষের যন্ত্র আমাকে হাতে চাঁদ পেড়ে দিল। আমার এতদিনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া গেল যেন।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম আর গভীর টান মারছিলাম হাতের সিগারেটে। চোখ-কান-মন সবই অনুতোষের দিকে। ও আমাকে তখন যন্ত্রটার কথা বলছিল।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি টাইম লকার, বুঝেছিস?

আমি অবাক হয়ে বললাম, টাইম লকার? তার মানে?

যন্ত্রটা আমাদের কাছ থেকে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে। চেহারায় দুশো লিটার মাপের একটা রেফ্রিজারেটরের মতো। রঙ হালকা নীল। চকচকে ধাতুর হাতল লাগানো দরজায়। আর পাশের দিকটায় ছোট্ট একটা ডায়ালের মতো কী যেন, তার পাশেই লাল রঙের একটা বোতাম।

অনুতোষ কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে গেল টাইম লকারটার দিকে। হাতলে টান মেরে খুলে দিল দরজাটা। ভেতরে অনেকটা জায়গা। সেখানে দুটো তাকও রয়েছে। সবটাই ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি।

বুঝতেই পারছেন, যন্ত্রটার মধ্যে এমনিতে কোনও বিশেষত্ব নেই। নেহাতই সাদামাটা শৌখিন একটা আলমারি। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে অনুতোষ কী বলল জানেন?

টাইম লকার।—হাসল অনুতোষ ঃ এর মধ্যে কোনও জিনিস ঢুকিয়ে যদি পাশের দেওয়ালের ডায়ালটা এইদিকে কুড়ি ডিগ্রী ঘুরিয়ে বোতামটা টিপে দিস, তাহলে দরজা খুলে দেখবি ভেতরে কিছুই আর নেই। সব ফাঁকা।

যাঃ, অসম্ভব!—আমি সিগারেট গুঁজে দিয়েছি অ্যাশট্রেতে। কফির কাপ হাতে চলে গেছি বিজ্ঞানী অনুতোষের কাছে। বলেছি, না, ভাই, বিশ্বাস হচ্ছে না।

অনুতোষ একবার তাকাল আমার দিকে। তারপর হঠাৎই আমার হাত থেকে কফির কাপ-প্লেট একরকম কেড়ে নিল। সেটা রেখে দিল টাইম লকারের ওপরের তাকে। এবং দরজা বন্ধ করে ডায়াল ঘুরিয়ে বোতাম টিপে দিল।

অনুতোষ চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নে, এবার দরজা খুলে দেখ—।

আমি অবাক চোখে আমার স্কুলজীবনের বন্ধুকে দেখতে দেখতে টাইম লকারের হাতল ধরে টান মারলাম। এবং হতবাক হয়ে গেলাম।

টাইম লকার সেই আগের মতোই খালি। আমার ফ্যালফ্যালে চাউনি দেখে অনুকম্পার হাসি হাসল অনুতোষ। বলল, ওই কাপ আর প্লেট এখন হাইপার স্পেসে চলে গেছে। আমাদের স্পেস-টাইম ছেড়ে চলে গেছে ফোর্থ ডাইমেনশনে।

আমার মাথায় ব্যাপারটা ঢুকল না। হাইপার স্পেস! ফোর্থ ডাইমেনশন! সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য গুলিয়ে যাক, ক্ষতি নেই, শুধু টাইম লকার ঠিকমতো কাজ করলেই আমি খুশি।

অনুতোষের ভেতরে বিজ্ঞানী সত্তা তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ও আপনমনেই বকবক করে চলেছে ওর টাইম লকার তৈরির ইতিহাস। আমি ওর কথাগুলো শুনছিলাম, কিন্তু মনে মনে গলা টিপে খতম করেছিলাম। চিত্রাকে। আমার বিষধর চিত্র সমালোচককে।

অনুতোষ বলছিল,...সুপার কণ্ডাক্টর দিয়ে কয়েকটা কয়েল তৈরি করে তাতে কারেন্ট পাঠিয়ে তৈরি করেছি সুপার ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তার ওপরে চালিয়েছি নকল মহাকর্ষ। তাছাড়া আরও অনেক কিছু করেছি, তুই সে-সব বুঝবি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেরকমটা চাইছিলাম সেরকম হল না। দেখি, এরপর আর কী কারিকুরি করা যায়...।

নিকুচি করেছে অনুতোষের বৈজ্ঞানিক কচকচির! আমি তখন মনে মনে 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে...' গাইছি। আমার মুখচোখে বোধহয় খুশি আর উত্তেজনার ছাপ পড়েছিল। সেটা দেখে অনুতোষ একটু অবাক হয়ে গেল। টাইম লকারের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, কী ব্যাপার বল্ তো?

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে মজা করে বলেছি, না, ভাই, এখন বলব না। আমার মতো ছবি আঁকিয়েদের এমনিতেই পাগল বলে বদনাম আছে। তবে এটুকু বলতে পারি, তোর এই যন্ত্রটা দেখে আমার একটা আইডিয়া এসেছে।

না, না, ভুলেও ভাববেন না চিত্রাকে 'নেই' করে দেবার আইডিয়া আমি অনুতোষকে বলতে চলেছি। ও আমার ইস্কুলের বন্ধু—তার বেশি কিছু সুতরাং রহস্যময় হাসি হেসে বললাম, তোর এই যন্ত্রটা ক'দিনের জন্যে আমাকে ধার দিতেই হবে।

কেন বল্ তো? অনুতোষ অবাক চোখে তাকায় আমার দিকে।

আমি তখন চাপা গলায় বললাম, তোকে বলছি, কিন্তু ব্যাপারটা একদম ফাঁস করবি না। আমি হাইপার স্পেস নিয়ে ছবি আঁকা শুরু করব। সুররিয়েলিস্টিক ঢঙে একটা সিরিজই এঁকে ফেলব। বুঝতেই তো পারছিস, এই দারুণ আইডিয়ার ব্যাপারটা যদি অন্য কোনও আর্টিস্ট টের পেয়ে যায় তাহালে আমারই ক্ষতি। আর্টিস্টসদের মধ্যে কীরকম রেষারেষি জানিস তো!

না, অনুতোষ যে আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে তা বলব না। তবে আমি যেভাবে নাছোড়বান্দার মতো ধরেছি তাতে ওর ঠুনকো আপত্তি টিকল না। তাছাড়া ওর গবেষণার জন্যে বিশ হাজার টাকা ডোনেশান দিতেও রাজি হয়ে গেলাম আমি। আরও বললাম, বন্ধুত্বের খাতিরেই ওর একটা অয়েল পোর্ট্রেট করে দেব—একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে।

অনুতোষের মুখ দেখেই বুঝলাম, আমার এক-একটা অয়েল পেইন্টিং কী দামে বিক্রি হয় সে-সম্পর্কে বেশ ভালোরকম ধারণাই ওর আছে। ওর মুখে প্রত্যাশা ফুটে উঠল। সেটা দেখে আমার হাসি পেল। অনুতোষ জানে না, চিত্রার জোয়াল থেকে মুক্তি পেতে আমি একটা কেন, এক হাজার অয়েল পেইন্টিং ফ্রি-তে বিলোতে পারি।

সুতরাং এইভাবে, অনেক অনুনয় ও মেহনতের পর, অনুতোষের টাইম লকার পরদিনই চলে এল আমার বাড়িতে। এবং এবার যে-গল্প আমি 'লিখতে' চলেছি সারা দুনিয়া খুঁজেও তার জুড়ি পাওয়া যাবে না আমি জানি।

চিত্রা যে বাক্সটা—মানে, টাইম লকারটা দেখে একশো আটটা প্রশ্ন করবে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পেরেছেন। ও প্রথমেই জানতে চাইল, এই অকেজো ফ্রিজটা আমি কোন্ জাহান্নম থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। আমিও মিনমিন করে জবাব দিয়েছি, শস্তায় পেয়ে গেলাম, তাই—মানে...।

ও ঠোঁট-মুখ বেঁকিয়ে বলল, ওঃ, সেই বিয়ের আগে থেকেই তোমার এইরকম ভিখিরি মানসিকতা! সবসময়েই হাত পেতে ঘুরঘুর করছ।

বুঝলাম, ও সেই একযুগ আগের প্লেনভাড়ার ব্যাপারটা আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু আমি কোনও জবাব দিলাম না। কারণ আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই চিত্রা—অথবা, বলা ভালো চিত্রার মৃতদেহ রওনা দেবে হাইপার স্পেস না কী যেন—সেই জাহান্নামের পথে। যেখানে মা-কালীর কোলে আমার বউ চিত্রা ডাকিনী-যোগিনী সেজে বসে থাকবে।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই চিত্রার কথা বলার হার মারাত্মক রকমের বেড়ে গেল। আমি বেশ শান্তভাবেই ওকে বললাম যে, এই আলমারিতে আমার ছবি আঁকার সরঞ্জাম থাকবে, আর টুকটাক জিনিস থাকবে। তার পর মনে মনে বললাম, আর থাকবে তোমার মৃতদেহ।

দেরি করতে চাইনি আমি। তাই সেদিন রাতেই চিত্রা যখন অচেতন ঘুমে নিঃঝুম তখন ওর গলা টিপে ধরলাম। বিশ্বাস করুন, গলা টেপার সময়ে হাসি পাচ্ছিল আমার। কি সেই গলা, যে-পথ বেয়ে গত বারো বছর তিন মাসে অন্তত সাড়ে সতেরো

কোটি কথা বেরিয়ে এসেছে! কী ভয়ঙ্কর অপশক্তিই না লুকিয়ে রয়েছে এই দানবীর ভোকাল কর্ডে! আমার হাত শিল্পীর হাত। কিন্তু খুনও বোধহয় এক শিল্পকলা। নইলে কী করে অমন শক্তি দিয়ে আমি চেপে ধরতে পারলাম চিত্রার গলা!

কিছুক্ষণ দাপাদাপি করল ও। চোখ খুলে নাইট ল্যাম্পের আলোয় বোধহয় চিনতে পারল ওর আততায়ীকে। ওর পায়ের ঝাপটায় মশারির একটা কোণের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই সব ছটফটানি শেষ। খেল্ খতম।

মনে হল আমি যেন পাখির মতো ডানা মেলে ভেসে পড়েছি আকাশে। আমার স্বাধীন ডানায় কারও শাসনের ছাপ নেই। ক্রীতদাসের শেকল ছিঁড়ে গেছে চিরতরে।

স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে বাকি কাজগুলো সেরে ফেললাম আমি। চিত্রার মৃতদেহটা টেনে নিয়ে গেলাম টাইম লকারের কাছে। তারপর কোনওরকমে ঠেলেঠুলে গুঁজে দিলাম ভেতরে। ওর 'দ' হয়ে বসে থাকা দেহটা দেখে মনে হল ওটা আমার গত বারো বছর তিন মাস বিবাহিত জীবনের প্রতীক। তবে ওর মুখের কঠিন রেখাগুলো এখন ততটা স্পষ্ট নয়। বরং চিত্রাকে অনেক নিরীহ মনে হচ্ছে। শুধু মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ। হবেই তো! আচমকা গলা টিপে ধরেছিলাম যে!

আলমারি খুঁজে বের করে নিলাম ওর গোটা পাঁচেক প্রিয় শাড়ি-ব্লাউজ। তার সঙ্গে যোগ হল একজোড়া শৌখিন জুতো, টুথব্রাজ, স্নো-পাউডার, লিপস্টিক, ময়েশ্চারাইজার, আর কিছু মেয়েলি জিনিস। সেগুলো একে একে ভরে দিলাম টাইম লকারে। তার পর অনুতোষের নির্দেশমতো ডায়াল ঘুরিয়ে বোতাম টিপে দিলাম।

এর কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমার ফ্ল্যাট থেকে শুধু চিত্রা উধাও হয়ে গেলেই তো হবে না। তার সঙ্গে এই শাড়ি জামাকাপড় প্রসাধনের জিনিসও উধাও হওয়া দরকার। কারণ কাল সকালেই আমি আমার সুইট ডার্লিং শ্বশুরমশায়কে টেলিফোনে জানিয়ে দেব যে, চিত্রা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে জানি না।

এই একই কথা বলব পাড়া-পড়শিকে এবং পুলিশকে। তারপরই পুলিশ শুরু করে দেবে তাদের চুলচেরা অনুসন্ধানের কাজ।

যা ভেবেছিলাম তাই হল। শ্বশুরমশায় এবং পুলিশ—এই দু তরফের জেরায় জেরায় জেরবার হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু একটুও ভেঙে পড়লাম না। কারণ গতকাল রাতে টাইম লকারের বোতাম টিপে দরজা খুলে দেখে নিয়েছি লকার খালি। সেখানে চিত্রার মৃতদেহ নেই, শাড়ি-ব্লাউজ নেই, স্নো-পাউডার নেই, কিচ্ছু নেই। অনুতোষ আমাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছিল টাইম লকারের মাহাত্ম্য। কিন্তু তবুও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অনেকবার হাত বোলালাম টাইম লকারের ভেতরে। আঙুলের ডগায় শুধু ঠান্ডা ধাতুর পাতের ছোঁওয়া। চিত্রা ইত্যাদি সত্যিই মিলিয়ে গেছে হাইপার স্পেসে।

সুতরাং একটুও ভেঙে পড়িনি আমি। পুলিশি জেরা চলল সারাদিন ধরে। সম্ভব অসম্ভব নানান প্রশ্ন করল ওরা। সব প্রশ্নের উত্তরই যে ঠিকঠাক দিতে পারছিলাম তা নয়। বেশ কয়েক জায়গায় ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছিল। আমার শ্বশুর পাইপ টানতে টানতে পায়চারি করছিলেন ঘরে। যেন খুব কঠিন কোনও সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

সমাধানের পথ খুঁজছেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার। আর সাদা পোশাকের দু জন অফিসার তন্নতন্ন করে সার্চ করছিল আমার ফ্ল্যাট। ইউনিফর্ম পরা দুজন কনস্টেবল ফ্ল্যাটের দরজায় পাহারায় দাঁড়িয়ে।

চিত্রার মৃতদেহে উধাও হওয়ার পর টাইম লকারের ভেতরে টুকিটাকি কিছু জিনিস সাজিয়ে রেখেছিলাম কাল রাতেই—কয়েকটা তুলি, প্যালেট, বোর্ডপিন, আর কাপ-প্লেট। পুলিশ অফিসাররা সেগুলোও খুঁটিয়ে দেখল। লকারের গায়ের ছোট ডায়াল আর বোতামটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল আমাকে, এগুলো কি?

আমি নির্বিকারভাবে জবাব দিলাম, মান্ধাতার আমলের পুরনো ফ্রিজ। আমি স্রেফ আলমারি হিসেবে জলের দরে কিনেছি। তারপর রঙচঙ করে নিয়েছি—।

সুতরাং পুলিশের যাবতীয় তৎপরতার ফলাফল অশ্বডিম্ব। কিন্তু চলে যাবার সময় আমার ডার্লিং শ্বশুর যেভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে বুঝলাম, উনি সহজে আমাকে ছেড়ে দেবেন না। কারণ, আর কেউ না জানুক উনি জানেন, চিত্রা কখনও অন্য কোনও পুরুষকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেনি। স্বামী হিসেবে আমাকে ওর খুব পছন্দ ছিল। এরকম ক্রীতদাস স্বামী যে সহজে পাওয়া যায় না!

আমার শ্বশুরের টাকা-পয়সা অঢেল। ফলে নিষ্ফল তদন্ত করে করে পুলিশ যদি ঝিমিয়ে পড়ে তাহলে তাদের চাঙ্গা করে তোলার দাওয়াই তাঁর জানা আছে। তাই মনে হয়, পুলিশ খুব সহজে চিত্রা অন্তর্ধান রহস্যের তদন্তে ক্ষান্তি দেবে না।

দেখা গেল, আমার কথাই ঠিক। দিনের পর দিন পুলিশ আমাকে বিরক্ত করে চলল। দু-চার দিন বাদেবাদেই তারা নতুন নতুন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতে লাগল। আর আমার হাসি পাচ্ছিল। একটা মৃতদেহের এত দাম! মৃতদেহ খুঁজে না পাওয়া গেলে পুলিশ সত্যি কত অসহায়!

যতই দিন যেতে লাগল পুলিশের প্রশ্নের সংখ্যা কমে আসতে লাগল। আমার শ্বশুরের কপালে এখন দুশ্চিন্তার বলিরেখা। মুখের সেই প্রতিজ্ঞার ছাপ কোথায় মিলিয়ে গেছে। দুনিয়ার আত্মীয়স্বজনের কাছে খোঁজ করেও চিত্রার হদিস পাননি উনি। এমন কি চিত্রা বিদেশে পাড়ি দিতে পারে এই সম্ভাবনার কথা ভেবে চিত্রার ফটো নিয়ে এয়ারপোর্টেও খোঁজ করেছে পুলিশ। কিন্তু সেখানেও হতাশা।

এইভাবে, বুঝলেন, যখন প্রায় বিশদিন কেটে গেছে, তখন একদিন সন্ধেবেলা আমার ডার্লিং এল আমার ফ্ল্যাটে। সঙ্গে সাদা পোশাকের স্বাস্থ্যবান এক লোক। লোকটাকে আগে দেখিনি, তবে তার চোখের চাউনি আর চোয়ালের রেখা স্পষ্ট বলে দিল, সে পুলিশের লোক। আমরা সোফায় বসে কথা বলছিলাম। পুলিশের লোকটা আমার হাত ধরে দুঃখপ্রকাশ করল। বলল, এতদিন ধরে আমরা অকারণে আপনাকে উত্যক্ত করেছি, কিছু মনে করবেন না।

শ্বশুরমশায়ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চিত্রার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। ও বড় জেদি মেয়ে। কে জানে অভিমান করে কোথায় চলে গেছে। দেখো, আমার মন বলছে, ও আবার একদিন তোমার কাছে ফিরে আসবে। তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম বলে কিছু মনে করো না।

ওদের অনুতাপ আমাকে খুশি করল। এতদিনের শত্রুতার ভাবটা সরে গেল মন থেকে। আমার চোখের সামনে এখন একজন অসহায় পিতা আর একজন ব্যর্থ পুলিশ অফিসার। এতদিন ওদের জন্যে আতিথেয়তার ছিটেফোঁটাও করিনি। আজ, এখন, চায়ের অনুরোধ করলাম।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই সাধারণত কথাবার্তা হচ্ছিল। আমি আমার চিত্রাহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা বলছিলাম। আমার শ্বশুরমশায় মাঝে মাঝেই সহানুভূতি দেখাচ্ছিলেন।

হঠাৎই যে আমার কী হল কে জানে! সোফা ছেড়ে সটান উঠে চলে গেলাম টাইম লকারের কাছে। ওটার গায়ে চাপড় মেরে বললাম, এই পুরনো বাক্সা আলমারিটা চিত্রার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল, জানেন! ও বলছিল, যদি ও সারাটা জীবন এইটুকু পুঁচকে একটা আলমারির ভেতরে কাটাতে পারত তাহলে বেশ হত।

বুঝতেই পারছেন, অহঙ্কার, স্রেফ অহঙ্কার। খুন করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মেডেল গলায় ঝুলিয়ে চ্যাম্পিয়ান হওয়াটা তো কম কথা নয়। সুতরাং সেই অহঙ্কারের বশেই লকারের দরজাটা একটানে খুলে ফেললাম আমি। টুকিটাকি জিনিসে সাজানো ছিমছাম ভেতরটা দেখিয়ে ওদের বললাম, কী সুন্দর, না!

আর তখনই বেখাপ্পা ব্যাপারটা নজরে পড়ল আমার। এটা এল কোথা থেকে? একটা চিনেমাটির প্লেট, তার ওপরে একটা কাপ। কাপে কালচে মতন তলানি রয়েছে খানিকটা। আর সেই কাপ-প্লেটের পাশে রাখা একটা কাপ কাত হয়ে পড়ে গেছে।

বুঝতে পেরেছেন কি ব্যাপারটা? পারেননি? কী করে পারবেন! আমারই যে বুঝে উঠতে অনেকটা সময় লেগেছিল। তারপর বুঝতে পারলাম, এটা হল অনুতোষের সেই কাপ-প্লেট—টাইম লকারের মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্যে যে কাপ-প্লেট লকারের ভেতরে রেখে উধাও করে দিয়েছিল অনুতোষ। এতদিন পর আচমকাই সেই কাপ-প্লেট ফিরে এসেছে হাইপার স্পেস থেকে! এখন মনে পড়ছে, অনুতোষ বলেছিল, ওর যন্ত্রটা এখনও গবেষণা স্তরে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত যেরকম চেয়েছিল সেরকমটা হয়নি। সেইজন্যেই কি টাইম লকারে রেখে উধাও করে দেওয়া জিনিস কিছুদিন পর খেয়ালখুশি মতো ফিরে আসে হাইপার স্পেস থেকে!

আমার কপালে ঘামের ফোঁটা, মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখে কি ঝাপসা দেখছি সব কিছু? কোনওরকমে টাইম লকারের দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার শ্বশুরমশায় আর অফিসার ভদ্রলোক সোফা ছেড়ে উঠে পড়ছে না কেন? ওদের চা খাওয়া কি এখনও শেষ হয়নি?

ঠিক তখনই টুকিটাকি জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ হল লকারের ভেতরে। আর একটা বীভৎস উৎকট দুর্গন্ধে ভরে উঠল গোটা ঘরটা। বিশ দিনের বাসী মৃতদেহের দুর্গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া থামিয়ে দু-জোড়া তীব্র চোখ তাকাল টাইম লকারের দিকে। পুলিশ অফিসারটি উঠে পড়ল সোফা ছেড়ে। এগিয়ে গেল লকারের দিকে। আমি জানি, টাইম লকারের দরজা খুললে এখন কী চোখে পড়বে।

মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ঠিক আগে আমার মনে হল, চিত্রাই জিতে গেল শেষ পর্যন্ত। আমাকে শায়েস্তা করতে ও হাইপার স্পেস থেকেও ফিরে এসেছে।